ইন্টারনেট সংস্করণ: www.ekashtipathar.com

প্রথম বর্ষ □ দ্বাদশ সংখ্যা □ এপ্রিল ২০১৩ □ ৩০ টাকা

Subscribe Online
www.swarnakshar.in

কালের কষ্টিপাথর

শিল্পী: পাপিয়া ঘোষাল

ছোটদের
জন্মদিনে
শ্রেষ্ঠ উপহার

ছেলেবেলা

✓ বাড়ির ছোটদের বা তাদের বন্ধুদের সামনের জন্মদিনেই আগামী একবছরের জন্য প্রতি মাসের 'ছেলেবেলা' উপহার দিতে পারেন।

✓ একবছরের গ্রাহকমূল্য (ডাকব্যয় সহ) ১৫০ টাকা (ক্যুরিয়ারে পেতে চাইলে ২৬০ টাকা) চেকে বা মানি অর্ডারে Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.-এর নামে নীচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলে আমরাই উপহার প্রাপকের নাম লেখা গিফট কার্ড সহ 'ছেলেবেলা' পাঠাবার ব্যবস্থা করব।

✓ চেকের সঙ্গের চিঠিতে বা মানি অর্ডার ফর্মের একেবারে নীচের দিকে আপনার নাম-ঠিকানা আর উপহার প্রাপকের নাম ও জন্মতারিখ অবশ্যই লিখে দেবেন। উপহার প্রাপকের ঠিকানা অন্য হলে তার ঠিকানাও লিখতে হবে।

✓ **অনলাইনও গ্রাহক হতে পারেন। লগ অন করুন:** www.swarnakshar.in

✓ যে মাসে জন্মদিন তার অন্তত একমাস আগে আমাদের দপ্তরে টাকা পৌঁছতে হবে। চেক বা মানি অর্ডার পাঠাবেন এই ঠিকানায়:

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019

Subscribe online: www.swarnakshar.in

ফোন: ২২৮০ ৮৮১৮ **ফ্যাক্স:** ২২৮৭ ৬৪৪৮ **ই-মেল:** chhelebela@swarnakshar.in

প্রতি মাসের
ছেলেবেলা
পত্রিকাস্টলে বা
সংবাদপত্র-বিক্রেতার
কাছেও পাওয়া যাবে।

www.ekashtipathar.com

মাসিক সাহিত্যপত্রিকা

কালের কষ্টিপাথর

পশ্চিমবাংলা, আসাম ও ত্রিপুরায় বইয়ের দোকানে
এবং পত্রিকাস্টলে পাওয়া যাচ্ছে।

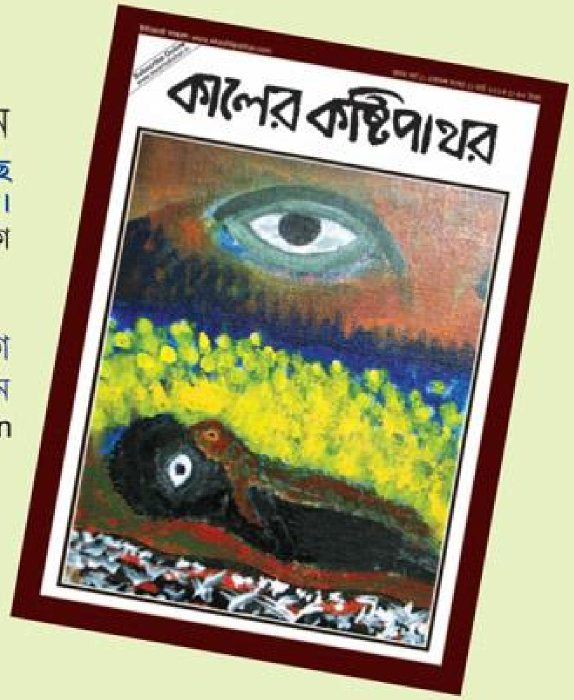

কলকাতায়ও সর্বত্র পাবেন

পত্রিকাস্টলে বা সংবাদপত্র-বিক্রেতার কাছে
আগে থেকেই বলে রাখুন।

প্রতি সংখ্যা ৩০ টাকা

ঘরে বসে নিয়মিত পত্রিকা
পেতে অনলাইন গ্রাহক হোন
www.swarnakshar.in

এক বছরের গ্রাহকমূল্য ৩৬০ টাকা চেকেও পাঠাতে পারেন। এই নামে, এই ঠিকানায়:

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.

29/1-A, Old Ballygunge Second Lane, Kolkata-700 019

স্বর্ণাক্ষর

Phone: 2280 8818, 2283 2320 **Fax:** 2287 6448 **E-mail:** kashtipathar@swarnakshar.in **Website:** www.swarnakshar.in

মহাশ্বেতা দেবী: *জ্ঞানপীঠ, ম্যাগসেসে, আকাদেমি প্রভৃতি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বহু পুরস্কারে ভূষিতা লেখিকা।*

বহু ছেলেমেয়ে 'কর্মক্ষেত্র' পড়ে
নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে।
অন্তত চারটি ছেলে ও দুটি মেয়ের
কথা আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে।
যারা 'কর্মক্ষেত্র'-র সহায়তায়
কাজ পেয়েছিল। ওদেরকে আমিই
'কর্মক্ষেত্র'-র গ্রাহক করে দিয়েছিলাম।
'কর্মক্ষেত্র' প্রথম থেকেই ছোটখাটো
ব্যবসার এক আশ্চর্য নির্দেশিকা দিয়ে
আসছেন, যা অনুসরণ করলে যুবাপ্রজন্ম
বাঁচবার ও বাঁচাবার পথের সন্ধান পাবে।
টুথপেস্ট বানাবেন, না হাওয়াই চপ্পলের
ফিতে? মেশিনে পেট্যাটো চিপস বানিয়ে
বেচবেন, না ভিনিগার তৈরি করবেন?
'কর্মক্ষেত্র' এত বছরে, এরকম অন্তত
এক হাজার অল্প পুঁজির ব্যবসার হদিশ
দিয়েছে। ওই সব ব্যবসায় নেমে
কয়েক হাজার মানুষই স্বাবলম্বী হয়েছেন।
মৃত্যু যখন দরজায় ঘা দিচ্ছে, তেমন
সময়ে যে ঔষধ বাঁচাতে পারে, তাকে
আমাদের মুনিঋষিরা নাম দিয়েছেন
বিশল্যকরণী। আমি তো 'কর্মক্ষেত্র'কে
বলব বিশল্যকরণী।
'কর্মক্ষেত্র' যেভাবে স্বল্প পুঁজিতে ব্যবসা
করার পরিকল্পনা জোগায়, তাতে তো
সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েরা যেন
নতুন জীবনের রসদ পায়।
'কর্মক্ষেত্র' বলছে, পরিশ্রম করো
সততার সঙ্গে, শ্রমকে ভয় পেও না,
স্বীয় কর্মগুণে ভাগ্যকে জয় করো।
আজ দেশের তরুণ প্রজন্মকে এই কথা
বলার মহান দায়িত্ব 'কর্মক্ষেত্র' গ্রহণ করেছেন,
আমি অন্তর থেকে যেন সাড়া পাচ্ছি।

মহাশ্বেতা দেবী

৩ জুলাই, ২০০৫

কর্মক্ষেত্র

বাঙালির কর্মজীবনের প্রবেশপথ

ইন্টারনেটে কর্মক্ষেত্র: www.ekarmakshetra.com

ইন্টারনেট সংস্করণ: www.ekashtipathar.com

কালের কষ্টিপাথর

প্রথম বর্ষ। দ্বাদশ সংখ্যা। এপ্রিল ২০১৩। বৈশাখ ১৪২০

সূ চি প ত্র

সম্পাদকীয় ৫

ক্ষণের বচন ৮। শব্দবক্র ৮

চণ্ডীমণ্ডপ। চণ্ডী লাহিড়ী। মদনা ৭

পু র নো অ্যা ল বা ম

কালান্তর। সম্পাদকীয়। প্রতাপকুমার রায় ৬১

হেঁয়ালির ছন্দ। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৯

দেবেশ রায়ের দাওয়াত ৩১

এবারের অতিথি গল্পকার

সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

অবিনশ্বর বিস্মরণ ৩২

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর স্বনির্বাচিত দুটি গল্প ৫১

গৃহ ৫১ ধুলো ৫৪

ধা রা বা হি ক

একাত্তরের দিনগুলি। জাহানারা ইমাম ১৪

আমার ছবিজীবন। শুভাপ্রসন্ন ২৪

বিষাদগাথা। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী ৬৭

মহাজনসঙ্গ। অমিতাভ চৌধুরি

ডঃ ত্রিগুণা সেন ১০ সুবোধ ঘোষ ১২

বরণীয় লেখকের স্মরণীয় সঙ্গ। সবিতেন্দ্রনাথ রায়

সাহিত্যিকদের জ্যোতিষানুরাগ ৬৩

ক বি তা র পা তা

কবিতা-পরিচয়

একাদশী: বিষ্ণু দে ৫৭

অরুণ সেন

কবিতা-পরিচয় প্রশ্নমালা, কবির উত্তর ● শঙ্খ ঘোষ ৫৯

ভ্র ম ণ ক থা

আমাজন। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী ৩৫

ল ঘু ভা ষ - গু রু ভা ব

মৃত্যু: জীবনের প্রথম পাঠ। পবিত্র সরকার ৪৩

বুড়োক্রেজি। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। কমিশনারের কিক ৭৮

সাময়িকপত্রে সেকালের লেখা। বারিদবরণ ঘোষ। উত্তরা ৭৫

নি য় মি ত

কয়েকটি চিঠি ৮১। বই ঠেক ৮৪

প্রচ্ছদ: পাপিয়া ঘোষাল

কালের কষ্টিপাথর

সম্পাদক : অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: সম্পাদকীয় বিভাগ: ২২৮৩-৫৫২৬
বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন: ২২৮৩-২৩২০, ২২৮০-৮৮১৮
ফ্যাক্স: ২২৮৭-৬৪৪৮ E-mail: kashtipathar@swarnakshar.in
Website: www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অমরেন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক, স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ, দোলতলা, দোহারিয়া, পোঃ গঙ্গানগর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০ ১৩২ থেকে মুদ্রিত ও ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯ থেকে প্রকাশিত।
Owner Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. Printer & Publisher Amarendra Chakravorty on behalf of Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. Published from 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019 and Printed from Swapna Printing Works (P) Ltd., Doltala, Doharia, P.O. Ganganagar, North 24 Parganas, Kolkata-700 132.
Editor Amarendra Chakravorty.

স্বর্ণাক্ষরে ভ্রমণকাহিনি

দুচাকায় দুনিয়া
বিমল মুখার্জি

১৯২৬ সালে সাইকেলে পৃথিবী পর্যটনে
বেরিয়েছিলেন প্রথম ভারতীয় ভূ-পর্যটক
বিমল মুখার্জি। তাঁর সেই দুঃসাহসিক
বিশ্বভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
পঞ্চম মুদ্রণ। ₹১৫০

দেশে দেশে
প্রতাপকুমার রায়

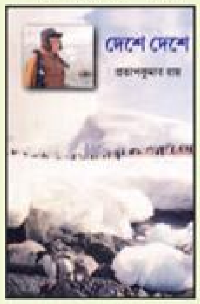

প্রখ্যাত ভ্রামণিকের ভ্রমণগাথা। ₹৭৫

ইছামতীর মশা
শঙ্খ ঘোষ

কবির দেখা কবির লেখা
একগুচ্ছ অসাধারণ
ভ্রমণকথার সংকলন।
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹১৫০

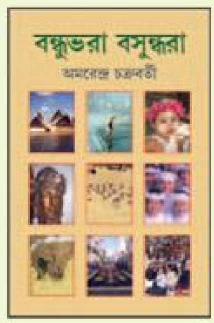

বন্ধুভরা বসুন্ধরা
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানোর
আন্তরিক আলেখ্য।
সঙ্গে রঙিন ছবি।
ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা।
পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ₹১২০

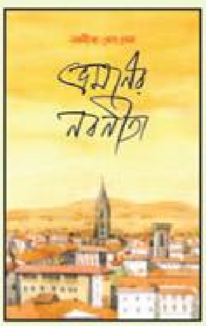

ভ্রমণের নবনীতা
নবনীতা দেব সেন

নানা মহাদেশের মাটির
জলস্পর্শ আছে এ বইয়ে।
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹৯০

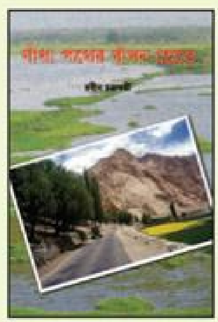

বাঁধা পথের বাঁধন ছেড়ে
রবীন চক্রবর্তী

উত্তর-পূর্ব ভারত আর লাদাখ
ভ্রমণে আগ্রহীদের এ-বই
পথ দেখাবে। সঙ্গে খুঁটিনাটি
দরকারি তথ্য।
₹৬০

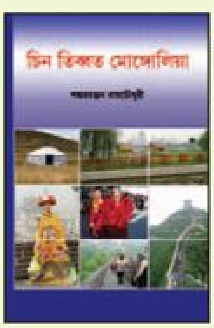

চিন তিব্বত মোঙ্গোলিয়া
শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরী

চিন, তিব্বত আর মোঙ্গোলিয়া—
ভৌগোলিক রহস্যভরা তিন ভুবনে বিচিত্র
প্রকৃতি আর মানুষের জীবনস্রোতে ভেসে
বেড়ানোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা। ₹৬০

অনলাইনে পেতে
www.swarnakshar.in
লগ অন করুন

স্বর্ণাক্ষর

SWARNAKSHAR PRAKASANI PRIVATE LIMITED
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320 **Fax:** 2287-6448
E-mail: info@swarnakshar.in

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩,
বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান
ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

কালের কষ্টিপাথর

বৈশাখ ১৪২০ □ এপ্রিল ২০১৩

সাহিত্যের ইতিহাসে এক-একটা সময় আসে,
যখন নতুন সাহিত্যভাষার প্রয়োজন হয়।

সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব ২০১৩
সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

উৎসর্গ

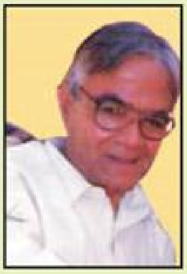

বিবরণধর্মিতার চিরবিরোধী,
সাহিত্যের ভাষা যাঁর
ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী, সমবেত
প্রতিদ্বন্দ্বীদের থেকে দূরে
আজীবন একক প্রদর্শনীর
সেই শিল্পী
সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের
স্মৃতিতে এই সংখ্যার
'কালের কষ্টিপাথর' উৎসর্গ
করে আমরা ধন্য।

স ম্পা দ কী য়

সমাজ যখন বিষিয়ে ওঠে, জীবন যখন শুকায়ে যায়, আমি তখন মহাকাব্যে মুখ ফেরাই। জীবনের এত বড় দর্পণ আর কী আছে? সত্যের এমন শাশ্বত রূপ আর কোথায় খুঁজব? কালের মধ্যে মহাকাল, এমনকী একালেও বাক্যের হৃদমাঝারে গোধূলির আলো কিংবা কবিতাপংক্তিতে প্রেম বা প্রতিবাদের প্রতীক চিরকালই পাঠকের সমসাময়িক।

বেশ কয়েক দশক ধরে বিশ্বজুড়ে যতই রক্তপাত, আমি ততই সাহিত্যে আশ্রয় খুঁজি। আমাদের সৌভাগ্য, বাংলা সাহিত্যে রক্তের বর্ণ-গন্ধের চেয়ে ঋতুর বর্ণ-গন্ধ অনেক বেশি। রোজকার রক্তস্নাত সংবাদের তুলনায় জীবনের আনন্দ-বেদনাবিদ্ধ, সুখ-দুঃখমথিত, সত্যের বিদ্যুচ্চমকিত সাহিত্যই আমাকে সান্ত্বনা দেয়। চারপাশের স্বার্থান্ধ দখলদারি, হিংসা-ঘৃণাময় আস্ফালন, সর্বগ্রাসী হীনতা আমাদের সমাজে যত কলুষ ছড়ায়, তার কালো ছায়া সত্ত্বেও তাকে ছাপিয়ে সাহিত্যে শুনি জীবনের আনন্দ ও বিষাদের চিরসঙ্গীত। হয়তো সেইজন্যই সাহিত্য ছাড়া মানুষের অতীত অর্থহীন, বর্তমান অচল, ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

আমাদের প্রতিবেশী বাংলাদেশে সাহিত্য আঁকড়ে-থাকা মন, সোভিয়েতভাঙা জর্জিয়ায় দারিদ্র-দুর্নীতি-পীড়িত সাধারণ্যেও প্রবল সাহিত্যানুরাগ, মোঙ্গোলিয়ায় আকাশের টলটলে নীল আর কবিতায় মানুষের স্বভাবজ আসক্তি দেখে আমি হয়তো আমার মনের মধ্যে সাহিত্যের এইরকম একটা মাত্রা গড়ে নিয়েছি।

আমার মতো সাধারণ পাঠকের চঞ্চল মনে সাহিত্য-বিষয়ে এই মুহূর্তে আশা-দুরাশা তাড়িত যে অস্থির আলগা ভাবনা ভেসে উঠল, এখানে তারই দু-এক টুকরো লিখলাম। এই ভরসায় যে, অভিজ্ঞ, দীক্ষিত, মনোজ্ঞ পাঠক আমার চিন্তার পরিধি বাড়িয়ে ভাবনার ভুলভ্রান্তি ধরিয়ে দেবেন। সেটাই হবে এই সামান্য কথার অসামান্য প্রাপ্তি।

স্বর্ণাক্ষরে ছোটদের বই, বেড়াবার বই, কাজের বই

প্রথম ভারতীয় ভূপর্যটক

বিমল মুখার্জির

দুচাকায় দুনিয়া

১৯২৬ সালে সাইকেলে পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছিলেন বিমল মুখার্জি। তাঁর সেই দুঃসাহসিক বিশ্বভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত

পঞ্চম মুদ্রণ ₹১৫০

নবনীতা দেব সেনের

ভ্রমণবই

ভ্রমণের নবনীতা

নানা মহাদেশের মাটির জলস্পর্শ আছে এ বইয়ে।

দ্বিতীয় সংস্করণ ₹৯০

শঙ্খ ঘোষের

ইছামতীর মশা

কবির দেখা কবির লেখা

একগুচ্ছ অসামান্য ভ্রমণকথা।

দ্বিতীয় সংস্করণ ₹১৫০

প্রতাপকুমার রায়ের

দেশে দেশে

প্রখ্যাত ভ্রামণিকের ভ্রমণগাথা ₹৭৫

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর

বন্ধুভরা বসুন্ধরা

অজানা দেশ দেখে বেড়ানো, অচিন মানুষ চিনে বেড়ানোর আন্তরিক আলেখ্য।

মজবুত বোর্ড বাঁধাই। **দ্বিতীয় সংস্করণ ₹১২০**

প্রতাপকুমার রায় ও হরপ্রসাদ মিত্রের

বহু দেশ ঘুরে

বহুদিন ধরে বহু দেশ ঘুরে দশ দিকের দশটি লেখা ₹৬০

শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরীর

চিন তিব্বত মোঙ্গোলিয়া

চিন, তিব্বত আর মোঙ্গোলিয়া— ভৌগোলিক রহস্যভরা তিন ভুবনে বিচিত্র প্রকৃতি আর মানুষের জীবনস্রোতে ভেসে বেড়ানোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা ₹৬০

রবীন চক্রবর্তীর

বাঁধা পথের বাঁধন ছেড়ে

উত্তর-পূর্ব ভারত আর লাদাখ ভ্রমণে আগ্রহীদের এ-বই পথ দেখাবে।

সঙ্গে খুঁটিনাটি দরকারি তথ্য ₹৬০

ভ্রমণ ট্রেকিং

যাঁরা ট্রেকিং করবেন, এ বই তাঁদের পথ দেখাবে আর ট্রেকিং যাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়, বইটি তাঁদেরও পৌঁছে দেবে প্রকৃতির অমৃতলোকে। মজবুত বোর্ড বাঁধাই।

দ্বিতীয় মুদ্রণ ₹১০০

নেকড়ের চোখ

বড়দের বিখ্যাত ফরাসি লেখক **দানিয়েল পেনাক** ছোটদেরও কত বড় লেখক, সব বয়সের ছোটদের জন্য লেখা তাঁর এই উপন্যাসের পংক্তিতে পংক্তিতে তারই পরিচয়।

মূল ফরাসি থেকে অনুবাদ করেছেন:

মৈত্রেয়ী নাগ ₹৬০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত

সেরা ভ্রমণ কাহিনী

প্রখ্যাত লেখক-পর্যটকদের দেশ-বিদেশ ভ্রমণের অন্তরঙ্গ কাহিনী। ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা। মজবুত বোর্ড বাঁধাই।

প্রথম খণ্ড। তৃতীয় মুদ্রণ। সহস্রাধিক পাতা। ₹৩৫০

দ্বিতীয় খণ্ড। দ্বিতীয় মুদ্রণ। ৭০০ পাতা। ₹২৭৫

কাজের বই

কোন মেশিনে কী ব্যবসা

শুধু মেশিন চিনে, মেশিন কিনে ব্যবসা করুন। কোন মেশিনে কী ব্যবসা, কীভাবে কী করবেন, কোন মেশিন কোথায় পাবেন, কত দাম ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য। দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹৪০

বাংলা সমাস

শিশিরকুমার আচার্য

মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অপরিহার্য। ₹৬০

বাংলা প্রত্যয়

প্রকরণ ও পদ্ধতি

শিশিরকুমার আচার্য

সদ্য বেরিয়েছে ₹৯০

অনলাইনে পেতে

www.swarnakshar.in

লগ অন করুন

মহাশ্বেতা দেবীর বিস্ময়কর বই **তুতুল** ₹২৫

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের **বকবকম**

পাতায় পাতায় মজার ছবি ₹১৫

কানাইলাল চক্রবর্তীর

খুব ছোটদের জন্য এক আশ্চর্য সুন্দর বই

চলো দেখে আসি

শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত। ₹২০

চড়ুইয়ের সঙ্গে ₹১৫

কুমির হয়ে জলে গেল ₹৩০

পূর্ণেন্দু পত্রীর লেখায়-ছবিতে

আমার ছেলেবেলা ₹১৮

পবিত্র সরকারের

কথামালা : ছড়ায় ঢালা ₹১৫

মৈত্রেয়ী নাগের

বাঘ বেড়ালের ছড়া ছবি ₹৩০

আষাঢ়ে গল্প ₹৬০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর

ছোটদের বই

ছেঁড়াকাঁথার গল্প

দ্বিতীয় সংস্করণ ₹৭৫

শাদা ঘোড়া

দেশ-বিদেশের নানা ভাষায় অনূদিত।

পঞ্চম মুদ্রণ ₹৩০

আমাজনের জঙ্গলে

ষষ্ঠ মুদ্রণ ₹৫০

হীরু ডাকাত

শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত

নবম মুদ্রণ ₹৪৫

গৌর যাযাবর

বিশ্বভারতীর আশালতা সেন পুরস্কারপ্রাপ্ত। ₹৪০

টিয়াগ্রামের ফিঙেনদী

যুধাজিৎ সেনগুপ্ত চিত্রিত। ₹১৫

ঋষিকুমার ₹২০

পাখির খাতা ₹৪০

আমার বনবাস ₹১২

তালগাছের ডোঙা ₹২০

হরিণের সঙ্গে খেলা ₹১৫

ভূতের বাঁশি ₹৪০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ছোটগল্প ও কবিতার বই

মৃত্যুর অধিক এই মেরে ফেলা

বোর্ড বাঁধাই ₹৫০

নদী জানে, কচি নিমপাতারাও জানে

বোর্ড বাঁধাই ₹৩০

নিমফুলের মধু

গল্পসংকলন ₹৬০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত

কবিতা-পরিচয়

২১ জন কবির ৪০টি বিখ্যাত কবিতা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা ₹১৫০

স্বর্ণাক্ষর

SWARNAKSHAR PRAKASANI PRIVATE LIMITED

29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019

Ph: 2283-2320 **Fax:** 2287-6448

E-mail: info@swarnakshar.in

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

মদনা

লেখা ও ছবি : চণ্ডী লাহিড়ী

মদনা ছিল জমিদার সেনবাবুদের একমাত্র ষাঁড়। উচ্চতায় সাত ফুট, বাঁকানো ভয়-দেখানো শিং নেই। একগুচ্ছ লোমের ফাঁক দিয়ে শিং জোড়া একটু উঁকি মেরেই বের হতে ভুলে গিয়েছে। চোখেমুখে কোনও রাগের প্রকাশ নেই। শিশুরা ছিল তার খেলার সঙ্গী। দেখতে অতিকায় হলে কী হবে, মদনা নিজেও ছিল শিশু। তার জন্য খড়-বিচালিমিশ্রিত খোল খাওয়ানোর— এক-কথায় দেখভালের জন্য স্পেশ্যাল লোক ছিল। আমি তাকে ছোলা-গুড় মাঝে মাঝেই খাইয়েছি। মদনা বিখ্যাত হয়েছিল পুলিশ তাড়িয়ে গাছে তুলেছিল বলে।

গ্রামে চুরি হয়েছে। ত্রিশ মাইল দূরের থানা থেকে দারোগা এবং দুই পুলিশ এসেছে তদন্ত করতে। পুলিশের মাথায় ছিল লাল পাগড়ি। লাল রং দেখেই খেপে গেল মদনা। আর দেখামাত্র তাড়া করল দুই পুলিশকে। একজন ভয় পেয়ে লাফ মারল পাশের এক পুকুরে, অন্যজন সরসর করে উঠে পড়ল এক নারকেল গাছে। তদন্ত মাথায় উঠল। মদনা এতই খেপে গিয়েছে যে নারকেল গাছের নীচে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল— চলল ফোঁস ফোঁস।

অনেক কষ্টে তার পালক এসে খাবারের লোভ দেখিয়ে মদনাকে তার ঘরে এনে তুলল। এর পরেও পুলিশ গ্রামে এসেছে কিন্তু লাল পাগড়ি পরে নয়।

ক্ষনেরবচন

৬২
অন্যায়ের প্রতিবাদে অন্যায় যে করে
নিজের বিষের ঝাঁজে নিজেই সে মরে।

৬৩
কথা যদি কুকথা হয়, যদি হয় সম্মানঘাতক
সে-দেশ খরায় পোড়ে, দেশবাসী চৈত্রের চাতক।

৬৪
নির্যাতিত মানুষও জেনো নিরাপদ হতে তবু বাঁচে
সহ্য ও সান্ত্বনা খোঁজে জীবনের আনাচে-কানাচে
এই বোধ যদি না থাকে সম্রাটের হৃদয়ে মননে
দেশের মানুষ যেন একসঙ্গে চলে যায় বনে।

৬৫
কবি যদি কথা বলে শাসক সেকথা যেন শোনে
কেননা কবির মন মানুষের দীর্ঘশ্বাস গোনে।

৬৬
চোর মিশে গেলে ধর-ধর-চোর-দলে
উই বাসা বাঁধে সত্যের বল্কলে

ক্ষণকথক ছবি: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

শব্দবক্র

৬৫। ভীতশ্রদ্ধ

বিশেষণ; জনপ্রিয় হবার পর যিনি কষ্টার্জিত শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলার ভয়ে সাধারণ মানুষের বেশে জনসমক্ষে আসতে ভয় পান। > —'আমার আদরের মুনিয়ার দুঃখ দেখে বুক ফেটে যায়! একটু সিরিয়াল করে বলে বেচারি আর পাড়ার মোড়ে গিয়ে ফুচকা খেতে পারে না...'

—'সিরিয়াল তো আমার উনিও কিছু কম করেন না। কই, তাঁকে তো এমন ভীতশ্রদ্ধ হতে হয় না!'

৬৬। রংসাজি

বিশেষ্য; যে অব্যর্থ প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক রং বদলে ফেলে সর্বদাই শাসকদলের স্নেহচ্ছায়ায় ঠাঁই করে নেওয়া যায় > 'তোমার এলাকায় গন্ডগোল তো কিছুতেই কমছে না ভাই...গুন্ডাদের রংবাজি বন্ধ করতে না পারো, অন্তত রংসাজি তো বন্ধ করো। কাউকে তো একটা শাস্তি দিতে হবে না কি!'

৬৭। লড়বড়াই

বিশেষ্য; যে যুদ্ধং দেহি হাঁকডাক শুনলেই বোঝা যায় সত্যিকার লড়াইয়ের কোনও সাহস বা সম্ভাবনা দূরদিগন্তে নেই > 'বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অনেক তো লড়বড়াই দেখালেন মশাই। সাহস করে একটু টোকা দিয়ে দেখুন ভেতরে কেউ আছে কি না, তারপর না হয় চেঁচাবেন।'

৬৮। জতুরঙ্গ

বিশেষ্য; দীপাবলির রাতে দুর্ভাগ্যবশত শরীর ক্লান্ত বা অসুস্থ থাকলে শয্যাশায়ী অবস্থায় বাইরের সরব আনন্দ উদ্‌যাপন শুনতে হলে মনের মধ্যে যে দহন হয়।
— বিকেলের ওষুধটা খাবার পর জ্বালা কি একটু কমেছে?
— রাতদিন জতুরঙ্গে ডুবে আছি, আর আপনি জানতে চাইছেন জ্বালা কমেছে কিনা? আপনি কেমন ডাক্তার মশাই?

৬৯। নিরাশিসিক্কা

বিশেষ্য; খবরের কাগজে কোনও জঘন্য অপরাধের কথা পড়ে আইনের দীর্ঘসূত্রী সমাধানের ওপর যখন আর ভরসা করা যায় না, তখন অপরাধীর রুমালে ঢাকা বা উন্মুক্ত গালে যে কাল্পনিক থাপ্পড়টি কষাতে ইচ্ছে করে।

৭০। ঘুষ্টামেন্ট

বিশেষ্য; যে আইন সংকলন কাউকে ঘুষ না দিয়ে চলতে এবং কোনও সরকারি কর্মচারী ঘুষ চাইলে সুনাগরিকের কর্তব্য সম্পর্কে মানুষকে অবহিত রাখতে সাহায্য করে।

শব্দবক্রমুণি

হেঁয়ালির ছন্দ

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

লোকস্মৃতি, যা নিয়ে ফোকলোর-বিদ্যা, তার বিপুল উপকরণের একটা বড় ভাগ ছড়া-প্রবাদ-হেঁয়ালির ভাগ। হেঁয়ালি— সেও বহুলতই হেঁয়ালি ছড়া। একটু ভাষার বেঁক আর একটু ছন্দের দোলা দুয়ে জোড়া হয়ে সে হয়েছে স্মরণযোগ্য, উপভোগ্য।

লোকমুখের সেসব হেঁয়ালি-কথার ওপরে সংগ্রাহকের ভাষার ছন্দের দাগরাজি চড়েছে কোথাও, অন্তঃকরণ তাতে হয়তো বদলায়নি।

।।১।।
মাঝখানে যেন পাতাল খাদ রে!
রাব করে ওঠে কাৎরে কাৎরে—
কা জা কা জা কা জা কুটু কুটু কুটু,
হাতি ফেল তাও হবে ধুলুকুটু।

।।২।।
লাল দানো, তার গহ্বরে ঘর।
ওপর-নীচে সাদা পাথর।।

।।৩।।
গুচ্ছের পান-খাওয়া দাঁত বের করে ঠায়
বাজারে আছেন বসে জমিদারি কায়দায়।

।।৪।।
এক হেঁয়ালি, এক হেঁয়ালি,
　পারলে জবাব দাও—
শতেক-খানেক চোখ সে লোকের,
　নাক নেই একটাও।

।।৫।।
লোকটা নেবে গেছে মাটির নীচে,
　দাড়িগাছ রয়ে গেছে হাতে।
দাড়িতে টান দিই— হাসতে হাসতে ও মা,
　আসছে উঠে এক কাতে!

।।৬।।
হাট থেকে নিয়েলুম রাঙা—
টন্‌কো যেমন, তেমনি চাঙা।
ক-দিনেই মুখ কালিয়ে
ব'সে ঘর-কোণটা দিয়ে।

।।৭।।
সব সেরা ধন একটি রতন— সকলেরই, নয় কারও,
না পাও না পেলে, দুটি চোখ মেলে দেখে নাও যত পারো।
খোলা মাঠে পড়ে আছে অকাতরে একেবারে অবারিত,
মাসে একবার জেনো শুধু তার মরণ অবধারিত।

।।৮।।
ধাঁধা ভাঙাও তো,
পারো ভাঙাও তো,
লালটু ছেলেটা
সুন্দর মতো,
লাঠি হাতে ক'রে
চড়ে আছে গাছে,
আহা রে! পাথর
বুকে বিঁধে আছে।

।।৯।।
আসব গো, যদি না আসে হঠাৎ চ'লে।
যদি এসে পড়ে, আসব না— তাও
　আগেভাগে যাই ব'লে।

।।১০।।
ঘন ঘন কোদালি, মণ মণ মাটি;
ইংরেজ দখল নিল রাজ্য মাঝরাতে।

।।১১।।
ভবন্তোল বলীবর্দ
আয়েস করেন অলস প্রাণে,
দড়িগাছ তাঁর ঘুরে মরছে
এ বাগানে ও বাগানে।

।।১২।।
যত দাও, দাও পুরে দাও, কিছুতেই
বাড় নেই— খালি কমছেই, কমছেই।

।।১৩।।
মহীরুহ গাছ, অগনতি পাতা-ফুল।
লাখো ফুল-পাতা, একই গাছে জেনো মূল।

।।১৪।।
কুকুরছানারা— কুকুরছানারা—
ছুটছে— ছুটছে— কেবল ছুটছে—
বেদম ছুটছে— লাফিয়ে উঠছে—
শুধু ঘেউ ঘেউ— শুধু ঘেউ ঘেউ—
এক মুহূর্ত থামছে না কেউ—
পা নেই তাদের, হাঁ নেই তাদের,
দাগদোগ নেই ছিরির-ছাঁদের
হাড়গোড় নেই, চোখমুখ নেই,
ঘেউ ঘেউ ছাড়া আর সুখ নেই,
নেই কিছু, তবু জড়িয়ে-মড়িয়ে
মাটি-নুড়ি-গাছ-পাহাড় নড়িয়ে,
আকাশ কাঁপিয়ে, ভুবন দাপিয়ে,
নামছে লাফিয়ে— নামছে লাফিয়ে—

।।১৫।।
ছোটো গিরগিটি বাইছে পাহাড়—
লেজের ডগায় ছ্যাঁদা আছে তার,
যেখানেই যায় ফুটে ওঠে ফুল—
বকুল পারুল পারুল বকুল...

উত্তর:
(১) যাঁতা। *মালয়লম*। (২) জিভ আর দাঁত। *আইরিশ*। (৩) ভাঙা বেদানা। *মারাঠি*। (৪) চালুনি। *বিলিতি*। (৫) কলসি-দড়ি। *গুজরাটি*। (৬) মেটে হাঁড়ি। *তুর্কি*। (৭) চাঁদ। *মারাঠি*। (৮) আপেল। *বিলিতি*। (৯) বৃষ্টি। *কন্নড়*। (১০) ইঁদুর। *মারাঠি*। (১১) লতায় ধারা কুমড়ো বা লাউ। *মালয়লম*। (১২) গর্ত। *বিলিতি*। (১৩) জ্ঞান। *কন্নড়*। (১৪) ঝরনা। *আইরিশ*। (১৫) ছুঁচ আর সেলাই। *আইরিশ*।

অমিতাভ চৌধুরি

। পর্ব ২১।

ডঃ ত্রিগুণা সেন

একদিন ডঃ সেনের ফোন— 'চৌধুরি' একবার আসতে পারেন? যাদবপুরে? আমার ঘরে?' আমার চেয়ে বছর পঁচিশের বড়, কিন্তু বরাবরই আমাকে 'আপনি' বলে ডেকেছেন এবং নামে না ডেকে পদবি 'চৌধুরি' সম্বোধনেই বরাবর ডেকেছেন।

ডঃ ত্রিগুণা সেনের সঙ্গে লেখক। ছবি লেখকের সৌজন্যে।

ডক্টর ত্রিগুণাচরণ সেনের নাম জানি সেই ছোটবেলা থেকে। কলকাতায় যখন পাকাপাকি সাংবাদিক হয়ে এলাম তখন তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর। খুব নামডাক তাঁর। পঞ্চাশের দশকেই তিনি হলেন কলকাতা শহরের মেয়র। তখনকার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন তিনি।

১৯৬১ সালে যখন কাছাড়ে ভাষা-আন্দোলন হয়, আমি তখন শিলচরে, তিনি তখন ওখানে যান এবং আমার সঙ্গে আলাপ হয়। সেই আলাপ পরে ধীরে ধীরে দাঁড়ায় শ্রদ্ধায় ও ভালোবাসায়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যখনই কোনও কাজে যেতাম, পেতাম তাঁর আন্তরিক আপ্যায়ন। বড় ঘর, বড় টেবিল, বসে বড় মাপের মানুষ, কিন্তু টেবিলে কোনও কাগজপত্র নেই। থাকার মধ্যে পাকানো সিগারেটের একটি প্যাকেট ও একটি দেশলাই। লোকজন আসেন, কথাবার্তা হয় সংক্ষেপে এবং চলে যান।

সেই ঘরেই আমি ১৯৬৫ সালে এক মজার কাজ নিয়ে যাই। তখন ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ চলছে। হঠাৎ একদিন ডঃ সেনের ফোন— 'চৌধুরি' একবার আসতে পারেন? যাদবপুরে? আমার ঘরে?' 'নিশ্চয়ই—' আমার তৎক্ষণাৎ জবাব। আমার চেয়ে বছর পঁচিশের বড়, কিন্তু বরাবরই আমাকে 'আপনি' বলে ডেকেছেন এবং নামে না ডেকে পদবি 'চৌধুরি' সম্বোধনেই বরাবর ডেকেছেন।

সেদিন দুপুরেই গেলাম তাঁর ঘরে। দেখি,

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সেখানে তিনি ছাড়া বসে আছেন স্নেহাংশুকান্ত আচার্য, পান্নালাল দাশগুপ্ত, মনুভাই ভিমানি এবং হেমচন্দ্র গুহ— যিনি ডঃ সেনের পর যাদবপুরের উপাচার্য হয়েছিলেন। আমার ওপর অনুরোধ এলো— পূর্ব পাকিস্তানের আলাদা রাষ্ট্র চাই, স্বাধীনতা চাই— এই মর্মে কয়েকটি কথিকা লিখে দিতে হবে। ওই কথিকাগুলো রেকর্ড করে 'আজাদ পূর্ব পাকিস্তান' বেতারে প্রচারিত হবে। সুন্দরবনে গিয়ে লুকিয়ে লঞ্চে খুলনার দিকে এবং অসমের করিমগঞ্জ সীমান্ত থেকে।

আমি তৎক্ষণাৎ রাজি। অনেকগুলো ফরমাশমতো কথিকা লিখে দিয়েছিলাম এবং সেগুলি যথারীতি প্রচারিত হয়েছিল পূর্ব বাংলায়। এই বেতারের মধ্যমণি ছিলেন ডঃ ত্রিগুণা সেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ডঃ সেন ওখানে যান। ১৯৭২ সালের জানুয়ারি। আমিও তখন ঢাকায়। সেখানে পৌঁছনোর পর বঙ্গভবনে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। আমি দেখেছি, কী আন্তরিকতার সঙ্গে দু'হাত বাড়িয়ে মুজিব তাঁকে আলিঙ্গন করেছিলেন। দুজনের তারপর দীর্ঘক্ষণ আলাপ হয়। দুজনের সেই সৌজন্যমূলক দীর্ঘ সাক্ষাতের সাক্ষী ছিলাম আমি। আর ছিলেন নতুন বাংলাদেশ সরকারের ক্যাবিনেটসচিব রুহুল কুদ্দুস। ডঃ সেন ও আমি সেবার একই হোটেল পূর্বাণীতে ছিলাম। আর ছিলেন তাঁর সহযোগী মনুভাই ভিমানি।

ওদিকে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের সুপারিশে ডঃ সেন নির্বাচিত হয়েছেন বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। তখন সেখানে প্রচণ্ড গোলমাল। কিন্তু কী আশ্চর্য, সেই ছাত্ররাই ছাত্রদরদি নতুন উপাচার্যকে স্টেশন থেকে মিছিল করে নিয়ে যায়। আশ্চর্যের ব্যাপার, তাঁরই নেতৃত্বে সেখানে দুদিনেই বিশ্ববিদ্যালয়-প্রাঙ্গণ শান্ত এবং ফিরে এলো শিক্ষার পরিবেশ।

কিছুদিন পর এলো দিল্লিতে তাঁর ডাক। তিনি হলেন ভারতের শিক্ষামন্ত্রী। তিনি তারপর যখন কলকাতায় এলেন, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। শিক্ষামন্ত্রীর পর হন দেশের পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় পদত্যাগ করেন। কিন্তু যাবেন কোথায়? দুই মেয়েই বিবাহিত। নিজের বাড়ি কোথাও নেই। অগত্যা চলে এলেন হরিদ্বার, কনখলে— মা আনন্দময়ীর আশ্রমে। ১৬ বছর আশ্রমে থাকার পর আনন্দময়ী মা-র মৃত্যুর পর চলে আসেন। আশ্রমে তাঁর কাজ ছিল অতিথিদের জুতো পাহারা দেওয়া।

পরে চলে এলেন কলকাতায় কাঁকুড়গাছিতে।

ডঃ ত্রিগুণা সেন

তিনি বলতেন, 'ঈশ্বরই আমার গুরু। আর শ্রদ্ধা করি দুজনকে— ডঃ রাধাকৃষ্ণণ ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। আমার কথা একটিই— সবাইকে ভালোবাসতে হবে।'

তাঁর বড় মেয়ের বাড়িতে। গেরুয়া পোশাক, মুখে সেই স্মিত হাসি। একবার দেখতে গিয়েছিলাম। শিক্ষাজীবন থেকে রাজনীতির জীবন। রাজনীতির জীবন থেকে আধ্যাত্মিক জীবন ডঃ সেন কিন্তু সেই একই আছেন। ১৯৩২ সালে জার্মানি থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি নিয়ে আসার পর তাঁকে বাংলা-ছাড়া করা হয়। তিনি অন্তরীণ ছিলেন তাঁর নিজের জেলা সিলেটে। গুরুসদয় দত্ত ছিলেন তাঁর মাতুল। মাতুলের মতোই তিনি ছিলেন দীপ্তিমান। কিছুদিন তাঁকে থাকতে হয় কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে। আমার সৌভাগ্য এই অসাধারণ মানুষের সাহচর্য ও স্নেহ আমি পেয়েছিলাম।

তিনি বলতেন, 'ঈশ্বরই আমার গুরু। আর শ্রদ্ধা করি দুজনকে— ডঃ রাধাকৃষ্ণণ ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। আমার কথা একটিই— সবাইকে ভালোবাসতে হবে।'

সকলকে তিনি ভালোবেসেছিলেন এবং সবাই তাঁকে ভালোবাসে ও শ্রদ্ধা করে।

বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি

। পর্ব ২২।

সুবোধ ঘোষ

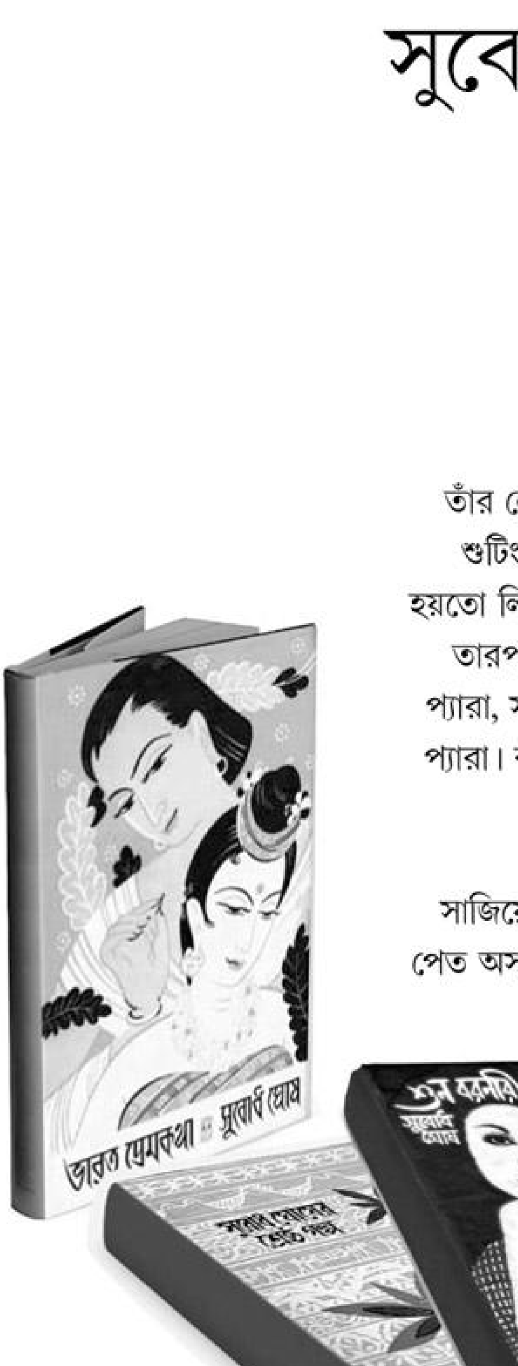

তাঁর লেখা ছিল সিনেমার শুটিংয়ের মতো। প্রথমে হয়তো লিখলেন শেষ পাতা, তারপর মাঝখানের আট প্যারা, সর্বশেষে প্রথম পাঁচ প্যারা। কম্পোজ শেষ হলে সুবোধবাবু নিজেই ওলটপালট করে সাজিয়ে দিতেন। পাঠকরা পেত অসাধারণ একটি গল্প।

তাঁর জীবন সম্পর্কে নানা কাহিনি শুনতাম সেই ছাত্রজীবন থেকে। তিনি রাঁচি-হাজারিবাগ লাইনে বাস কন্ডাক্টার ছিলেন, তিনি সার্কাসের দলে ট্রাপিজের খেলা দেখাতেন, তিনি বৌদ্ধফুজি সেজে ব্রহ্ম সীমান্তে ঘুরেছেন। তিনি হজযাত্রীদের টিকা দেওয়ার কাজ করেছেন। কোনটা সত্যি, কোনটা মিথ্যে যাচাই করিনি, শুধু সুবোধ ঘোষ সম্পর্কে কৌতূহল বেড়েছে। তাঁর লেখা 'অযান্ত্রিক' বা 'চিত্তচকোর' পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। আমার পড়া গল্পের বইয়ের মধ্যে তিনি অন্যতম প্রিয় লেখক।

সেই সুবোধ ঘোষ মশাইকে অত্যন্ত কাছে পেয়েছি আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগ দেওয়ার পর। তিনি তখনই বরেণ্য সাহিত্যিক, পত্রিকার অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর আর আমি একজন সামান্য রিপোর্টার, তবু ক্রমে তাঁর কাছে যাওয়ার সাহস পেয়ে গিয়েছি। প্রথম প্রথম কথা বলার সাহস হয়নি। দেখতাম তিনি টানটান হাঁটেন, নিজের ঘরে বসে সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখেন, সিগারেট খান একটার পর একটা এবং সন্ধের পর লেখা জমা দিয়ে সোজা বাড়ি ফিরে যান। আমি দূর থেকে দেখতাম এবং ভাবতাম এই ভদ্রলোকই 'ফসিল', 'সুন্দরম', 'অলীক', 'পরশুরামের কুঠার' ইত্যাদি গল্প লিখেছেন। গত শতাব্দীর ষাটের দশকের গোড়ায় যখন তাঁর ঘরে যাওয়ার অনুমতি পেলাম, তখন আমার কী আনন্দ। সঙ্গে থাকতেন নীরেনদা, অর্থাৎ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। পিগমিদের আদি বাসস্থান কোথায়, কোন পথে বাঘ প্রথম ভারতে এলো, বোর্নিওতে মশার উৎপাত কতটা ইত্যাদি অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন করে তাঁর উত্তর আদায় করতাম। যা জানতেন তৎক্ষণাৎ বলতেন এবং অজানার উত্তর

ঋত্বিক ঘটক থেকে গুলজার— সুবোধ ঘোষের গল্পের আকর্ষণ এড়াতে পারেননি কেউই। ওপরে বাঁদিকে ঋত্বিক ঘটকের 'অযান্ত্রিক', মধ্যে তপন সিংহ পরিচালিত 'জতুগৃহ', শেষে গুলজারের হিন্দি ছবি 'ইজাজত'-এর দৃশ্য

পরদিন দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিতেন। তাঁর বাড়িতে একটি চমৎকার লাইব্রেরি ছিল। ইংরিজি-বাংলা —সবই প্রবন্ধের বই। একদিন আমাকে তাঁর লেক টাউনের বাড়িতে ডেকে নিয়ে সব দেখাচ্ছিলেন। একটি জায়গায় ফৌজি ইতিহাসের নানা বই। আমাকে বললেন, তাঁর ইচ্ছে আছে দেশ-বিদেশের ফৌজি ইতিহাস নিয়ে একখানি বড় বই লিখবেন। 'ভারতের ফৌজি ইতিহাস' সম্পর্কে তাঁর বই আছে, কিন্তু মূল বই লেখা তাঁর আর হয়ে ওঠেনি।

কত দিকে তাঁর আগ্রহ ছিল, কত দিকে তাঁর জ্ঞান ছিল। আমাদের দেশের আদিবাসী সম্পর্কে তাঁর একখানি চমৎকার বই আছে। 'কালপুরুষের সাতপাঁচ' নামে তাঁর একখানি বই পড়ে কত বিষয়ে যে জানতে পেরেছি, তার তুলনা নেই। তাঁর লেখা 'ভারত প্রেমকথা' তো ক্লাসিক বই। বারবার পড়েও আশ মেটে না।

সুবোধবাবু কোনও সভা-সমিতিতে যেতেন না। কারও সঙ্গে বিশেষ মিশতেন না। কাগজের অফিসে কত হইচই, কত উত্তেজনা। কিন্তু তিনি তারই মাঝখানে সম্পূর্ণ নিরাসক্তভাবে নিজের ঘরে বসে থাকতেন। চুপচাপ আসতেন, চুপচাপ চলে যেতেন। শেষজীবনে সিগারেট খাওয়াও ছেড়ে দিয়েছিলেন।

তাঁর হাতের লেখা ছিল প্রায়-অস্পষ্ট। তাঁর লেখার জন্য আলাদা একজন কম্পোজিটর ছিলেন প্রেসে। সাগরময় ঘোষ তাঁর বইয়ে সুবোধবাবুর গল্প ছাপার কাহিনি শুনিয়েছেন। বিশেষ করে 'থির বিজুরি' নামক অসাধারণ গল্পটির। তাঁর লেখা ছিল সিনেমার শুটিংয়ের মতো। প্রথমে হয়তো লিখলেন শেষ পাতা, তারপর মাঝখানের আট প্যারা, সর্বশেষে প্রথম পাঁচ প্যারা। কম্পোজ শেষ হলে সুবোধবাবু নিজেই ওলটপালট করে সাজিয়ে দিতেন।

সুবোধবাবু কোনও সভা-সমিতিতে যেতেন না। কারও সঙ্গে বিশেষ মিশতেন না। কাগজের অফিসে কত হইচই, কত উত্তেজনা। কিন্তু তিনি তারই মাঝখানে সম্পূর্ণ নিরাসক্তভাবে নিজের ঘরে বসে থাকতেন।

পাঠকরা পেত অসাধারণ একটি গল্প।

সুবোধবাবু প্রচুর গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ রচনা ছাড়াও রিপোর্টিং করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর শান্তিনিকেতনে শ্রাদ্ধশান্তির বিবরণ তিনি পাঠিয়েছিলেন। অসাধারণ ছিল সেই রিপোর্টিং।

সুবোধবাবুর সাহিত্যিক জীবনের শুরু নাটকীয়। তখন তিনি রবিবাসরীয় বিভাগে প্রুফ রিডার। সেখানে সন্ধ্যারাতে বসতো সাহিত্যের আড্ডা। নামকরা সাহিত্যিকরা সেই আসরে একটা না একটা কিছু পড়তেন। সুবোধবাবু ছিলেন নিয়মিত শ্রোতা। একদিন সবাই অনুরোধ করেন সুবোধবাবুকে তাঁর অভিজ্ঞতা নিয়ে কিছু লিখে আনতে। সুবোধবাবু রাজি হন না। অনেক কষ্টে রাজি করানোর পর তিনি একটি গল্প নিয়ে আসেন। নাম 'অযান্ত্রিক'। গল্পটি শুনে সবাই অবাক। অসাধারণ। পরের সপ্তাহে নিয়ে এলেন আরেকটি গল্প। নাম 'ফসিল'। দুটো গল্প ছাপা হলে বাংলা সাহিত্যে তুমুল হইচই। আর ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। গল্পের পর গল্প, উপন্যাসের পর উপন্যাস এবং প্রত্যেকটিতে জয়ের মালা।

সুবোধবাবুর ভাষা প্রসঙ্গে প্রমথনাথ বিশী বলেছিলেন, 'এ হচ্ছে ভাষার মৃদঙ্গ।' সত্যিই তাই, যেন বেজেই চলেছে। সুবোধবাবু অনেক লিখেছেন, উত্তম লিখেছেন, কিন্তু এমনই বরাত যে কোনও বড় সাহিত্য পুরস্কার তিনি পাননি। না অকাদেমি, না রবীন্দ্র। তা না পান, বাঙালির হৃদয়ে তাঁর স্থান চিরস্থায়ী হয়ে আছে। যত পড়ি, তত আনন্দ পাই। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, আজকালকার বাঙালি ছেলেমেয়েরা তাঁর লেখা পড়ে তো! বোধহয় না। কী হল বাঙালির?

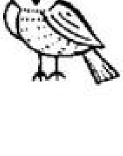

জাহানারা ইমাম

দশ-বারো বছর আগে একবার এক একুশে ফেব্রুয়ারি আর একবার বাংলা নববর্ষে ঢাকার সন্ধানী প্রকাশনীর সাহিত্যানুরাগী কর্ণধার, আমাদের অনেকেরই বন্ধু, গাজী শাহাবুদ্দিন আহমদের আতিথ্যে সারা রাত সারা দিন ঢাকার পথে পথে ঘুরে দেশে ফেরার বেশ কিছুদিন পর গাজী শাহাবুদ্দিন সস্ত্রীক কলকাতায় আমাদের বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন, সেইসময় নিজের প্রকাশনীর একটি বই— জাহানারা ইমামের 'একাত্তরের দিনগুলি' আমাকে উপহার দেন। ওঁরা দেশে ফিরে যাবার দিনই রাতে আমি বইটি শুরু করে ভোরবেলা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি। আমাদের এত কাছে, একদা আমাদেরই ভাঙা হৃদয়ের একটা টুকরো এক ভূখণ্ডের স্বাধীন দেশ হয়ে জন্মানোর রোজকার রক্তাক্ত ঘটনাপঞ্জি এভাবে চোখের সামনে জীবন্ত দেখব কখনও কল্পনাও করিনি। ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ পূর্ব-পাকিস্তানের ওপর পাক সেনার আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে থেকে বিধ্বংসী ঝড় ওঠার আগের থমথমে মুহূর্তের প্রত্যক্ষ বর্ণনা দিয়ে শুরু করে ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হবার পরদিন পর্যন্ত এ এক পরম মূল্যবান ইতিহাসের সজীব ধারাভাষ্য।

১৯৮৬-তে প্রথম প্রকাশের পর ১৯৯৭ পর্যন্ত বাংলাদেশে বইটির বিংশতিতম মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশক গাজী শাহাবুদ্দিন ঢাকা থেকে ফোনে জানালেন, পাকিস্তানেও নাকি এ বইয়ের উর্দু অনুবাদ বেরিয়েছে। আমাদের ঘরের পাশেই বাংলা ভাষাভিত্তিক এই নতুন দেশের জন্মযুদ্ধের একজন ভুক্তভোগী জননী ও জায়ার লেখা এমন মহামূল্য দলিল পাঠ থেকে এপার বাংলার আমরাই বা বাদ থাকব কেন! 'কালের কষ্টিপাথর'-এ বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের এই দৈনন্দিন দলিলের পুনর্মুদ্রণ প্রয়াত লেখিকার স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ। বইটির প্রকাশক ও জাহানারা ইমাম স্মৃতিরক্ষা সমিতির সদস্য গাজী শাহাবুদ্দিনের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, তিনি এই বাংলায় শুধু আমাদেরই এই বই পুনর্মুদ্রণের সানন্দ সম্মতি দিয়েছেন।—সম্পাদক

জাহানারা ইমাম

একাত্তরের দিনগুলি

বারো

২০১৩-র দিনগুলি

রাজাকারদের ফাঁসির দাবিতে উত্তাল ঢাকার শাহবাগ চত্বর। ফেব্রুয়ারি, ২০১৩

শাহবাগের আন্দোলনকারীদের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী (শেখ হাসিনা) বলেন, জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে ঘাতক-দালালদের নির্মূল করার দাবিতে ১৯৯২-এর আন্দোলনে তিনিও শরিক ছিলেন। বেগম সুফিয়া কামালের নির্দেশেই তিনি জাহানারা ইমামের কাছে গিয়েছিলেন। শাহবাগ চত্বরে সেই একই দাবি তুলেছেন তরুণরা। হাসিনা বলেন, "আমার আনন্দ হচ্ছে যে সকলের মধ্যে এই চেতনা ফিরেছে। ফিরে এসেছে 'জয় বাংলা' স্লোগান।"

সূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৯ মার্চ ২০১৩

২৭ জুলাই মঙ্গলবার ১৯৭১

আজ ইমনের জন্মদিন। বেচারা এখনও হাসপাতাল থেকে ছাড়া পায়নি। কী যে দুর্দিন যাচ্ছে আনোয়ারের পরিবারের ওপর দিয়ে।

সকালে ডলি আপাকে সঙ্গে নিয়ে ইমনের জন্য পুতুল কিনলাম। আরও দু'চারটে টুকিটাকি উপহারও কেনা হল।

সাড়ে তিনটেয় ডলি আপা এসে আমায় তুলে নিয়ে হাসপাতালে গেলেন।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে এককাপ চা নিয়ে জুত করে

বসতেই দাদাভাই আর মোর্তুজা ভাই এলেন। এম জি মোর্তুজা এসসো তেল কোম্পানির সিনিয়র এক্সিকিউটিভ— শরীফের বন্ধু। তাঁর বড় ভাই এম জি মোস্তফা ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইনস্যুরেন্স কোম্পানির ম্যানেজার— মোর্তুজার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও দাদাভাই হয়ে গেছেন। সপ্তাহে কমপক্ষে চারদিন আমরা একে অন্যের বাড়িতে যাওয়া-আসা করি।

ঢুকেই দাদাভাই বলে উঠলেন, 'সাতটা তো বেজে গেছে। শুধু চা নিয়ে বসেছেন?'

আমি হকচকিয়ে তাকাতেই দাদাভাই হেসে ফেললেন, 'রেডিও কই? স্বাধীন বাংলা শুরু হয়ে গেছে না?'

স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান আমরা বেশ আগ্রহ নিয়ে শুনি বটে, তবে অন্য কাজের ধকলে মাঝেমধ্যে কিছুক্ষণের জন্য বাদ পড়ে যায়। দাদাভাই আর শরীফের বেলায় তা হবার জো নেই। জামীকে রেডিও আনতে বলে বললাম, 'এত তাড়া কিসের? এইটাই তো আবার সকালে রিপিট হবে।'

'সকালে ম্যাডাম, আমরা চাকরি করি। আপনাদের মতো ঘরে বসে আরাম করার কপাল নিয়ে জন্মেছি নাকি?'

মোর্তুজা জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাবী ইমাম ভাই কই?'

'উনি একটা কাজে মা'র বাসা গেছেন। এক্ষুনি এসে—'

কথা শেষ হওয়ার আগেই বেল বাজল। শরীফ এসে গেছে।

রেডিওটা ডাইনিং টেবিলে রেখে আমরা চারধারে ঘিরে বসলাম।

১ আগস্ট রবিবার ১৯৭১

তিনজন মার্কিন নভোশ্চারী, অ্যাপোলো-১৯ নভোযানে চড়ে কোটি মাইল মহাশূন্য পাড়ি দিয়ে চাঁদের পিঠে নেমে আরামে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আহা, আমি যদি কোনওরকম একটা টুটাফুটা আকাশযান পেতাম, যেটায় চড়ে, মাত্র কয়েকশো মাইল দূরে মেলাঘর বলে একটা জায়গায় নেমে, মাত্র একপলকের জন্য আমার রুমীকে চোখের দেখা দেখে আসতে পারতাম!

রুমী গেছে আজ আটচল্লিশ দিন হল। মনে হচ্ছে আটচল্লিশ মাস দেখিনি। একেক সময় মনে হয় রুমী বলে কেউ কি আছে? রুমী নামের কেউ কি ছিল কোনওকালে? নাকি রুমী একটা অলীক মায়া?

আজ থেকে ডাঃ নূরুল ইসলামের ব্যবস্থাপত্রে ওষুধ খেতে শুরু করেছি। উনি প্রথমে দেখে, রক্ত থেকে শুরু করে এক্স-রে পর্যন্ত যত ধরণের পরীক্ষা আছে, সব করাতে বলেন। সে সবের রিপোর্ট দেখে তারপর ওষুধ দিয়েছেন। দিয়েছেন তো বটে কিন্তু আমি জানি ওসব ওষুধে কোনও কাজ হবে না। আমার আসল ওষুধ আছে মেলাঘরে। সেই ওষুধ কে এনে দেয়!

বিকেলে কলিম এসেছে। তারও খুব মন খারাপ। নীলফামারী থেকে তার ছোট শালা পাওয়ার (লতিফুর রহমান প্রধান) ঢাকায় এসেছে সপ্তাহখানেক হল। সে খবর এনেছে পাক আর্মি তার বড় দুলাভাইকে মে মাসের শেষ সপ্তাহে মেরে ফেলেছে। এই খবর শুনে কলিমের বউ সেলিনা খুব কান্নাকাটি করছে। সেলিনার বড় দুলাভাই মকবুল হোসেন চিলাহাটিতে থাকতেন। খুবই সজ্জন প্রকৃতির লোক ছিলেন। সেলিনার বাবা-মা, পাওয়ারসহ অন্য দুই ছেলে নিয়ে মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত নীলফামারীতে নিজেদের বাড়িতেই ছিলেন। সে সময় নীলফামীরতে ই পি আর, ই বি আর, আনসার, মুজাহিদ ও স্থানীয় যুব সম্প্রদায় মিলে যে প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে উঠেছিল, তাতে সেলিনার বড় ভাই আবু (রাশিদুর রহমান প্রধান) একজন থানা কমান্ডার হিসেবে কাজ করছিল। এপ্রিলের সাত তারিখে পাক আর্মি নীলফামারী দখল করে নিলে এই প্রতিরোধ ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। আরও অনেকের সঙ্গে আবু ইন্ডিয়ায় চলে যায়। পাওয়ার তার মাকে নিয়ে কাছাকাছি এক গ্রামে চলে যায়। বাবাও আলাদাভাবে ইন্ডিয়া চলে গিয়ে তিন মাস পরে নীলফামারীতে ফিরে আসেন। মাকে নিয়ে পাওয়ারও নীলফামারীতে চলে আসে। নীলফামারী থেকে ইন্ডিয়াতে প্রায়-প্রায় লোক যাতায়াত করে। লোকমুখে পাওয়ার খবর পেয়েছে যে আবু এখন স্বাধীন বাংলা বেতারে কাজ করছে। ডাক্তার এ কে খান এক মাসের ছুটি নিয়ে রাজশাহী থেকে ঢাকা এসে পৌঁছেছেন আজ সন্ধ্যায়।

৪ আগস্ট বুধবার ১৯৭১

আজকাল দিনরাতগুলো একেবারে ঠাসা— ঘটনা দিয়ে, মেহমান দিয়ে, নানারকম পিলে-চমকানো শব্দ দিয়ে। ওই পিলে-চমকানো শব্দগুলো কানে না এলে আমাদের ভালোই লাগে না। রাতে ওই শব্দ শুনলে তবে আমাদের আরামে ঘুম আসে। এটা শুধু আমার কথা নয়। দাদাভাই বলেন একথা, মোর্তুজা বলেন একথা, বাঁকা বলেন, ফকির বলেন, পরিচিত বন্ধুবান্ধব অনেকেই হাসতে হাসতে বলেন, 'ভ্যালিয়ামের বিক্রি কমে গেছে। ওই শব্দই আজকাল চমৎকার ঘুম আনে।'

কোনও রাতে ওই শব্দ না শুনতে পেলেই বরং আতঙ্ক জাগে— তবে কি ওরা—

না, ওরা ধরা পড়েনি। সন্ধ্যারাতে যদিবা কোনও কারণে মিস যায়, তো মাঝরাতে হঠাৎ বু-মমম করে বিরাট এক শব্দ চারদিক কাঁপিয়ে

ছেলেগুলোর জানের ভয় বলতে কিছু নেই। গ্রেনেডের মতোই জানটাকেও হাতের মুঠোয় নিয়ে চলে ওরা। স্বাধীন বাংলা বেতারে শুনি যুদ্ধক্ষেত্রে যারা যুদ্ধ করছে, তারাও এমনি অসমসাহসী।

সঙ্গের ছবিতে রেডিওতে স্বাধীন বাংলা বেতারের সম্প্রচার শুনছেন মুক্তিযোদ্ধারা

আমাদের উদ্বিগ্ন স্নায়ুতে আরামের স্নিগ্ধ প্রবাহ বইয়ে দেয়।

ঢাকায় বিচ্ছুদের কাজ-কারবার ক্রমেই দুঃসাহসিক হয়ে উঠছে। এই তো গতকাল সন্ধ্যার আগে দিয়ে স্টেট ব্যাঙ্কের গেটে, মিলিটারি পুলিশের নাকের ডগায়, পথচারীদের চোখের সামনে, কয়েকজন বিচ্ছু বোমা ছুঁড়ে দিয়ে পালিয়ে গেছে। একটাকেও ধরতে পারেনি মিলিটারিরা। ছেলেগুলোর জানের ভয় বলতে কিছু নেই। গ্রেনেডের মতোই জানটাকেও হাতের মুঠোয় নিয়ে চলে ওরা। স্বাধীন বাংলা বেতারে শুনি যুদ্ধক্ষেত্রে যারা যুদ্ধ করছে, তারাও এমনি অসমসাহসী। 'মরলে শহিদ, বাঁচলে গাজি'— জানের কোন পরোয়া নেই, 'জীবন-মৃত্যু, সত্যি সত্যিই ওদের পায়ের ভৃত্য।'

স্বাধীন বাংলা বেতারে গান বাজছে:

তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে।

আমরা ক'জন নবীন মাঝি হাল ধরেছি শক্ত করে রে।

জীবন কাটে যুদ্ধ করি
প্রাণের মায়া সাঙ্গ করি
জীবনের সাধ নাহি পাই।।
ঘরবাড়ির ঠিকানা নাই

দিন-রাত্রি জানা নাই
চলার ঠিকানা সঠিক নাই।।
জানি শুধু চলতে হবে
এ তরী বাইতে হবে
আমি যে সাগর মাঝি রে।।

ঘরবাড়ির ঠিকানাবিহীন, দিনরাত্রির বোধবিহীন, অথই সাগরে দিকচিহ্নহীন জানবাজ ওই নবীন মাঝিদের কথা মনে করে আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম।

৬ আগস্ট শুক্রবার ১৯৭১

আজ আমার জ্বর এসেছে। পরশু থেকেই একটু একটু ঠান্ডা লেগেছিল, ঠিক কেয়ার করিনি, রোজকার মতোই ঘরের কাজ, বাইরের ছুটোছুটি— সব করে গেছি, শরীর তা সইবে কেন? দুপুরে খুকু এসে গোশত আর একটা নিরামিষ রেঁধে দিয়ে গেছে, বারেক কোনওমতে ভাতের ফ্যান গালতে পেরেছে। আমি সারাদিন ডাইনিং রুমে আমার চৌকিটাতে। বিকেলে মা এসেছিলেন। 'এত ঘনঘন অসুখ হচ্ছে— তার আর দোষ কী—' এই ধরণের কিছু একটা বিড়বিড় করে বলে কথা শেষ না করে চুপ করে গেলেন। মা সহজে মনের ভাব চাপতে পারেন না, মুখে খই ফোটে! কিন্তু আজ তিনি যেন নিজেই জোর করে নিজের মুখ বন্ধ করে রাখলেন। তবে কুঁচকানো ভুরু, টেপা ঠোঁট আর সর্ব অবয়বের কাঠিন্য থেকে আমার প্রতি তাঁর অসহনীয় অথচ নীরব অভিযোগ ও অভিমান ফুটে বেরোতে লাগল। তাঁর পেটের মেয়ে হয়ে তাঁর কাছে রুমীর কথা গোপন রেখে ভেতরে ভেতরে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছি,তাঁর সঙ্গে আলাপ করে মনের ভাব হালকা করছি না,— এটা তিনি চোখের সামনে দেখে যেন আর সইতে পারছেন না। আবার কিছু বলতেও পারছেন না আমার কঠিন নীরবতার কারণে।

৮ আগস্ট রবিবার ১৯৭১

আজ জ্বর নেই কিন্তু শরীর এখনও বেশ দুর্বল। সকাল থেকে মেহমানের ভিড় বাড়িতে। একে একে এসেছেন দাদাভাই, মোর্তুজা, ফকির, নূরজাহান, মান্নান, শরীফের আরও দুই ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু ওয়াহিদ ও মিকি, লালু, ডাক্তার, সানু, খুকু, অ্যাডভোকেট মোল্লা, চিশতী। এতগুলো মেহমান, সকাল নটা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত— কিন্তু আলোচ্য বিষয় একটাই। গতকাল সন্ধ্যার পর ফার্মগেটের মিলিটারি চেকপোস্টে গেরিলা অপারেশন।

ফার্মাগেটের মিলিটারি চেকপোস্টটা বেশ বড়সড়। ওখানকার ট্রাফিক আইল্যান্ডের মধ্যখানে দুটো তাঁবুতে অনেকগুলো মিলিটারি পুলিশ। কাছাকাছি ফুটপাতে লাইট মেশিনগান হাতে মিলিটারি। একটু দূরে গ্রিন রোডে

ঢাকার যত কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা, ধানমন্ডি-গুলশানের বড়লোক বাপের গাড়ি হাঁকানো ছেলেরা, খেলার মাঠের চৌকস ছেলেরা, ছাপোষা চাকুরে বাপের ছেলেরা, সব্বাই ওখানে জড়ো হয়েছে। সবাই যুদ্ধ করবার জন্য গেছে।

ঢোকার মুখে মোড়ে একটা সিনেমা হল তৈরি হচ্ছে, সেটার মাথাতেও লাইট মেশিনগান হাতে এক মিলিটারি। অর্থাৎ সব মিলিয়ে এলাহি ব্যাপার-স্যাপার। এইরকম মারাত্মক বিপজ্জনক জায়গায় বিচ্ছুরা যে কাণ্ডটি করল, সেটাও এলাহি কাণ্ড-কারখানাই বটে।

মোর্তুজা চোখ বড় বড় করে বললেন, 'কী কাণ্ড দেখুন তো, কী বুকের পাটা! ওইরকম কড়া সিকিউরিটির মধ্যে দশ-বারোটা খানসেনা মেরে দিয়ে চলে গেল!'

দাদাভাই খুশির হাসি হাসতে হাসতে বললেন, 'তাও চোখের পলকে! এক মিনিটও লেগেছে কি না সন্দেহ।'

ফকির বললেন, 'ওদের কাছে নিশ্চয় মেশিনগান ছিল।'

মিকি— 'অবশ্যই। ব্রাশ ফায়ার ছাড়া অত অল্প সময়ে অতগুলো শেষ করে পালানো যায়?'

শরীফ মুচকি হাসল, 'তা নইলে আর বিচ্ছু বলেছে কেন ওদের!'

নূরজাহান— 'ধরা পড়েনি তো কেউ?'

মান্নান প্রায় ধমকে উঠলেন, 'কি যে বলো তুমি? ওদের ধরা যায়?'

আমি বললাম, 'ওদের চোখেও দেখা যায় না। ক'দিন আগে চরমপত্রে এই নিয়ে বলেছে— জামী বল না।'

জামী বেশ ভালো ক্যারিকেচার করতে পারে, ওর স্মরণশক্তিও খুব তীক্ষ্ণ। মাঝে মাঝেই ও চরমপত্র দু'চার লাইন আওড়ায়। এখন এতগুলো চাচা-চাচীর সামনে প্রথমে একটু লজ্জা পেল, তারপর চরমপত্রের গলা নকল করে বলতে লাগল: 'চাইর মাস ধইরা পাইট করনের পর হানাদার সোলজাররা তাগো কমানডার গো জিগাইছে মুক্তিবাহিনীর বিচ্ছুগুলা দ্যাখতে কীরকম? এই বিচ্ছুগুলা কীরকমের কাপড় পেনদে? এই সব না জানলে কাগো লগে পাইট করমু? আর দুশমনগো খালি চোখে দ্যাখতে পাই না ক্যান?'

মনটা বেশ ফুরফুর করছে। সন্ধ্যার মুখে বাগানে বসে শরীফ, ফকির, আমি গল্প করছিলাম। ফকির দুপুরে আর বাড়ি যাননি। আমাদের সঙ্গেই খেয়েছেন। গেটের সামনে রিকশা থেকে নামল লালু। একটু অবাক হলাম, সকালেই বেরিয়ে গেল, আবার এসেছে— কী ব্যাপার? কোনও খারাপ খবর নয়তো? মনে হয় না, কারণ মুখ তার চাপা হাসিতে উদ্ভাসিত। রিকশা থেকে নেমে দাঁড়াল না। 'বুবু একটু ভেতরে এসো' বলে সোজা ঘরে চলে গেল। আমি পিছু-পিছু উঠে এলাম। লালু খুব আস্তে বলল, 'রুমী এসেছে আমাদের বাড়িতে। শরীফ ভাইকে গিয়ে নিয়ে আসতে বলেছে।'

হঠাৎ যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। চেয়ারে বসে পড়লাম। বাইরে ফকির রয়েছেন শরীফের সাথে। মিনিট খানেক ঝিম মেরে বসে রইলাম, তারপর বাইরে বেরিয়ে বললাম, 'মার হঠাৎ টাকার দরকার হয়ে পড়েছে, তাই লালুকে পাঠিয়েছেন। ওকে টাকা দিলাম। তুমি একটু গাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে এসো। সন্ধে হয়ে গেছে।

জামী হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে বলল, 'সারাদিন লাড়ি বসে আছি, আব্বু, আমিও একটু ঘুরে আসি তোমার সঙ্গে।'

ওরা দু'জনে লালুকে নিয়ে চলে গেল। আমি স্থির হয়ে বসতে পারছি না, মনে হচ্ছে একশো তিন ডিগ্রি জ্বর গায়ে। কান, গলা, চোখ সব যেন গনগন করছে। ফকির বোধহয় কিছু আঁচ করে বললেন, 'সারাদিন বাড়ি ছাড়া আমিও যাই এবার।' সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় হেলিয়ে হাত কপালে তুলে বললাম, 'আচ্ছা, খোদা হাফেজ।'

সদর দরজা বন্ধ করে একবার রান্নাঘরে উঁকি মেরে দেখলাম বারেক কী করছে। সে নিবিষ্টমনে চুলোর সামনে কিছু একটা করছে। দোতলায় ওঠার সিঁড়ির মুখে একটা দরজা আছে, এটা দিয়েও বাইরে বেরোনো যায়। এই দরজার কাছে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগলাম, 'হে ঈশ্বর। এখন যেন কেউ বেড়াতে বা ফোন করতে না আসে।' বুক দুরদুর করছে। রুমী সোজা বাড়ি চলে এলেই তো পারত। এই প্রতীক্ষার উদ্বেগ আর তো সহ্য হয় না।

গাড়ির শব্দ পেলাম। গাড়ি এসে পোর্চে থামল। নিঃশব্দে দরজাটা খুলে দিয়েই দ্রুত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় বেড রুমে চলে গেলাম।

রুমী এসে ঢুকল ঘরে। রুমীর মুখভর্তি দাড়ি, চুল ঘাড় পর্যন্ত লম্বা, তামাটে গায়ের রং রোদে

পুড়ে কালচে, দুই চোখে উজ্জ্বল ঝকঝকে দৃষ্টি, গোঁফের জঙ্গল ভেদ করে ফুটে রয়েছে সেই ভুবন ভোলানো হাসি। রুমী দুই হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল, ওকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম। রুমী ফিসফিস করে বলল, 'আম্মা, আম্মা, থামো। দাদা শুনতে পাবে। তোমার কান্না শুনলে ঠিক সন্দেহ করবে।' দরজার পর্দা পেরিয়েই সিঁড়ির সামনের চারকোণা মাঝারি 'হল'— সেখানে ইজিচেয়ারে বাবা শুয়ে থাকেন। শরীফ আর জামী একদৃষ্টিতে রুমীর দিকে চেয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। রুমী একবার আমার, আরেকবার শরীফের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখলে? কেমন তোমাদের বিবাহবার্ষিকীর আগের দিনটাতে এসে গেলাম!'

একটু সামলে নিয়ে বললাম, 'সোজা বাড়িতে এলি না কেন?' আবেগের উচ্ছ্বাস কমতেই কল্পনার চোখে ভেসে উঠল মায়ের মুখের বিজয়িনীর হাসি, সেই সঙ্গে না-বলা উচ্চকিত বাণী— 'কেমন, এবার হল ত? আমাকে বলা হয়নি। এখন তো সব ফাঁস হয়ে গেল।'

রুমী বলল, 'কী জানি, ভয় পেলাম রিস্ক নিতে। যদি গলির মোড়ে কোনও মিলিটারির সামনে পড়ে যাই, যদি সন্দেহ করে?'

মাসুম বাসায় ছিল না, সে যখন ফিরল, তখন আমাদের আবেগ প্রশমিত, রুমী দাদার সাতকাহন প্রশ্নের অলীক সব জবাব দিয়ে বাথরুমে ঢুকেছে গোসল করতে।

আমরা স্থির করলাম মাসুমের কাছে সত্য গোপন করব না। করা সম্ভবও নয় এক বাড়িতে থেকে।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর আমাদের বিছানায় সবাই গোল হয়ে বসলাম। বললাম, 'এবার বল তোর কাহিনি।'

রুমী একটু হাসল 'কাহিনি যা, তা প্রায় রূপকথার মতোই। মেলাঘরে গিয়ে দেখি— ঢাকার যত কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা, ধানমন্ডি-গুলশানের বড়লোক বাপের গাড়ি হাঁকানো ছেলেরা, খেলার মাঠের চৌকস ছেলেরা, ছাপোষা চাকুরে বাপের ছেলেরা, সব্বাই ওখানে জড়ো হয়েছে। সবাই যুদ্ধ করবার জন্য গেছে। ওখানে গিয়ে আমার আগের চেনা কত ছেলেকে যে দেখলাম! ঢাকা থেকে আগরতলার দিকের এই বর্ডারটা সবচেয়ে কাছে বলে ঢাকার প্রায় সব ছেলেই এই রাস্তা দিয়ে বর্ডার ক্রস করে। তারপর সেক্টর টু'র ওপর দিয়েই অনেকে অন্য সেক্টরে চলে যায়। ঢাকা জেলা কিন্তু সেক্টর টু'র আন্ডারে, তাই আমরা বেশিরভাগ ঢাকার ছেলেরা সেক্টর টুতেই আছি। দেশের চারদিকের বর্ডার ঘিরে যুদ্ধ চলছে, বর্ডারের ঠিক ওপাশেই ভারতের মাটিতে আমাদের সেক্টরগুলোর হেড কোয়ার্টার্স। রেগুলার বাংলাদেশ আর্মির পাশাপাশি আমরা আছি গেরিলা বাহিনী।'

স্বাধীন বাংলা বেতার, আকাশবাণী, বি বি সি থেকে এ সবই শুনে আসছি, কিন্তু সে যেন নেহাত শোনা কথা ছিল। বিশ্বাস করতাম, সত্য বলে জানতাম কিন্তু তবু যেন মন ভরত না। এখন রুমীর মুখে শুনে সমস্তটাই যেন একেবারে বুকের ভেতর গেঁথে গেল।

খানিক পরে একটু উসখুস করে রুমী বলল, 'আম্মা, আমি কিন্তু সিগারেট ধরে ফেলেছি। তোমাকে প্রমিস করেছিলাম না, যে ধরবার আগে জানাব? তা আর হল না।'

মনে পড়ল, রুমী যখন ক্লাস এইটে পড়ে তখনই বলেছিলাম, 'দ্যাখ, সিগারেট যদি ধরিস তো বলে-কয়ে ধরবি। নইলে লুকিয়ে সিগারেট খাবি, আমি জানব না, তারপর আমার বান্ধবী এসে বলবে, রুমীকে সিগারেট খেতে দেখলাম— সে আমার সইবে না।'

রুমী বলেছিল, 'আম্মা, আব্বু যখন খায় না, খুব সম্ভব আমিও ধরব না। তবে যদি ধরিই, অবশ্য তোমাকে আগে জানাব।'

এখন রুমী হাসতে হাসতে বলল, 'ওখানে সিগারেট না ধরে উপায় নেই আম্মা। খাওয়া-দাওয়ার কোনও ঠিক-ঠিকানা থাকে না অ্যাকশানে গেলে, অনেক সময় না খেয়েও থাকতে হয়, কাছে-ভিতে কোনও খাবারই জোটে না। এই সিগারেটটাই একমাত্র জিনিস, যা সঙ্গে রাখা যায়। আম্মা, তোমাদের সামনে খাব, না আড়ালে যাব।'

আমার চোখ পানিতে ভরে গেল। ফেব্রুয়ারি মাসে— মাত্র ছ'মাস আগে আমাদের এই বাড়িতেই আমার সামনে সিগারেট ধরাবার অপরাধে ইশরাককে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলাম। বন্ধুর অপরাধে রুমীকেও কম বকুনি খেতে হয়নি। এখন ধরা গলায় বললাম, 'না, সামনেই খা। অল্প ক'দিনের জন্য এসেছিস। সিগারেট খাওয়ার সময়টুকুও তোকে চোখের আড়াল করতে চাই নে।'

রুমী একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'আম্মা, ডককে তোমার মনে আছে? সেই যে গত বছর ডিসেম্বরে আমরা বরিশালের চরে রিলিফ ওয়ার্ক করতে গিয়েছিলাম—'

'মনে আছে। সেই যে নতুন পাস করা, নতুন বিয়ে করা ডাক্তারটা, আসল নাম আখতার আহমদ। তার কী হয়েছে?'

'সেই ডক সেক্টর টুতে আছে। তার বউ-ও।'

'বলিস কী?' অদ্ভুত যোগাযোগ তো!'

'শুধু কী এইটুকু?' আরও আছে। লুলু আপা, টুলু আপাও ওখানে।'

'ওরাও? ওরা ওখানে কী করছে?'

'সেক্টর টুতে একটা হাসপাতাল করা হয়েছে। ডক ওখানে ডাক্তার, খুকু ভাবী, লুলু-টুলু আপারা ওখানে নার্স।'

শুনে আমি চমৎকৃত। রুমীর কপালটা নেহাত ভালো বলতে হবে। অচেনা জায়গায় গিয়ে ওর কয়েকজন প্রিয় পরিচিত মানুষকে পেয়েছে। গত বছর নভেম্বরের গর্কির পর বেগম সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে একটি রিলিফের দল বরিশালের কয়েকটি বিধ্বস্ত চরে রিলিফ ওয়ার্ক করতে যায়। সে দলে ছিল সদ্য পাস করা ডাক্তার আখতার আহমদ (ডক), রুমী, সুফিয়া কামালের দুই মেয়ে লুলু ও টুলু, কাজী নূরুজ্জামানের স্ত্রী সুলতানা জামান ও দুই মেয়ে নায়লা এহমার ও লুবনা মরিয়ম, রেবা-মিনি ভাইয়ের বড় ছেলে জাহির এবং আরও অনেকে। এই রিলিফ ওয়ার্কের সময় থেকেই রুমী ওদের সকলের সঙ্গে, বিশেষ করে ডক, তার বউ খুকু, লুলু ও টুলুর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

রুমী বলল, 'আরও কী মজা জানো আম্মা? আমি ঢাকা থেকে যাই ১৪ জুন, লুলু-টুলু আপারা অনেকে মিলে একটা বিরাট দল যায় ১৫ জুন। ১৩ জুন আমি ওদের বাসায় দেখা করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু কেউ কাউকে যাওয়ার কথা বলিনি। আমরা যাই মনু ভাইদের সঙ্গে, ওদের দলকে নিয়ে যায় শাহাদত ভাই। ওরা সোনামুড়ার হাসপাতালে যায়। তিন-চারদিন পরে আখতার ভাই ওদেরকে নিয়ে মেলাঘরে বেড়াতে আসে, তখন নাটকীয়ভাবে ওদের সঙ্গে আমার দেখা?'

'আখতার কোন সময় ওদিকে যায়?'

তিনি মেইন রোড দিয়ে না গিয়ে অন্য একটা কাঁচা রাস্তা ধরে শামসেরনগর যান। গিয়ে দেখেন কোথায় কী। নকশালদের চিহ্নমাত্র নেই। পরে জানতে পারেন মৌলভিবাজারের কাছে মেইন রোডের পাশে এক কোম্পানি পাকিস্তানি সৈন্য লুকিয়ে ছিল খালেদ ভাইদের অ্যামবুশ করার জন্য।

বেড়ার ঘরে বাঁশের মাচার বেড, তাতে খড়ের গদি। ডাক্তার, নার্সদের থাকার জায়গাও ওইরকম বেড়ার ঘরে মাচায় বেড। আখতার ভাই শুধু ডাক্তারিই করে না, ফাঁক পেলেই স্টেনগান হাতে অ্যাকশনে বেরিয়ে যায়।

সঙ্গের ছবিতে বিশ্রামগঞ্জের সাময়িক হাসপাতাল

'ক্র্যাকডাউনের পরপরই। আখতার ভাইয়ের কাহিনি তো আরও রোমাঞ্চকর। আখতার ভাই এ বছর জানুয়ারি মাসে আর্মিতে ডাক্তারের চাকরি পেয়েছিল। কুমিল্লায় ফোর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে ওর পোস্টিং হয়েছিল। মার্চের মাঝামাঝি ওই ফোর্থ ইস্ট বেঙ্গলের দুটো কোম্পানিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বদলি করা হয়। মেজর শাফায়াত জামিল, আখতার ভাই এঁরাও ব্রাহ্মণবাড়িয়া চলে যান। আসলে এই বদলি করাটা পাকিস্তানিদের একটা ষড়যন্ত্র ছিল। খালেদ মোশাররফকেও মার্চের শেষে কুমিল্লায় ওই ফোর্থ ইস্ট বেঙ্গলে বদলি করা হয়। তার আগে খালেদ ভাই ঢাকায় কোনও এক ব্রিগেডে, ব্রিগেড-মেজর ছিলেন। ক্র্যাকডাউনের ঠিক আগে আগে খালেদ ভাইকে তার কম্যান্ডিং অফিসার একটা ছুতো করে সিলেটের শামসেরনগরে পাঠিয়ে দিল। ওখানে নাকি নকশালরা ভারত থেকে ঢুকে উৎপাত করছে। তাদের দমন করার জন্য এক কোম্পানি সৈন্য নিয়ে তাকে যেতে বলা হয়। খালেদ ভাই ঠিকই সন্দেহ করেছিলেন পাকিস্তানিরা কিছু একটা সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র আঁটছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুই কোম্পানি সৈন্য পাঠানো হয়েছে। আবার তাকে এখন আরেক কোম্পানি সৈন্য নিয়ে শামসেরনগর যেতে বলা হয়। খালেদ ভাই বুঝতে পারছিলেন এভাবে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট থেকে কোম্পানি এদিক-ওদিক সরিয়ে দুর্বল করে দেওয়া হচ্ছে। খালেদ ভাই একটুখানি সাবধান হয়েছিলেন। যার জন্য তাঁর জীবন বেঁচে যায়। তিনি মেইন রোড দিয়ে না গিয়ে অন্য একটা কাঁচা রাস্তা ধরে শামসেরনগর যান। গিয়ে দেখেন কোথায় কী। নকশালদের চিহ্নমাত্র নেই। পরে জানতে পারেন মৌলভিবাজারের কাছে মেইন রোডের পাশে এক কোম্পানি পাকিস্তানি সৈন্য লুকিয়ে ছিল খালেদ ভাইদের অ্যামবুশ করার জন্য।

'এদিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় হয়েছে কী— মেজর শাফায়ত জামিল, আখতার ভাই আর অন্য যাঁরা ছিলেন, সবাই জেনে গেছেন ঢাকায় কী হয়েছে, কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে কী হয়েছে। রাগে, উত্তেজনায় তাঁদের রক্ত টগবগ করে ফুটছে। কাজেই ২৭ মার্চ সকালেই শাফায়াত জামিলের সঙ্গে আখতার ভাই আর অন্য সবাই রিভোলট করে ওখানকার পাকিস্তানি অফিসারদের গ্রেপ্তার করে ফেলেন। শাফায়ত জামিল আগেই আখতার ভাইকে একটা স্টেনগান ইস্যু করে দিয়েছিলেন লুকিয়ে— কারণ ডাক্তারদের অস্ত্র দেওয়ার কোনও নিয়ম ছিল না। ওদিকে মেজর খালেদ মোশাররফও শামসেরনগর থেকে ফেরত এসে শাফায়াত জামিলদের সঙ্গে যোগ দেন।

'জানো আম্মা, আখতার যখন ওঁদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে থাকে, তখন কিন্তু সে খুকু ভাবীর কোনও খবরই জানত না। খুকু ভাবী কুমিল্লায় ছিল। খালেদ মোশাররফের সঙ্গে আখতার ভাই সিলেটের তেলিয়াপাড়ায় চলে যায়। সেখানকার চা-বাগানে খালেদ ভাই ঘাঁটি করে। সেখানে নিত্যনতুন ছেলেরা জড়ো হতে থাকে ট্রেনিং নেবার জন্য। খালেদ মোশাররফ আখতার ভাইকে বলে, 'তোমার তো এখন কোনও কাজ নেই, তুমি আপাতত এই ছেলেদেরকে ট্রেনিং দিতে শুরু করো। ট্রেনিং কোম্পানি করা হল, আখতার ভাই তার কমান্ডার। ক্যাপ্টেন হায়দারও কিন্তু ওইরকম সময়েই কুমিল্লা থেকে পালিয়ে তেলিয়াপাড়ায় চলে যায় পায়ে হেঁটে। তেলিয়াপাড়ায় সেকেন্ড বেঙ্গল আর ফোর্থ বেঙ্গলের বহু বাঙালি মিলিটারি অফিসার পালিয়ে গিয়ে জড়ো হয়। নাদিমের আব্বাও প্রথমে পালিয়ে এই তেলিয়াপাড়াতেই যান। মেজর জিয়াও তেলিয়াপাড়ায় গিয়েছিলেন খালেদ ভাইদের সঙ্গে মিটিং করার জন্য।

'কিছুদিন পর খালেদ মোশাররফ যখন ভারতের ভেতরে সোনামুড়ায় তাঁর ঘাঁটি সরিয়ে নিয়ে যায়, তখন আখতার ভাইও সেখানে যায়। খালেদ ভাই এবার তাঁকে ক্যাম্প হাসপাতাল তৈরির উদ্যোগ নিতে বলে। ততদিনে বর্ডারে যুদ্ধটুদ্ধ বেশ হচ্ছে। দু'একজন করে মুক্তিযোদ্ধা জখমও হচ্ছে।

'সোনামুড়ায় একেবারে বর্ডার ঘেঁষে শ্রীমন্তপুর বলে একটা বর্ডার আউট-পোস্ট আছে। সেইটার কাছে একটা স্কুলঘরে খালেদ মোশাররফ তার ক্যাম্প করেছে। পাশেই একটা গোয়ালঘর আখতার ভাইকে দেওয়া হল রুগি দেখার ব্যবস্থা করার জন্য। আখতার ভাই দুটো লম্বা তক্তা জোগাড় করে ঘরের দু'পাশে খুঁটির ওপর পাতল, একটা হল রুগির বেড, অন্যটায় ওষুধপাতি, গজ ব্যান্ডেজ সাজিয়ে রাখল। সেইটাই হল সেক্টর টু'র সর্বপ্রথম এক-বেডের ক্যাম্প হাসপাতাল।

'পরে সোনামুড়া ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের একটা বড় ডাকবাংলোয় হাসপাতাল সরিয়ে নেওয়া হয়। এখন হাসপাতাল আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে। আরও অনেক ডাক্তার-নার্স এসে যোগ দিচ্ছে।'

'খুকু কবে গেল?'

'আখতার ভাই শ্রীমন্তপুরে থাকার সময়ই কুমিল্লায় মুক্তিযোদ্ধা পাঠিয়ে খুকু ভাবীর খবর বের করে। তারপর তাকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে। সেটা এপ্রিলের মাঝামাঝি কি তার একটু

পরে হবে।'

আমি নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, 'সত্যিই। রূপকথার চেয়েও রোমাঞ্চকর এসব কাহিনি। শুনে বড় ভালো লাগছে। তুই যে ওখানে গিয়ে আপনজন পেয়েছিস, তাতেই আমার শান্তি। তা সোনামুড়া মেলাঘর থেকে কতদূর? প্রায়ই যাস নাকি?'

'হাসপাতাল এখন আর সোনামুড়ায় নেই তো। জায়গাটা বর্ডারের খুব কাছে ছিল, ওখান থেকে দারোগা বাগিচা বলে একটা জায়গায় সরানো হয়। এখন বিশ্রামগঞ্জ বলে আরেকটা জায়গায় সরানো হয়েছে। এখানেই স্থায়ীভাবে থাকবে বলে ঠিক হয়েছে। মেলাঘর থেকে মাইল আষ্টেক দূরে। আমি মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে যাই ওখানে।'

'কীরকম হাসপাতাল?'

'বেড়ার ঘরে বাঁশের মাচার বেড, তাতে খড়ের গদি। ডাক্তার, নার্সদের থাকার জায়গাও ওইরকম বেড়ার ঘরে মাচায় বেড। আখতার ভাই শুধু ডাক্তারিই করে না, ফাঁক পেলেই স্টেনগান হাতে অ্যাকশনে বেরিয়ে যায়। একবার হল কি, হাসপাতালে ওষুধপত্র নেই, আখতার ভাই একটা জিপে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা সঙ্গে নিয়ে এক জায়গায় বর্ডার ক্রস করে ইস্ট পাকিস্তানের ভেতরে ঢুকে এক হাসপাতাল লুট করল। ফ্রিজ থেকে শুরু করে ওষুধপত্র, অপারেশনের যন্ত্রপাতি, গজ-ব্যান্ডেজ সব একেবারে সা-ফ তুলে নিয়ে এল। আবার, মজা করে একটা রসিদ লিখে রেখে এলো— বাংলাদেশের সৈন্যদের ব্যবহারের জন্য এসব জিনিস নেওয়া হল।'

'মেলাঘরে তোরা কীভাবে থাকিস? কী খাস? জায়গাটা কীরকম? গ্রাম? না আধাশহর?'

'গ্রামও না, আধাশহরও না, একেবারে পাহাড়ি জঙ্গুলে জায়গা। টিলার ওপরে বেড়ার ঘরে, তাঁবুতে আমরা সবাই থাকি। খাওয়া-দাওয়ার কথা আর জিজ্ঞেস করো না। ওইটার কষ্টই সবচেয়ে বেশি।'

জামী ফোড়ন কাটল, 'হ্যাঁ, তুমি তো আবার একটু খেতে ভালোবাস!'

'কী খাবার দেয় সাধারণত?'

'ভাত আর ডাল। কখনও লাবড়া, কখনও মাছ। সকালের নাশতা রুটি আর ঘোড়ার ডাল।'

আমি আঁতকে উঠলাম, 'ঘোড়ার ডাল? সে আবার কী?'

'চোকলা-মোকলাসুদ্ধ এক ধরণের গোটা গোটা ডাল, নর্মাল টাইমে বোধহয় ঘোড়াকে খাওয়ানো হয়। আর রুটি? জানো আম্মা, কতদিন সে রুটির মধ্যে সেঁকা পোকা পেয়েছি।'

'পেয়ে কী করতিস? রুটি ফেলে দিতিস?'

'ফেলে দেব? তুমি কী পাগল হয়েছ আম্মা? সেঁকা পোকাটা নখে খুঁটে ফেলে দিয়ে রুটি খেয়ে নিতাম।'

সঙ্গের ছবিতে সপরিবার জাহানারা ইমাম

আমি একটা নিঃশ্বাস চাপলাম। এই রুমী! যে প্লেট বা গ্লাস আমার চোখে ঝকঝকে পরিষ্কার মনে হত, তার মধ্যেও সে এককণা ময়লা আবিষ্কার করে ফেলত। আবার ধোয়াত। তার জন্য গমের আটা দু'বার করে চেলে নিতে হত। ডাল ধুতে হত যে কতবার, তার হিসাব নেই, কারণ রান্না ডালে একটা খোসা দেখলে সেই ডাল আর খাবে না।

'কিন্তু যাই বল আম্মা, ওই খাবার যে কী অমৃতের মতো লাগত। ওই খাবারও তো সবদিন জুটত না। কতদিন গাছ থেকে কাঁঠাল পেড়ে খেয়ে থেকেছি। মাঠ থেকে তরমুজ, বাঙ্গি, আনারস এসব তুলে খেয়ে থেকেছি।'

'যুদ্ধ মানুষকে কীরকম বদলে দেয়। নইলে তোর মতো খুঁতখুঁতে পিতপিতে ছেলে—'

রুমী একটু দুষ্টু হেসে বলল, 'সত্যিই যুদ্ধ মানুষকে বদলে দেয়। নইলে তোমার মতো কট্টর মা ও—'

আমি হেসে ফেললাম, 'থাম! হয়েছে। এখন বল মেলাঘরে কী কী ট্রেনিং নিয়েছিস?' 'উহুঁ, ওইটি বলা যাবে না। শুধু এটুকু জেনে রাখো ক্যাপ্টেন হায়দার আমাদের কম্যান্ডো-টাইপ গেরিলা ট্রেনিং দিয়েছে। এবং আমরা কিছু নির্দিষ্ট কাজের ভার নিয়ে ঢাকা এসেছি। এর বেশি আর কিছু জানতে চেয়ো না।'

জামী আর মাসুম ঢুলছে। শরীফ হাই তুলে বলল, 'রাত তিনটে। এখন শোয়া যাক। বাদবাকি আগামীকাল শোনা যাবে।'

৯ আগস্ট সোমবার ১৯৭১

আজ আমাদের বিয়ের তারিখ। ২৪ বছর হল। প্রতি বছর আমরা বিবাহবার্ষিকীটা ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে উদযাপন করি। আমি তাকিয়ে আছি সামনের বছরের দিকে, আমাদের বিয়ের পঁচিশ বছর পুরবে। রজতজয়ন্তী উৎসবটা খুব ধুমধাম করে পালন করব।

সকাল থেকে বেশ বৃষ্টি, দুপুরে খিচুড়ি রাঁধলাম। সঙ্গে গোশতের কারি আর শেষে ফজলি আম। এবার আর কাউকে দাওয়াত নয়— নিজেদের মধ্যেই। উদযাপনের মতো মন নেই। উচিতও নয়। তবে রুমী এসেই যেভাবে বলেছে: দেখলে, তোমাদের বিবাহবার্ষিকীর আগের দিনটাতে কেমন এসে গেলাম— তাইতেই একটু কিছু করা।

রুমী দুপুর বারোটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে উঠে গোসল সেরে খাবার টেবিলে এসে খুশি হয়ে গেল।

খেয়ে উঠেই রুমী বেরিয়ে যাচ্ছিল, আগের অভ্যাসবশে ডেকে ফেললাম, 'কোথায় যাচ্ছিস?' রুমী ফিরে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে ভ্রূকুটি করে তাকাল, 'আম্মা নো কোয়েশ্চেন এনিমোর। তবে এবারের মতো বলছি— সেলুনে যাচ্ছি দাড়ি কাটতে। তারপর অন্য কাজ আছে।

আমি বলে উঠলাম, 'দাঁড়া, দাঁড়া, ক্যামেরাটা নিয়ে আসি। একটা ছবি তুলে রাখি।'

রুমী হাসিমুখে মাথা নাড়তে নাড়তে 'নো ওয়ে' বলে বেরিয়ে গেল।

রুমীর এই এক দোষ। কিছুতেই ছবি তুলতে চায় না। গেরিলা হবার অনেক আগে থেকেই

উদযাপনের মতো মন নেই। উচিতও নয়। তবে রুমী এসেই যেভাবে বলেছে: দেখলে, তোমাদের বিবাহবার্ষিকীর আগের দিনটাতে কেমন এসে গেলাম— তাইতেই একটু কিছু করা।

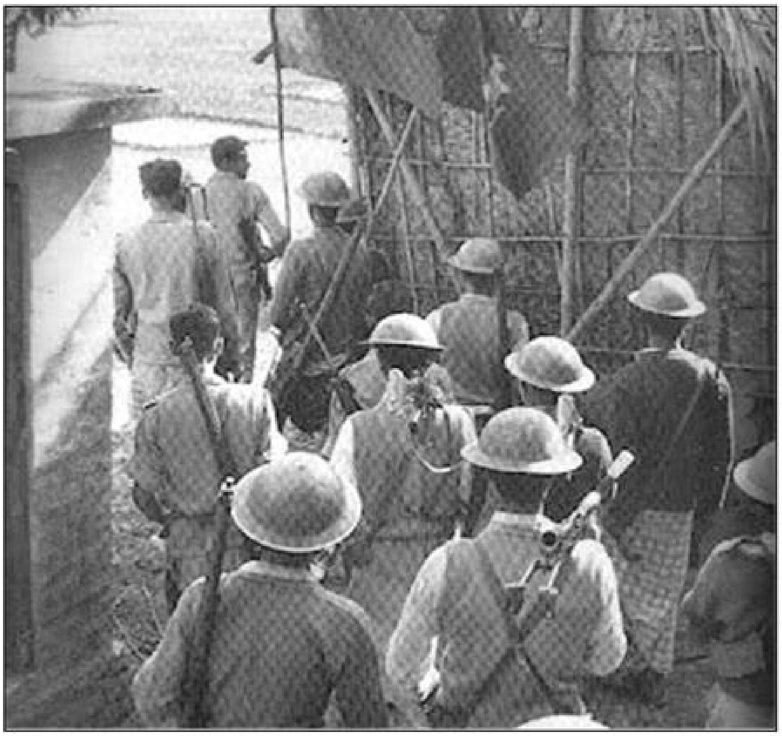

দেখতে কেমন তুমি?
অনেকেই প্রশ্ন করে, খোঁজে/
কুলুজি তোমার আতিপাতি!
তোমার সন্ধানে ঘোরে/
ঝানু গুপ্তচর, সৈন্য, পাড়ায়
পাড়ায়। তন্ন তন্ন
করে খোঁজে প্রতি ঘর।

ওর শখ— গেরিলা হবে। একবার তো প্যালেস্টিনিয়ান লিবারেশন আর্মিতে যাওয়ার জন্য খুব ঝোঁক ধরেছিল। ওর মত হল, গেরিলাদের কোনও ছবি থাকা উচিত নয়। তাহলে ওদের ধরা সহজ হয় না।

রুমী ফিরল সন্ধ্যার পরে। ডাইনিং টেবিল ঘিরে আমি, শরীফ, দাদাভাই, মোর্তুজা, ডাক্তার, ফকির— সবাই বসে খুব লো-ভল্যুমে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনছিলাম। বেল বাজতেই শরীফ দ্রুত হাতে স্টেশনের কাঁটা ঘুরিয়ে দিল। দরজা খুলতে রুমীকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আবার কাঁটা যথাস্থানে নিয়ে গেল। রুমীকে দেখে মোর্তুজা বলে উঠলেন, 'কী রুমী, তোমার যে দেখাই পাওয়া যায় না? যখনই আসি, শুনি তুমি ছাদের ঘরে জুডো প্র্যাকটিস করছ, না হয় বন্ধুর বাসায় গিয়েছো। এত ঘোরাঘুরি করা কি ভালো?'

রুমী সবাইকে সালাম দিয়ে চৌকিটাতে বসল, হেসে মৃদুস্বরে বলল, 'বেশি তো ঘুরি না চাচা। ছাদের ঘরেই বেশি সময় কাটাই। জুডো কারাতে প্র্যাকটিস করি, বই পড়ি, ড্রয়িং করি।'

মোর্তুজা হেসে বললেন, 'তোমার ছাদের ঘর একদিন দেখায়ো।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, দেখা উচিত আপনার। ওর খেয়াল মেটাতে কত খরচ করতে হয়েছে আমাদের, দেখবেন। পুরো ঘরের মেঝে জুড়ে তিন ইঞ্চি পুরু ছোবড়ার গদি বসাতে হয়েছে— ওনারা ধড়াম ধড়াম আছাড় খাবেন, তার জন্য। এককোণে ছাদে আংটা লাগিয়ে আর মেঝেতে তিনমণি কংক্রিট স্ল্যাব বসিয়ে পাঞ্চিং ব্যাগ ঝোলানো হয়েছে— ওনারা ঘুষি মেরে বক্সিং প্র্যাকটিস করবেন বলে।'

দাদাভাই বললেন, 'খুব ভালো কথা তো। কলেজ, ইউনিভার্সিটি বন্ধ, বাইরে বিপদ, বাড়িতেই যদি ব্যস্ত থাকার ব্যবস্থা করা যায়, তবে তার চেয়ে আর কী ভালো হতে পারে? আমাদের ছেলেগুলো তো ঘরে বসে বসে বোরড হয়ে গেল। বাইরে বেরতে দিতেও ভয় লাগে।'

১২ আগস্ট বৃহস্পতিবার ১৯৭১

গত তিনদিন থেকে রুমীর দেখা পাওয়াই দুষ্কর। কখন যাচ্ছে, কখন আসছে, তার ঠিক নেই। পরশুদিন দুপুরে বাসায় খেল দু'জন গেরিলা বন্ধুকে নিয়ে— বদি আর জুয়েল। বদি ইকনমিকসে এম এ পড়ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা ছাত্র। জুয়েলও নামকরা, তবে ক্রিকেটের মাঠে। খাওয়ার পরপরই ওদের নিয়ে রুমী বেরিয়ে গেল, বলে গেল রাতে ফিরবে না।

গতকাল ধলুরা দুপুরে খেল আমাদের বাড়িতে। চিশতীর ছুটি প্রায় শেষ, ওরা ১৫ তারিখে ইসলামাবাদ ফিরে যাবে। খেতে বসে ধলু জিজ্ঞেস করেছিল, রুমী কই? খাবে না? বলেছিলাম 'এসে যাবে এক্ষুনি। আমরা শুরু করে দিই।'

কিন্তু রুমীর আসতে আসতে বিকেল হয়ে গেল। ততক্ষণে ধলুরা চলে গেছে। বললাম, 'রুমী, একবার সময় করে খালা-খালুর সঙ্গে দেখা করে আসিস।' কালকেও ঘণ্টাখানেক বাড়িতে থেকেই আবার বেরিয়ে গেল। বলল, রাতে ফিরবে না।

কিছুই বলছি না, বলবার উপায় তো নেই। কিন্তু রাতে ঘুম হচ্ছে না। জামীর আবার জ্বর দু'দিন থেকে। ডাক্তার দেখে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েছে।

আমারও শরীরটা খুব দুর্বল লাগে। সবসময় বুক ধড়ফড় করে। রুমী সব কথা খুলে বললে মনে হয় এতটা অসুস্থ লাগত না।

আজ দুপুরে খাওয়ার পর টেবিলে রুমীর খাবার ঢাকা দিয়ে চৌকিটাতে শুয়েছিলাম। রুমী এল বিকেলে। এসেই বলল, 'আম্মা, খেতে দাও। বড্ডো খিদে পেয়েছে'— টেবিলের দিকে তাকিয়ে— 'বাঃ আগে থেকেই খাবার রেডি! গুড ওল্ড মাম।'

আমি উঠে ঢাকনা খুলে রুমীর প্লেটে খাবার বেড়ে দিতে দিতে বললাম, 'কাল বিকেলে ইন্টারকনে ভীষণ কাণ্ড হয়েছে। একেবারে ভেতরে একটা ঘরে বিচ্ছুরা বোমা মেরেছে। জানিস?'

'জানি। ঘরে নয়, একতলার লাউঞ্জের পাশের একটা বাথরুমে।'

'তুই ছিলি নাকি?'

'না।'

'যারা ছিল, তাদের চিনিস?'

'আম্মা।' রুমীর গলায় অসহিষ্ণু রাগ।

আমিও হঠাৎ রেগে গেলাম। 'ঠিক আছে, তোকে আর কিছুই জিগ্যেস করব না। তবে জেনে রাখ, আমাদের ম্যালাই সোর্স আছে। এই

ঢাকাতে খবর জেট প্লেনের স্পিডে যাতায়াত করে বুঝলি?'

রুমী হেসে ফেলল, কিন্তু আমি দুমদুম করে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে গেলাম।

খানিক পরে রুমী এসে ঢুকল বেডরুমে, পাশে বসে বলল, 'ইন্টারকনের ভেতরে বোমা মারেনি, ওটা প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ সংক্ষেপে বলে পি কে।'

আমি কথা বললাম না। রুমী বলল, 'যাঁরা করেছে, তাদের তুমি আগে দেখনি। আমিও আগে চিনতাম না। মেলাঘরে গিয়ে আলাপ হয়েছে।'

আমি চুপ। রুমীও খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর বলল, 'ওই যে পি কে, ওটা না, দেখতে একদম পুটির মতো। হলদে রঙের। বড়ই নিরীহ চেহারার। দেখে মনে হবে ফার্নিচারের দোকানের পুটি-ই।'

তবুও কথা বললাম না। আমার শিক্ষা হয়ে গেছে। রুমী যতটুকু বলার ঠিক ততটুকুই বলবে। তার বেশি একটুও না। আমার জিজ্ঞেস করা বৃথা।

রুমী খানিকক্ষণ আপনমনে শিস দিল, তারপর মৃদুস্বরে আবৃত্তি করতে লাগল:

দেখতে কেমন তুমি? কি রকম পোশাক আশাক

প'রে করো চলাফেরা? মাথায় আছে কি জটাজাল?

পেছনে দেখাতে পার জ্যোতিশ্চক্র সন্তের মতন?

টুপিতে পালক গুঁজে অথবা জবর জং, ঢোলা

পাজামা কামিজ গায়ে মগডালে একা শিস দাও

পাখির মতোই কিংবা চা-খানায় বসো ছায়াচ্ছন্ন?

দেখতে কেমন তুমি? অনেকেই প্রশ্ন করে, খোঁজে

কুলুজি তোমার আতিপাতি! তোমার সন্ধানে ঘোরে

ঝানু গুপ্তচর, সৈন্য, পাড়ায় পাড়ায়। তন্ন তন্ন করে খোঁজে প্রতি ঘর।

আমি উঠে বসে জিজ্ঞেস করলাম, 'কার কবিতা এটা?'

'ঢাকার এক বিখ্যাত কবির। নামটা ভুলে গেছি। শাহাদত ভাই আর আলম মাঝে-মাঝে ওঁর কাছ থেকে নিয়ে যায় ওপারে। মেলাঘরে আমরা কবিতাগুলো পড়ি। ভালো লাগলে দু'একটা কপি করে রাখি, তারপর ওগুলো কলকাতায় কার কাছে যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়।'

'এটা তো তোদের নিয়েই লেখা বলে মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, এটার নাম 'গেরিলা'— বাকিটা শোনো:

পারলে নীলিমা চিরে বের

করতো তোমাকে ওরা, দিত ডুব গহন পাতালে।

তুমি আর ভবিষ্যৎ যাচ্ছ হাত ধরে পরস্পর।

সর্বত্র তোমার পদধ্বনি শুনি, দুঃখ-তাড়ানিয়া।

তুমি তো আমার ভাই, হে নতুন, সন্তান আমার।

আমি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে বললাম, 'ওই শাহাদত আর আলম আর আসে না ঢাকায়?'

'আসে, আবার চলে যায়।'

'এবার আসেনি? বলেই সঙ্গে সঙ্গে কথা ঘুরিয়ে আবার বললাম, 'মানে এরপর এলে কবির নামটা জিজ্ঞেস করে নিস।'

রুমী হেসে ফেলল, 'আম্মা ইউ আর সিম্পলি ইনকরিজিবল। ওই কবি ঢাকাতেই বাস করছেন। আমি যে নামটা ভুলে গেছি সেটা ওঁর জন্য মঙ্গল। তুমি আবার জানতে চাও কেন? এতে তোমারও বিপদ, কবিরও বিপদ।'

> 'আম্মা ইউ আর সিম্পলি ইনকরিজিবল। ওই কবি ঢাকাতেই বাস করছেন। আমি যে নামটা ভুলে গেছি সেটা ওঁর জন্য মঙ্গল। তুমি আবার জানতে চাও কেন? এতে তোমারও বিপদ, কবিরও বিপদ।'

এই এক লুকোচুরি খেলা চলছে। রুমী বলছে, সব কথা জানতে চেয়ো না, ধরা পড়লে টর্চারে বলে ফেলতে পার। আমি কখনও লক্ষ্মী মেয়ের মতো, কখনও অভিমানে, রুমীর কথা মেনে নিয়েও খানিক পরে আবার ভুলে গিয়ে প্রশ্ন করে ফেলেছি।

এবার আর রাগ করলাম না। হেসে বললাম, 'সত্যি, কী জ্বালা। খালি ভুলে যাই। বুড়ো বয়সে সব উলটপুরাণ হয়ে গেছে। এখন তুই বাবা হয়েছিস, আমি তোর ছোট মেয়ে। তাই খুব মনের সুখে বকে নিচ্ছিস।'

১৫ আগস্ট রবিবার ১৯৭১

আমাদের সবার মন খুব খারাপ। গতকাল ভোর ছ'টায় জুবলী ফোন করে জানাল যে, রাত দেড়টার সময় মিলিটারি এসে রফিককে ধরে নিয়ে গেছে। কোনওমতে মুখ-হাত ধুয়ে এককাপ চা খেয়ে জুবলিদের বাসায় গেলাম। ঘণ্টাখানেক চুপচাপ বসে থাকলাম। বসে ছিল আরও অনেকে— আতিক, বুলু, রেণু, চান্নু, প্রতিবেশী কয়েকজন। জুবলি মেঘলা, বর্ষণকে কোলের কাছে নিয়ে শূন্য চোখে স্তব্ধ হয়ে বসে ছিল। কারও মুখে কথা ছিল না।

আজ ধলুরা ইসলামাবাদ ফিরে গেল। মা ও লালুকে নিয়ে এয়ারপোর্টে গিয়েছিলাম। একটি বোনের সঙ্গে তবু দেখা হল, আরেকটি বোন বেলু, তার স্বামী আজিজ, তিনটি ছেলেমেয়ে ইসলামাবাদে রয়েছে। তাদের এখন ছুটিতে আসার কোনও সম্ভাবনা নেই। তাদের সঙ্গে কবে দেখা হবে, কে জানে। আদৌ হবে কি না তাই বা কে জানে?

এয়ারপোর্ট থেকে ফেরার পথে জুবলিদের বাসায় গেলাম। রফিকের সঙ্গে একই রাতে আরও তিনজন অধ্যাপককে ধরেছে, তাঁরা হলেন— গণিত বিভাগের শহীদুল্লাহ, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সাদউদ্দিন, আর ইতিহাসের আবুল খায়ের।

মা আর লালুকে জুবলিদের বাসায় রেখে আমি আর শরীফ নিউ মার্কেটে গেলাম।

কদিন থেকে সময় পেলেই বিভিন্ন দোকানে একটা জিনিস খুঁজে বেড়াচ্ছি— ওয়াটার প্রুফ সিগারেট কেস। ওয়াটার প্রুফ ঘড়ি বাজারে পাওয়া যায় কিন্তু ওয়াটার প্রুফ সিগারেট কেস আজ পর্যন্ত কোনও কোম্পানি বানিয়েছে বলে শুনিনি। কদিন আগে রুমী বলেছিল,

'আম্মা দেখো তো এমন একটা সিগারেট কেস পাও কিনা, যেটার ডালা খুব চেপে লেগে থাকে। মানে পানিতে পড়লে যাতে পানি না ঢোকে।' আমি অবাক হয়ে বলেছিলাম, 'কেন, এরকম সিগারেট কেস কেন?'

'আমাদের না, অ্যাকশানে গেলে পাক আর্মি বা রাজাকারদের তাড়া খেয়ে অনেক সময় দৌড়ে পালাতে হয়। কখনও পুকুরে বা নদীতে ঝাঁপ দিতে হয়, কখনও পানির মধ্যে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে শত্রুর দিকে এগোতে হয়, তখন সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই ভিজে গেলে বড্ড কষ্ট হয়— তাই। কয়েকটা লাইটারও কিনো। তবে দেখো, কোনওটাই যেন বেশি চকচকে বা ফ্যান্সি চেহারার না হয়। তাহলে লোভে পড়ে কোনও ছেলে নিয়ে নিতে পারে।'

অতএব, আমরা ক'দিন থেকে ওয়াটার প্রুফ আর পুরনো ঘষটা চেহারার সিগারেট কেস আর লাইটার খুঁজে বেড়াচ্ছি। জিন্না অ্যাভেনিউতে এক দোকানে একটা পেয়েছিলাম, ডালাটা বেশ শক্ত হয়ে লেগে থাকে কিন্তু চেহারা বড় চকচকে। তাই নিইনি।

নিউ মার্কেটে পেলাম না। বললাম, 'জিন্না অ্যাভেনিউরটাই নিয়ে নেব কালকে। ঝামা দিয়ে ঘষে বাইরেটা ম্যাটমেটে করে নেব। আজ আর ভাল্লাগছে না। বাড়ি চলো।'

ফেরার পথে এক কার্টন ৫৫৫ সিগারেট কিনে নিলাম পাড়ার রশীদের দোকান থেকে। বিকেলে রুমী বলল, 'আম্মা, চলো তোমাকে এক বাসায় নিয়ে যাই। তোমার মন একদম ভালো হয়ে যাবে।'

'কোথায়?'

'আগে থেকে বলব না। সারপ্রাইজ।'

মগবাজার চৌমাথা থেকে তেজগাঁও ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ার দিকে একটু এগিয়েই রেললাইন পার হয়ে গাড়ি খানিক সামনে গিয়ে ডাইনে একটা গলিতে ঢুকল। আরও একটুখানি গিয়ে আবার ডাইনে ঢুকে থামল একটা একতলা বাড়ির সামনে— ২৮ বড় মগবাজার। দু'ধাপ সিঁড়ি উঠেই ছোট্ট একটা বারান্দা-রেলিংঘেরা। বারান্দায় চেয়ারে বসে আছে স্বাস্থ্যবান একটি যুবক। উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে আদাব দিল। রুমী বলল, 'মা, এ হল আজাদ। একে তুমি ছোটবেলায় দেখেছ। অনেক বছর আগে এদের বাসায় আমরা অনেক দাওয়াত খেয়েছি।'

মনে করতে পারলাম না কিন্তু ঘরে ঢুকে তার মাকে দেখেই জড়িয়ে ধরলাম। অনেক বছর আগে— তা দশ-বারো বছর তো হবেই— এঁদের বাড়িতে কত গিয়েছি, কত খেয়েছি। আজাদের বাবা মিঃ ইউনুস আহমদ চৌধুরী ব্যবসায়ী ছিলেন, তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছিল আমাদের এক ভাগনে মেছেরের মাধ্যমে। আজাদের মা খুব ভালো রাঁধতেন। আমরা প্রায় প্রায়ই ছুটির দিনে ওঁদের বাড়িতে দাওয়াতে যেতাম আর আজাদের মা'র হাতের অপূর্ব রান্না খেয়ে খুব উপভোগ করতাম। ওঁরা প্রথমদিকে পুরনো ঢাকায় থাকতেন। তারপর মিঃ চৌধুরী নিউ ইস্কাটন রোডে বাড়ি বানালেন। বিরাট বাড়ি— আগাপাস্তলা মোজাইক, ঝকঝকে দামী সব ফিটিংস, আজাদের মায়ের ড্রেসিং রুমটাই একটা বেডরুমের সমান বড়। সামনে অনেকখানি খোলা জমি— বাগানের জন্য। এক পাশে হরিণের ঘর, সেখানে চমৎকার এক হরিণ। আজাদ তখন দশ-বারো বছরের ছেলে। তারপর মাঝখানে বেশ কয়েক বছর কেমন করে জানি যোগাযোগটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। লোকমুখে শুনেছিলাম মিঃ চৌধুরী আরেকটা বিয়ে করেছিলেন।

এখন আজাদের মা নিজেই পুরো ব্যাপারটা বললেন, 'স্বামী আবার বিয়ে করাতে উনি একমাত্র সন্তান আজাদকে নিয়ে স্বামীর সংসার ছেড়ে চলে আসেন বেশ ক'বছর আগে। আজাদ গত বছর এম এ পাস করেছে। অনেক দুঃখধান্দা করে ছেলেকে মানুষ করেছেন। এখন আজাদ চাকরি করবে, এখন আর কোনও দুঃখকষ্ট থাকবে না।

আজাদের মা'র দিকে চেয়ে রইলাম। বরাবরই দেখেছি বাইরে নম্র মৃদুভাষিণী এবং ভেতরে ভেতরে খুব দৃঢ়চেতা কিন্তু এতটা একরোখা তা জানতাম না। এখন অনেক শুকিয়ে গেছেন, পরনে সরু পাড়ের সাদাসিদে শাড়ি, গায়ে কোনও গহনা নেই। আগে দেখেছি— ভরাস্বাস্থ্যে গায়ের রং ফেটে পড়ছে, হাতে-কানে-গলায় সোনার গহনা ঝকমক করছে, চওড়া পাড়ের দামি শাড়ির আঁচলে চাবি বাঁধা, পানের রসে ঠোঁট টুকটুকে, মুখে সবসময় মৃদু হাসি, সনাতন বাঙালি গৃহলক্ষ্মীর প্রতিমূর্তি। সেই মিসেস চৌধুরী স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহের প্রতিবাদে তীব্র আত্মসম্মানবোধে এককথায় প্রাচুর্য ও নিরাপত্তার ঘর ছেড়ে চলে এসেছেন।

একটা নিঃশ্বাস চাপলাম। ইস্কাটনের বাড়িটা আজাদের মায়ের নামে। সেই বাড়ি তিনি ফেলে এসেছেন ছেলের হাত ধরে। থাকছেন ভাড়াবাড়িতে।

ছেলেটিকে দেখে প্রাণ জুড়িয়ে গেল। স্বাস্থ্যবান সুদর্শন যুবক মায়ের মতোই সবসময় হাসিমুখ।

আমরা থাকতে থাকতেই একটি ছেলে এল সেখানে, রুমী মৃদুস্বরে পরিচয় করিয়ে দিল, 'কাজী কামাল উদ্দিন, প্রভিন্সিয়াল বাস্কেটবল টিমের নামকরা খেলোয়াড়। মেলাঘরে পরিচয় হয়েছে। জানো আম্মা, কাজী ভাইকে এবার ন্যাশনাল বাস্কেটবল টিম ক্যাম্পে ডেকেছিল, কিন্তু কাজী ভাই যায়নি।'

১৮ আগস্ট বুধবার ১৯৭১

সকাল থেকে অঝোরে পানি ঝরছে। কদিন থেকেই বেশ ভালো বৃষ্টি হচ্ছে। তবে মাঝে মাঝে থামে। আজ আর থামাথামির লক্ষণ নেই। এরই মধ্যে শরীফ ড্রাইভার আমিরুদ্দিকে সঙ্গে নিয়ে বাজার করে এনে দিয়েছে। রুমীর কয়েকজন বন্ধু দুপুরে খাবে।

২৮ নম্বর রোডের যে বাড়িটাতে ওদের প্রধান আস্তানা, সেখানে ক'দিন অনেক গেরিলা ছেলে এসে গেছে। বড্ড গাদাগাদি, ঠাসাঠাসি। রুমীদের কয়েকজনের আলাদা নিরিবিলি বসে কিছু প্ল্যান করা দরকার। আমাদের ছাদের ঘরটা এ কাজের জন্য একেবারে আইডিয়াল। সারা মেঝে জুড়ে জাজিম পাতা, রুমী জামীর জুডো কারাতে প্র্যাক্টিসের জায়গা। সকালে তার ওপর কয়েকটা চাদর বিছিয়ে ঢেকে দিয়েছি, দোতলা থেকে কতকগুলো বালিশ আর অ্যাশট্রে নিয়ে রেখে দিয়েছি। আর কয়েক প্যাকেট ৫৫৫ সিগারেট।

ছেলেগুলো দশটার মধ্যে এসে ছাদের ঘরে দরজা এঁটে মিটিংয়ে বসে গেছে। মাঝখানে একবার রুমী এসে নিজের হাতে চা-নাশতার ট্রে নিয়ে গেছে।

দেড়টা বেজে গেছে। ওদের নামবার নাম নেই। টেবিলে খাবার দিয়ে নিজেই ছাদের ঘরের সামনে গিয়ে বন্ধ দরজায় টোকা দিলাম। ঘরের মধ্যে কথা শোনা যাচ্ছিল, টোকার শব্দে হঠাৎ সব চুপ হয়ে গেল। আমি একটু চেঁচিয়ে বললাম, 'খাবার রেডি।' একটু পরে দরজাটা একটু ফাঁক করে মুখ বাড়িয়ে রুমী বলল, 'তুমি যাও, আমরা দু'মিনিটের মধ্যে আসছি।' ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ল সারা ঘর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। মনে মনে একটু হেসে নেমে গেলাম। ছাদের ঘরের দরজা-জানালা সব সেঁটে সব পর্দা টেনে ওরা কথা বলছিল।

একটু পরে নীচে খেতে এল ওরা। ওদের মধ্যে কাজী, আলম, বদিকে আগেই দেখেছি। এখন রুমী পরিচয় করিয়ে দিল স্বপন আর চুল্লুর সঙ্গে। এর মধ্যে আলম ছাড়া বাকি সবাই রুমীর চেয়ে কয়েক বছরের বড়। আগে থেকেই রুমীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠত তার চেয়ে বয়সে বড় ছেলেদের সঙ্গে। আর এখন তো যুদ্ধে তেরো থেকে তিরিশ— সবাই একবয়সী।

ছেলেগুলো একেবারে মুখ বুজে খাচ্ছে। আমি বললাম, 'একটু মেলাঘরের কথা বলো না শুনি।'

২০ আগস্ট শুক্রবার ১৯৭১

রাত প্রায় দুটো। ঘুম আসছে না। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। এবারের বর্ষাটা একেবারে পচিয়ে দিল। ঢাকার কতকগুলো নিচু এলাকা আবার পানিতে ডুবে গেছে। বুড়িগঙ্গার পানি বেড়েছে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় খুব বন্যা হচ্ছে। বিশেষ করে পাবনা, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর আর রাজশাহী জেলার অবস্থা খুব খারাপ। রোজই কাগজে বেরচ্ছে কোন কোন নদীর পানি বাড়ছে, কোন কোন জেলার কতগুলো থানা বন্যায় ডুবে গেছে।

অতিরিক্ত বর্ষা আর বন্যা নিয়ে সামরিক জান্তা খুব উদ্বিগ্ন, বিব্রত আর আতঙ্কিত। শুকনো এলাকার পাকিস্তানি সৈন্যরা এরকম বৃষ্টি, বন্যা কাদার মধ্যে একেবারে লেজেগোবরে হয়ে পড়েছে। কিন্তু মুক্তিবাহিনীর জন্য সুবিধে। নদী-হাওড়-বিলের সাঁতার জানা দামাল ছেলেরা পাকসেনাদের খুব জব্দ করেছে। সবাই বলছে আল্লার রহমত মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর। তাই এ বছর এরকম অতিরিক্ত বর্ষা আর বন্যা।

রুমী গতকাল দুপুরেই চলে গেছে বাড়ি থেকে, বলেছে দু'দিন পরে আসবে। ঢাকা

আসার পর থেকেই দেখছিলাম কী অস্থিরতায় ভুগছে রুমী। এতদিনে কারণটা একটুখানি বলেছে। সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন ওড়াবার দায়িত্ব নিয়ে ওদের দলটা ঢাকা এসেছে। কিন্তু এসে দেখে সে পাওয়ার স্টেশন একেবারে দুর্ভেদ্য দুর্গ। আগে যেখানে স্টেশনের ভেতরে এক প্লাটুনের মতো সৈন্য পাহারা দিত, এখন সেখানে এক কোম্পানির মতো সৈন্য। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রোডে মিলিটারি সৈন্য রিকয়েললেস রাইফেল নিয়ে এমুড়ো থেকে ওমুড়ো পর্যন্ত টহল দিচ্ছে। টলহ দিচ্ছে নদীর বুকেও। নৌকোয় চেপে। উলান, গুলবাগ, ধানমন্ডির অ্যাকশানের পর থেকে পাকিস্তান আর্মি ইনটেলিজেন্স দারুণ সতর্ক হয়ে গেছে। ফার্মগেট, ইন্টারকন অ্যাকশানের পর সামরিক জান্তা একেবারে খ্যাপা কুকুরের মতো হয়ে রয়েছে। বস্তুত সারা ঢাকা শহরেই এখন সিকিউরিটির ভয়ানক রকম কড়াকড়ি। সুতরাং সিদ্ধিরগঞ্জের ব্যাপারে ওদের সময় নিতে হচ্ছে, নতুন করে চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে। সিদ্ধিরগঞ্জ ছাড়াও অন্য যেসব অ্যাকশানের নির্দেশ ওদের ওপর আছে, সেইগুলোর দিকে ওরা এখন মনোযোগ দিচ্ছে।

গেরিলাদের অনেক ক'টা দল এখন ঢাকায়। তারা প্রতিদিনই সর্বত্র কিছু না কিছু অ্যাকশান করেই চলেছে। ওদের ওপর নির্দেশই আছে : প্রতিনিয়ত ছোটবড় নানা ধরণের অ্যাকশান করে সামরিক জান্তা এবং পাক আর্মিকে সদাসর্বদা ব্যতিব্যস্ত, বিব্রত ও আতঙ্কিত রাখতে হবে। শহরের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত এমনভাবে অ্যাকশান করবে, যাতে পাক আর্মি মনে করে সারা শহর জুড়ে হাজার হাজার বিচ্ছু কিলবিল করছে।

এবং ওরা করছেও তাই।

এখন রুমীরা কোথায় কী করছে, কে জানে। কোনও বাড়িতে ঘুমিয়ে আছে? নাকি এই বৃষ্টিতেই কোথাও বেরিয়েছে কারফিউর মধ্যে? রাস্তায় গাড়িতে? না, নদীতে নৌকোয়? কে জানে।

সাত-সতেরো ভেবে ভেবে বুকের ধুকপুকানি বেড়ে যাচ্ছে। শুয়ে থাকতে পারলাম না। উঠে রুমীদের ঘরে গেলাম। বাবার ঘরে বাবা আর মাসুম দুটো খাটে। রুমীর ঘরে জামীর খাটে জামী ঘুমে অচেতন। রুমীর খাটের ওপর নিঃশব্দে বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলাম।

মেলাঘরেও কি এখন বৃষ্টি হচ্ছে? বেড়ার ঘরের ফোকর দিয়ে, তাঁবুর নিচ দিয়ে পানি ঢুকে মেঝে ভিজিয়ে দিচ্ছে? পরশুদিন কাজী আর আলমের মুখে মেলাঘরের অনেক গল্প শুনেছি। ওরা প্রথম বর্ডার ক্রস করে এপ্রিলের মাঝামাঝি। মেলাঘরে সেক্টর টু'র হেডকোয়ার্টার হয়েছে জুনের প্রথম দিকে। তার আগে ওরা ছিল মতিনগরে। প্রথম দিকে ওদের অনেক বেশি কষ্ট করতে হয়েছে। প্রায় কিছুই ছিল না। একেবারে শুরুতে গিয়ে উন্মুক্ত আকাশের নীচে ঘাসের ওপর শুয়েছে কতদিন। গায়ের ওপর দিয়ে কেঁচো, বিছে, কত কী চলে গেছে। তারপর তাঁবু জোগাড় হয়েছে, তার মধ্যে স্রেফ চাটাই পাতা। ভাত খেয়েছে মাটির সানকিতে, গ্রেনেডের খালি বাক্স আড়াআড়ি কেটে তার মধ্যে। ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার পান্ডে যখন ওদের ক্যাম্প পরিদর্শনে আসেন, তখন সানকি আর গ্রেনেডের বাক্স দেখে, ওদেরকে বাসন-প্লেট দেবার হুকুম দেন। ছেলেরা বলে 'আমরা বাসন-প্লেট চাই না, তার বদলে আমাদের বুলেট দিতে বলুন।' কী ধাতুতে গড়া এই ছেলেগুলো বাসনের বদলে বুলেট চায়। আর খাওয়া? কতদিন শুধু ডাল আর ভাত, মাঝে মাঝে তরকারির ঘ্যাঁট, কখনও-সখনও মাছ। তাও নুন ছিল না বহুদিন, প্রথম যেদিন ডাল, তরকারিতে নুন দেওয়া হয়েছিল সেদিন খাবার কম পড়ে গিয়েছিল। আলম বলছিল হেসে হেসে, আমার চোখে পানি এসে গিয়েছিল। খাওয়ার পানির অভাব ছিল, ছোট একটা খালমতো ছিল, সেই খালের পানি দিয়েই সব কাজ হত, খাওয়া পর্যন্ত।

মতিনগর থেকে মেলাঘর যাত্রা— ক্যাপ্টেন হায়দারের হুকুমে ক্যাম্প ভেঙে সব গুছিয়ে ঘাড়ে তুলে একরাতে রওনা— সারারাত হেঁটে ভোরবেলা যেখানে থামল, সেটাই মেলাঘর। মতিনগর থেকে ১০/১২ মাইল দূরে। আগের রাতে কোনও খাবার জোটেনি, ঘাড়ে মাথায় বিরাট বোঝা নিয়ে রাতভর হাঁটা, সকালে গাছের কাঁঠাল পেড়ে তাই দিয়ে নাস্তা! তারপর টিলার ওপর ক্যাম্প তৈরি, সব কাজ নিজের হাতে। দোতলা-সমান টিলা নীচে থেকে মাটি কেটে কেটে সিঁড়ি বানানো, সঙ্গে সঙ্গে গাছের ডাল কেটে পুঁতে দেওয়া, যাতে মাটিটা ভেঙে পড়ে না যায়।

রাতের বেলা ঘুম না এলে ভাবনাচিন্তাগুলো খুব তীক্ষ্ণরূপ নেয়। মনে হচ্ছে, মেলাঘর এখন আমার চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছে। তিন-চারদিন আগে এক দুপুরে খাওয়ার পর রুমী বলছিল মেলাঘরের জীবনের কথা। রুমী যখন যায়, তখন ক্যাম্পের জীবনযাপনের মান অনেকখানি উন্নত হয়েছে। অনেক তাঁবু, বেড়ার তৈরি লম্বা ব্যারাক, বাঁশের মাচায় খড়ের গদিতে চাদর, বালিশ। ট্রেনিং ও অ্যাকশানের জন্য অনেক অস্ত্র, গুলি, গ্রেনেড, বিস্ফোরক।

একরাতে রুমীর সেন্ট্রি ডিউটি পড়েছিল কয়েকজন সহযোদ্ধার সঙ্গে। অনেক রাতে টিলার মাথায় রুমী দাঁড়িয়েছিল। চারধারে ছোটবড় আরও কয়েকটা টিলা, এদিক-ওদিক বড় বড় গাছ।

রুমী বলছিল, 'জানো আম্মা, ওখানে তো সন্ধে সাতটা সাড়ে সাতটার মধ্যেই খাওয়া-দাওয়া হয়ে যায়। সারা দিনের প্রচণ্ড খাটুনিতে সবাই অ্যাতো টায়ার্ড থাকে যে আটটা ন'টার মধ্যে বেশির ভাগ ছেলে ঘুমিয়ে যায়। দুয়েকটা তাঁবুতে হয়তো কেউ কেউ আরও খানিকক্ষণ জেগে গানটান গায় কিংবা আড্ডা দেয়। সে রাতে টিলার মাথায় দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখি কী, একটা তাঁবুতে আলো জ্বলছে, আর সেখান থেকে ভেসে আসছে গানের সুর:

হিমালয় থেকে সুন্দরবন হঠাৎ বাংলাদেশ। বুঝলাম আজম খান গাইছে। আজম খানের সুন্দর গানের গলা। আবার অন্যদিকে ভীষণ সাহসী গেরিলা, দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। সেদিন রাতে চারদিক ভীষণ অন্ধকার, অন্যসব ব্যারাক আর তাঁবুর সবাই বাতি নিভিয়ে ঘুমিয়ে গেছে। নটা-দশটাতেই মনে হচ্ছে নিশুতি রাত। ওই একটা তাঁবুর ভেতর হারিকেনের আলো ছড়িয়ে সাদা রঙের পুরো তাঁবুটা যেন ফসফরাসের মতো জ্বলছে। উঁচু থেকে দেখে মনে হচ্ছিল বিশাল অন্ধকার সমুদ্রে যেন একটা আলোকিত জাহাজ। আর আজম খানের গানের সুর, মনে হচ্ছিল যেন চারদিকের ইথারে ভেসে ভেসে হাজার হাজার মাইল ছড়িয়ে পড়ছে। তখন আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছিল।

এখন এই বৃষ্টি ঝরা গভীর রাতের অন্ধকারে আমিও যেন চোখের সামনে দেখতে পেলাম নির্জন পিলার মাথায় কয়েকটি মুক্তিযোদ্ধা ৩০৩ রাইফেল হাতে সেন্ট্রি ডিউটিতে সমস্ত ইন্দ্রিয় টান করে দাঁড়িয়ে আছে, আর তাদের চারপাশ দিয়ে বায়ুমণ্ডলে ভেসে ভেসে যাচ্ছে আজম খানের উদাত্ত গলার গান:

হিমালয় থেকে সুন্দরবন, হঠাৎ বাংলাদেশ
কেঁপে কেঁপে ওঠে পদ্মার উচ্ছ্বাসে,
যে কোলাহলের রুদ্ধস্বরের আমি পাই উদ্দেশ
জলে ও মাটিতে ভাঙনের বেগ আসে।
হঠাৎ নিরীহ মাটিতে কখন
জন্ম নিয়েছে সচেতনতার ধান
গত আকালের মৃত্যুকে মুছে
আবার এসেছে বাংলাদেশের প্রাণ।
... ...
শাবাশ বাংলাদেশ, এ পৃথিবী
অবাক তাকিয়ে রয়!
জ্বলে পুড়ে মরে ছারখার
তবু মাথা নোয়াবার নয়।

ক্রমশ

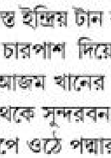

“একটা সময় ক্যালকাটা পেইন্টার্স নিয়ে আমার চব্বিশ ঘণ্টা কাটত। আমার আর অন্য বিলাস ছিল না। আর্ট কলেজ থেকে বেরিয়ে নিজেরা গ্রুপ করে বুঁদ হয়ে থাকতাম। তার কিছুদিন পরে বিকাশদাকে ঘিরে একটা অবলম্বন, স্বপ্ন, সাহস দানা বেঁধেছিল। সেই গ্রান্ট লেনে যাওয়া, একতলার উঠোনে একগাদা চিনা মহিলা কাপড় কাচছে, মুরগিরা হুটোপুটি করছে, বড় বড় গামলায় ফেনায়িত সাবানজলে প্রস্থ প্রস্থ কাপড় কেচেই চলেছে, হৃষ্টপুষ্ট মহিলারা। চুঁইয়ে আসছে ধোঁয়া-ওঠা ভাতের চিনা গন্ধ। প্রশস্ত কিন্তু পিচ্ছিল উঠোন পেরিয়ে কাস্ট আয়রনের ঘোরানো সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি বেয়ে তিনতলা। প্রায় কলকাতার সমবয়সি ওই বাড়ির বারান্দায় উঠে সাড়ে সাত ফুটের দরজা, কেটিদির বাড়ি। সেখানকারই এক বড়সড় ঘরে বিকাশদার স্টুডিও। তারই পাশে কেটিদি ছবি আঁকতেন। কেটি মানে কাতায়ুন সাকলাত। কলকাতার যে প্রাচীনতম পারসি পরিবার, তারই অন্যতম সদস্য উনি। কেটিদি একসময়ের বিকাশদার সহপাঠিনী। এঁদের বন্ধুত্ব-ভালোবাসা লোকগাথার মতো।”

৮

আরেকটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। আগেই বলেছি, আসলে অভিভাবকতুল্য হলেও গৌরদা (গৌরকিশোর ঘোষ), অহিভূষণ মালিকরা ছিলেন আমাদের ইয়ারদোস্তের মতো। তখন আমার চারণের বলয় ছিল সীমিত। স্বপ্ন ছিল, আকাঙ্ক্ষা ছিল, কিন্তু যাত্রাপথ খুব ধোঁয়াশাচ্ছন্ন।

একসময় যেমন বন্ধু অ্যালবার্টের চাপাচাপিতে সেন্ট পলসে মাস্টারির দায়িত্ব নিয়েছিলাম। তার কিছুকাল পরেই অহিদা আর সুধীর মৈত্র আমাকে চেপে ধরলেন। বললেন, এভাবে জীবন কাটিবে না। তুমি একটা চাকরিতে ঢুকে পড়ো। চাকরি করে তো অনেকে ছবি আঁকে। আসলে স্টেটসম্যানে একজন ইলাসস্ট্রেটরের দরকার ছিল। সুধীরদা ছিলেন ওখানকার প্রধান শিল্পী। স্টেটসম্যানের তখন অসম্ভব রমরমা। বাঙালির আভিজাত্যের প্রতীক। তাদের আলাদা আর্ট এজেন্সি ছিল। তার কর্তা ছিলেন অরুণ মৈত্র। সুধীরদা আমাকে বললেন, ‘এটা খুব ভালো জায়গা। তুমি যোগ দাও। এ সুযোগ খুব একটা আসে না।’ ওদের পীড়াপীড়িতে পরদিন আমি ইন্টারভিউ দিলাম। আমার ফলাফল দেখে অরুণ মৈত্র যোগ দিতে বললেন। আমাকে বলা হল নিয়মিত স্টুডিওতে যেতে। আমি কাজ করি, যা বলে তাই এঁকে দিই। কিন্তু মন পড়ে থাকে ক্যালকাটা পেইন্টার্স, প্রদর্শনী, ইতিমধ্যে ঠিক করা বোম্বেতে দলের

প্রদর্শনীতে। পাঁচ-ছ'দিন কাজের পর আমি খুব উৎসাহ নিয়ে দেখা করি অরুণ মৈত্রের সঙ্গে। ভদ্রলোক ছিপছিপে লম্বা, গলায় টাই আঁটা, টিকোলো নাক, ঠিকঠাক চশমা পরা, একটু গম্ভীর প্রকৃতির। দরজা ঠেলে ঢুকতেই বললেন, 'আরে এসো এসো, বসো। কাজ তো ভালোই করছ।' আমি তখন আরও উৎসাহ নিয়ে বলতে থাকি, সামনেই আমাদের গ্রুপ শো বোম্বেতে। এবারে অনেক বড় বড় ছবি এঁকেছি। গোটা জাহাঙ্গির গ্যালারি জুড়ে আমাদের প্রদর্শনী। আগামী মঙ্গলবার সেই সব ছবি নিয়ে আমায় যেতে হবে। প্রদর্শনী শেষে ঠিক দশ দিনের মাথায় ফিরে আসব। উনি শুনলেন, কিছুক্ষণ পর বললেন, 'সে কী! আপনি সবে যোগ দিয়েছেন। এত বড় একটা সুযোগ পেয়েছেন। আর এরই মধ্যে আপনি ছুটি চাইছেন! ছ মাস মন দিয়ে কাজ করার পর আপনার মাইনে একধাপে দু'হাজার হবে। আপনার এখন বারোশো স্কেল। এই টাকা কি কোনওদিন ছবি এঁকে রোজগার করতে পারবেন? ছবি আঁকা একটা ইলিউশান মাত্র। ওতে জীবনে দাঁড়াতে পারা যায় না। আমিও সরকারি আর্ট কলেজের গোল্ড মেডেলিস্ট। কিন্তু দেখেছি, ও মায়া ছাড়া আর কিছু না। ও মায়া না ছাড়লে জীবনে কিন্তু কিচ্ছু হবে না।' বেশ কিছুক্ষণ অভিভাবকের ভঙ্গিতে কথাগুলো বলে গেলেন— 'আপনি ইয়ং বয়, ভালো হাত, কেরিয়ার নিয়ে ভাবুন।' আমি চুপ হয়ে গেলাম। মনে এল, শুধু ছবি আঁকার জন্যই তো সবকিছু ছেড়েছি। জানি, আমার কোনও স্থায়ী রোজগার নেই। স্কুলে কেটেকুটে সাকুল্যে সত্তর কী নব্বই টাকা হাতে পাই। সে সময় বারোশো, আর পাকাপাকি হলে দু'হাজার। এটা সত্যিই অভাবনীয় সুযোগ। এ ভাবনা মনে এলেও আমি দৃঢ় হলাম। আমি তাঁকে বললাম, 'আপনি আমায় অভিভাবকের মতো স্নেহ করেন, যা বলছেন তা সবই ঠিক। কিন্তু আমি ছবি আঁকতেই তো চেয়েছি। বোম্বের প্রদর্শনী অনেক আগে থেকে ঠিক হয়ে আছে। অনেক টাকা দিয়ে গ্যালারি ভাড়া করেছি আমরা। আপনি যদি সত্যিই আমায় স্নেহ করেন আর আমি যদি হেরে যাই, আপনার কাছে ফিরে আসব। আপনি নিশ্চয় তখন আমায় স্থান দেবেন।' চোখ দিয়ে আমার জল গড়িয়ে পড়ে। উনি অনড় থেকে মৃদু হাসেন। সেদিনের কাজ সেরে আমি বেরিয়ে আসি। স্টেটসম্যান তখন প্রাসাদের মতো। বিস্তৃত বারান্দা, ইটালিয়ান মার্বেলে ঢাকা। ভিক্টোরিয়ান গাম্ভীর্যে প্রশস্ত ঘর, মঞ্জিল, দরজা। আমি সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকি। গেটের কাছে আসি। সেই ঘূর্ণায়মান বিশাল কাচের দরজা। শুধু একটা কক্ষে ঢুকে গেলেই স্বচ্ছ কাচের আবরণে বন্দি আমি। ঘুরতেও পারি, বেরোতেও পারি। আমি বেরিয়ে এলাম।

আপনার এখন বারোশো স্কেল। এই টাকা কি কোনওদিন ছবি এঁকে রোজগার করতে পারবেন? ছবি আঁকা একটা ইলিউশান মাত্র। ওতে জীবনে দাঁড়াতে পারা যায় না। আমিও সরকারি আর্ট কলেজের গোল্ড মেডেলিস্ট। কিন্তু দেখেছি, ও মায়া ছাড়া আর কিছু না। ও মায়া না ছাড়লে জীবনে কিন্তু কিচ্ছু হবে না।' বেশ কিছুক্ষণ অভিভাবকের ভঙ্গিতে কথাগুলো বলে গেলেন— 'আপনি ইয়ং বয়, ভালো হাত, কেরিয়ার নিয়ে ভাবুন।'

আর সে কাজে যোগ দিইনি...।

যেভাবেই হোক, একটা সময় ক্যালকাটা পেইন্টার্স নিয়ে আমার চব্বিশ ঘণ্টা কাটত। আমার আর অন্য বিলাস ছিল না। আর্ট কলেজ থেকে বেরিয়ে নিজেরা গ্রুপ করে বুঁদ হয়ে থাকতাম। তার কিছুদিন পরে বিকাশদাকে ঘিরে একটা অবলম্বন, স্বপ্ন, সাহস দানা বেঁধেছিল। সেই গ্রান্ট লেনে যাওয়া, একতলার উঠোনে একগাদা চিনা মহিলা কাপড় কাচছে, মুরগিরা হুটোপুটি করছে, বড় বড় গামলায় ফেনায়িত সাবানজলে প্রস্থ প্রস্থ কাপড় কেচেই চলেছে হৃষ্টপুষ্ট মহিলারা। চুঁইয়ে আসছে ধোঁয়া-ওঠা ভাতের চিনা গন্ধ। প্রশস্ত কিন্তু পিচ্ছিল উঠোন পেরিয়ে কাস্ট আয়রনের ঘোরানো সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি বেয়ে তিনতলা। প্রায় কলকাতার সমবয়সি ওই বাড়ির বারান্দায় উঠে সাড়ে সাত ফুটের দরজা, কেটিদির বাড়ি। সেখানকারই এক বড়সড় ঘরে বিকাশদার স্টুডিও। তারই পাশে কেটিদি ছবি আঁকতেন। কেটি মানে কাতায়ুন সাকলাত। কলকাতার যে প্রাচীনতম পারসি পরিবার, তারই অন্যতম সদস্য উনি। কাতায়ুনের দিদি-জামাইবাবুরা খুব প্রতিষ্ঠিত। গোটা ভারতবর্ষের পারসি পরিবারগুলো যেন একটাই পরিবারের মতো। কলকাতার সমস্ত পারসি ভূ-সম্পত্তির দায়িত্বে ছিলেন কেটিদির বাবা। কেটিদি একসময়ের বিকাশদার সহপাঠিনী। এঁদের বন্ধুত্ব-ভালোবাসা লোকগাথার মতো।

বিকাশদার চিত্রশিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার মূলে যে দুই রমণীর অত্যাশ্চর্য ভূমিকা ও ত্যাগ, সেই দুজনের একজন হলেন তাঁর মা আর অন্যজন কাতায়ুন সাকলাত অর্থাৎ ওঁর বান্ধবী কেটি।

অত্যন্ত দীনদরিদ্র অবস্থা কাটিয়ে বিকাশদা খ্যাতির শিখরে উঠেছিলেন। তাঁর নিষ্ঠা, সৃষ্টিশীলতা আর অর্থনৈতিক সাফল্যের পিছনে এঁদের অবদান অনস্বীকার্য, কেটিদির প্রশস্ত ঘরে কলকাতা সিরিজের সব বড় বড় ছবি, ডল সিরিজের বড় বড় ছবি, তার আগে খানিকটা সুররিয়ালিস্ট ড্রয়িং, কোলাজ এসবই ওই বাড়ি, ওই ঘরকে ঘিরে। কে বলবে বিকাশদা লাহা কলোনির গলিতে, এক দেবোত্তর সম্পত্তির ছোট্ট বাসায়, পুরোহিত মামার অভিভাবকত্বে বড় হয়েছেন। বিধবা মা অক্লান্ত পরিশ্রম করে দুই পুত্রকে মানুষ করেছিলেন। সেই লড়াই করা দিনলিপি থেকে উঠে আসা সেই মানুষ একদিন যেন হয়ে গেলেন এক রূপকথার পুরুষ। এসবই একদিকে স্নেহময়ী জননী, অন্যদিকে বান্ধবীর নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। বন্ধুকে এগিয়ে দেওয়ার কী অকৃত্রিম চেষ্টা তিনি করেছিলেন! সেখানে নারী, প্রেম, বন্ধুত্ব একাকার হয়ে গিয়েছিল। একসময়, আমি রোজ যেতাম বিকেলবেলা। কাজ দেখতাম, গল্পগুজব হতো। মনে আছে, কেটিদির দিদির সংগ্রহের কিছু ডলপুতুল। তার মধ্যে একটি পালিশ করা আসবাবের মাথার ওপর শোয়ানো ছিল। পড়ন্ত বিকেলের আলো লেগেছিল সেই পুতুলের মুখে। চকচকে গায়ে আবলুসে পালিশ করা সেই আসবাবে অদ্ভুত একটা ছায়া তৈরি হতো, সাজানো ছবির মতো। সেই সূত্রপাত ডল সিরিজের। সেই পুতুল কখনও উড়ন্ত, কখনও ঝুলন্ত, কখনও শুধুই দীর্ঘ ক্যানভাসে আলোছায়ার কুশীলব।

আমরা গ্রান্ট লেন থেকে বেরিয়ে বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট ধরে হাঁটা দিতাম কে সি দাসের দোকানে। দোতলায় উঠে যেতাম। গরম রাধাবল্লভী, ছোলার ডাল কিংবা আলুর দম। তারপর বালুসাই অথবা ঘিয়ে ভাজা অমৃত্তি। বিকাশদাও খুব খেতে ভালোবাসতেন এবং খাওয়াতেনও। সেই সময় সেই অমৃত্তির স্বাদ শুধু খাদ্য-স্বাদেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তা উপলব্ধি করতাম মনেও। তারপর আমরা যেতাম সোডা ফাউন্টেনে। ধর্মতলার মোড়ে নিউইয়র্ক সোডা ফাউন্টেনে কবি-শিল্পী-লেখকরা জড়ো হতেন। লম্বা লম্বা টেবিল-বেঞ্চ। ইতস্তত অনেক পরিচিতজন বসে থাকতেন। উল্টোদিকে কেবিন। সেখানে নানা

কিছুক্ষণ ধরে কয়েকবার বেল দেওয়ার পর হঠাৎ দরজা অর্ধেক খোলে। চেনা মুখের দর্শন পাই। শরীর অর্ধেক আড়াল করা, তাঁর সেই সঙ্গিনী ভেতরে। প্রকৃতিস্থ ছিলেন না। সুরা-সাকি নিয়ে মত্ত। এই অবস্থায় আমাকে দেখে মুখে বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট হয়। তিনি জানান যে তিনি দুঃখিত। অনেককিছু কেনাকাটা হয়ে গিয়েছে। ছবি সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার মতো জায়গা নেই। বলেন, ভবিষ্যতে যখন আসবেন তখন আবার যোগাযোগ করবেন। বলেই সজোরে দরজা বন্ধ করে দেন।

ধরণের কারবারিরা আসত। কলগার্ল থেকে কালোপথের ব্যবসায়ী, নানারকম লোক, নানারকম কাজ। একটা বেঞ্চে গণেশদা প্রত্যহ গিয়ে বসতেন। নিজে কথা বলতেন কম, শুনতেন বেশি। গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের বিনোদ থেকে শুরু করে অনেক তরুণ শিল্পী তাঁকে ঘিরে থাকত। এছাড়াও সমসাময়িক শিল্পী, যাঁরা গণেশদার গুণগ্রাহী, তাঁরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা সোডা ফাউন্টেনে বসে থাকতেন এমনি এমনি। বিকাশদা একেবারে অন্য মেজাজের মানুষ ছিলেন। ছটফটে, অন্যের কথা শোনার ধৈর্য কম। আড্ডার মেজাজ যে সুরে বাঁধা থাকে সে সুরের সঙ্গে বিকাশদার সুরের কোনও মিল ছিল না। আমারও ছিল না কিন্তু আমি তাল দিতাম। বিকাশদার সঙ্গে থাকলে তালও থাকত না। খানিকটা বসা, খানিকটা দাঁড়ানো, খানিকটা খোঁজ করা।

কিন্তু যেতাম। কিছুক্ষণ হয়তো এ টেবিল-ও টেবিল, উল্টোদিকে জি সি লাহার সামনে ট্রামে উঠে পড়তাম। তখন এসপ্ল্যানেডগামী যাত্রীরা প্রায় নেমে পড়েছেন। সেই ট্রাম ময়দানে একপাক ঘুরে রুট বদলাত। তখন আমরা শ্যামবাজারগামী ট্রামে জোড়া সিট দখল করে পাশাপাশি বসতাম। দুয়েকটা স্টপেজের মধ্যে সে গাড়ি যাত্রীতে ভরে যেত। কলকাতায় তখন রাত নেমে যেত সাড়ে ন'টার মধ্যেই। ধর্মতলাও নিভন্ত। ইতিউতি মাতালরা, হাজারদুয়ারিওয়ালা, খালাসিটোলার খদ্দেররা সে ট্রামে উঠে পড়ত। ভিড়, কর্কশ আওয়াজ যত বাড়ত বিকাশদার গলার জোরও বাড়ত তত বেশি। বধির মানুষেরা যেমন পরস্পর আলাপচারিতায় শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে কাজে লাগান, বিকাশদাও হাত-পা নেড়ে কথা বলতে থাকতেন। এমনকি গোপন কথাও বলতেন সেভাবেই।

বিকাশদার প্রতিষ্ঠা পাওয়া, খ্যাতিলাভ থেকে শেষপর্যন্ত গোটা জীবনটাই আমার চোখে দেখা। সেই লাহা কলোনির দীর্ঘ বাস থেকে তাঁর ক্রমশ উত্থান। রাজকীয় সম্মান থেকে অর্থ-উপার্জনের তুঙ্গ অবস্থা... মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে তাঁর চলাফেরার ক্ষমতা হারিয়ে যাওয়া, কাজ করতে না পারার জন্য তাঁর কষ্ট। চোখে দেখা যায় না। এভাবে বড় কঠিন দুঃখের সরণি বেয়ে তাঁর লৌকিক জীবনের সমাপ্তি।

তাঁর প্রতি, একসময় আমার মনে ভয়ংকর অভিমান জমেছিল। আমি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসার দাবিদার ছিলাম, অনেকের চেয়ে একটু বেশিই। মাঝে কিছুকাল তাঁর খ্যাতি, অর্থ তাঁকে এক কৃত্রিম আত্মবিশ্বাসে অন্ধ করে দিয়েছিল। তিনি কানে দেখতে শুরু করেছিলেন। তাই আমি একটু দূরে সরে এসেছিলাম। শেষের দিকে সেসব আর ছিল না। নিষ্ঠা একাগ্রতা একজন মানুষকে কোথায় পৌঁছে দিতে পারে তা বিকাশদার জীবন দেখলেই বোঝা যায়।

আমাদের সময়ে, বিশেষ করে আমার ছবিজীবন স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বিকাশদাকে এক রূপকথার চরিত্রের মতো আজও দেখতে পাই। ক্যালকাটা পেইন্টার্সের সঙ্গে আমার গভীর সম্পর্ক পাঁচ-ছয় বছরের বেশি নয়। কোনও মানুষই স্পষ্টবাদী মানুষদের খুব একটা আমল দিতে চান না, আমার মনে হতে লাগল যে, আমি তাল রাখতে পারছি না। অনেকেই ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়। শেষে একদিন ঠিক করলাম, আমি একাই হাঁটব। কিন্তু আমার এ ছবিজীবনে ক্যালকাটা পেইন্টার্সে কয়েক বছর যুক্ত থেকে কত কিছু জেনেছি, কত কিছু শিখেছি, কত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, ভাবলে বিস্ময় লাগে, কৃতজ্ঞতার বোধ হয়। রবীনদার সঙ্গে আমি একলা গোটা দলের ছবি সঙ্গে নিয়ে দিল্লি গিয়ে, মুম্বই গিয়ে প্রদর্শনী করেছি। ট্রেন থেকে ছবি খালাস করা, কুলিদের মারাত্মক দৌরাত্ম্য, অকট্রয়ের অযৌক্তিক দাবি— যা সেই গরিব দলের পক্ষে মেটানো সম্ভব ছিল না, তার জন্য তখন নানান কৌশল অবলম্বন, কলহ, বিবাদ করা... সে-এক ধুন্ধুমার কাণ্ড। রবীনদা নিরুপদ্রব, কম কথার লোক আর আমি একেবারে তার বিপরীত। একবার মনে আছে, এক কুলিকে রাজি করিয়ে একটি ট্রলি সঙ্গে নিয়ে ভিটি থেকে জাহাঙ্গির আর্ট গ্যালারিতে ছবির বাক্সগুলি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেই ঘিঞ্জি রাস্তায় পায়ে হেঁটে কীভাবে যেতে হয়েছিল, আজও মনে পড়ে। কলকাতায় বাক্স প্যাকিং করা, হাওড়ায় ট্রেনে লোড করা— সমস্তই করতাম আমরাই। কথা দিয়ে কথা রাখতেন না অন্য সদস্যরা। এমনকি তাঁদের দেয় অংশের টাকাও দিতেন না। ছবি জোগাড় করা, প্ল্যাকার্ড ঠিক করা, প্রতিটি ছবিকে ঠিকঠাক মোড়া, কার্ড ছাপানো, ক্যাটালগ ছাপানো, মেলিং লিস্ট ঠিক করে জি পি ও থেকে পোস্ট করা। অত্যন্ত পরিশ্রমের এসব কাজ করেছি, এতে আমার অনেক শেখাও হয়েছে। এ সমস্ত প্রদর্শনী থেকে হয়তো দুয়েকটা ছবি বিক্রি হত কিংবা হত না। কতবার যে হতাশ হয়ে ফিরেছি তার ইয়ত্তা নেই। ক্রফোড মার্কেট এলাকায় একটি পুরনো প্রায়ান্ধকার হোটেলে থেকেছি, যেখানে একচিলতে শয্যায় অসংখ্য রক্তপিপাসুর সঙ্গে রাত কাটাতে হতো। হয়তো দৈনন্দিন শয্যার মূল্য দিয়েছি পঁচিশ টাকা মাত্র, তার জন্য মনে হয় রক্ত দিতে হতো। ক্রফোড মার্কেট থেকে ভিটি ছাড়িয়ে সোজা হাঁটাপথে জাহাঙ্গির গ্যালারি পৌঁছনো আর রাতে ফেরা। এরই মধ্যে কিছু বিশেষ মানুষের সঙ্গে দেখা করা, সমালোচকদের আমন্ত্রণ জানানো, আর বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার মতো কখনোসখনো কোনও বিত্তশালী মানুষের নিমন্ত্রণ পেতাম রাতের খাবারের জন্য।

আমাদের কাছে মুম্বই শহরের একটা আকর্ষণ ছিল জাহাঙ্গির আর্ট গ্যালারি। তখন ভারতবর্ষে এত জনপ্রিয়, সহজগম্য শিল্পকলার ক্ষেত্র আর ছিল না। স্যার কাউয়াসাজি জাহাঙ্গিরের নামে এই গ্যালারি, ট্রাস্টির দ্বারা পরিচালিত ছিল।

সারা ভারতের নবীন-প্রবীণ শিল্পীদের অন্যতম প্রধান আকর্ষণস্থল। এর ওপরতলায় ছিল গ্যালারি কেমল্ড। কেকু গান্ধির গ্যালারি। ইনি ভারতের সমকালীন চিত্রকলা ব্যবসার অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও পথিকৃৎ। অক্সফোর্ডে শিক্ষিত, সুদর্শন, বিনয়ী, ভারতীয় পারসি সমাজের আদর্শ প্রতিনিধি ও ধনী। একসময় বিশেষ ধরণের ছবির ফ্রেমের ব্যবসায় এঁর কোম্পানিই ছিল অগ্রদূত।

প্রদর্শনীর দরজা খুললেই হল। এখানকার

১৯৭৪ সালে এল কে এ, নয়াদিল্লিতে ক্যালকাটা পেইন্টার্স গ্রুপ শোতে (বাঁদিক থেকে) নীরেন সেনগুপ্ত, শুভাপ্রসন্ন, তপন ঘোষ ও রবীন মণ্ডল

সময় সকাল এগারোটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা। কলকাতায় যেমন বিকেল থেকে সন্ধ্যা, তা নয়। আমার বিস্ময় লাগত যখন দেখতাম, কর্তব্যরত পুলিশরা কাজের ফাঁকে গ্যালারিতে ঢুকে ছবি দেখছেন। সেই সকালে, স্নান সেরে হোটেলে কিছু একটা খেয়ে হাঁটাপথে চলে যেতাম। তারপর সময়মতো পৌঁছে গ্যালারির সামনে বসে থাকা— কাঙ্ক্ষিত-অনাকাঙ্ক্ষিত মানুষজনের জন্য। যতদূর সম্ভব আমরা গ্যালারি সাজাতাম আমাদের মতো করে। সমালোচকরা আসতেন, চেনা-অচেনা শিল্পীরা আসতেন। আলাপ-পরিচয় হতো, আড্ডা চলত ঘরে বসে। তারই মধ্যে কোনও উৎসাহী দর্শকের মনস্তত্ত্ব বুঝে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণও করতে হতো, যদি তিনি আমাদের ছবি পছন্দ করে ফেলেন। প্রতিদিনই নতুন নতুন অভিজ্ঞতা হতো।

একবার মনে আছে, খুব বড় বড় ছবি সাজানো হয়েছে। প্রথম দিন, দ্বিতীয় দিন কেটে গিয়েছে। শুকনো প্রশংসা ভরিয়ে দিয়েছে মনকে, পেট ভরাবার সুযোগ দেয়নি! তৃতীয় দিনের দুপুরে এক সুন্দর তরুণ-তরুণী ঘরে ঢুকলেন। চেহারায় রোমান ভাস্কর্যের ছাপ। প্রণয়ে মত্ত সেই প্রেমিক-প্রেমিকা ভালো করে গোটা প্রদর্শনী ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। ওঁদের রূপ আমাদের মুগ্ধ করল। কিছুক্ষণ পরে আমাদের কাছে এগিয়ে এসে জানালেন যে, ওঁরা সাতটি ছবি নির্বাচন করেছেন, কিনতে চান ওগুলো, এখনই নিয়ে যেতে চান। আমি আলাদা করে খুশি, কারণ নির্বাচিত ছবির তিনটিই আমার। উনি জানান, ওঁরা মধ্যপ্রাচ্যের বাসিন্দা। মুম্বই শহরে থাকবেন আর এক সপ্তাহ। আমরা অনুরোধ করি, প্রদর্শনীর কয়েকটা দিন বাকি আছে, সাধারণত প্রদর্শনী চলাকালীন দেওয়াল থেকে ছবি খুলে না দিয়ে শেষ দিন নির্বাচিত ছবিগুলি সংগ্রহকারীর হাতে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে তাঁরা যদি বিবেচনা করেন বা সুযোগ দেন তাহলে আমরাই এই ছবি তাঁদের কাছে পৌঁছে দেব। ওঁরা রাজি হয়ে যান। চিরকুটে তাজ হোটেলের রুম নম্বর লিখে বলে দেন যে, শেষ দিন সকালবেলা তাঁরা নিজেরা এসেই ছবি নিয়ে যাবেন। আমরা আহ্লাদে আটখানা!

বিগত দিনগুলোর চেয়ে রেস্তোরাঁর বিল একটু বেড়ে যায়। রবীনদা একটু বেশি জেলি মাখন দিয়ে টোস্ট চা খান। কোথাও যেন সফলতার সুখ অনুভব করি। তারপর আসে সেই দিন। ইতিমধ্যে অন্য কিছু নতুন খবর হয়নি। কিন্তু সাত-সাতটা ছবি তো কম কথা নয়। সকাল থেকেই খুব উত্তেজনা। বারোটার মধ্যে তাঁরা ছবি নিতে আসবেন। আর যদি শেষ দিনে কিছু ক্রেতা আসেন! কারণ রাতে প্যাক করতে হবে। পরদিন পাড়ি কলকাতার উদ্দেশে। বারোটা বেজে যায়। এমনি করে একটা-দুটো-তিনটে। ক্রমশ উত্তেজিত আর হতাশ হতে থাকি। চারটে নাগাদ নিজেরাই চলে যাই তাজ হোটেলের ওই ঘরে। গ্যালারি থেকে তাজের দূরত্ব খুব একটা বেশি নয়। সমুদ্রের ধারে বিশাল প্রাসাদ। হনহন করে ঢুকে পড়ি রবীনদা আর আমি। রিসেপশনে জিজ্ঞাসা করি, এই ঘরটি কোথায়? ওঁরা বলেন চারতলায় পাশের বিল্ডিংয়ে। কি-বোর্ড দেখে বলেন যে,

একটা বিশেষ আদর্শের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখা বা বিশ্বস্ত হওয়া, একমত হওয়ার প্রয়োজন আছে। কিন্তু একজন সৃষ্টিশীল মানুষ দীর্ঘদিন ধরে একই ভাবনায় কাজ করে যাবেন তা হতে পারে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ধ্যানধারণা জীবনবোধ যেমন পাল্টে যায় তেমনই পাল্টে যায় প্রয়োজন। এগুলি বাদ দিয়ে একটি দলকে টিকিয়ে রাখা যায় না।

উনি এখন ঘরেই আছেন। রবীনদা নীচে অপেক্ষা করতে লাগলেন। আমি করিডর পেরিয়ে তাজের পুরনো বাড়ির লিফটে উঠি। চারতলায় নেমে পঁয়ত্রিশ নম্বর ঘরে পৌঁছে যাই। দরজার পাশেই বেল, জানান দিই। কিছুক্ষণ ধরে কয়েকবার বেল দেওয়ার পর হঠাৎ দরজা অর্ধেক খোলে। চেনা মুখের দর্শন পাই। শরীর অর্ধেক আড়াল করা, তাঁর সেই সঙ্গিনী ভেতরে। প্রকৃতিস্থ ছিলেন না। সুরা-সাকি নিয়ে মত্ত। এই অবস্থায় আমাকে দেখে মুখে বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট হয়। তিনি জানান যে তিনি দুঃখিত। অনেককিছু কেনাকাটা হয়ে গিয়েছে। ছবি সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার মতো জায়গা নেই। বলেন, ভবিষ্যতে যখন আসবেন তখন আবার যোগাযোগ করবেন। বলেই সজোরে দরজা বন্ধ করে দেন।

আমার মনের অবস্থা, শরীরের অবস্থা যে কী হয়েছিল তা কীভাবে ভাষায় প্রকাশ করব? সমস্ত আনন্দ অতলে তলিয়ে গেল। তাজ থেকে আমরা বেরিয়ে পড়ি। রাত পর্যন্ত সেই সমস্ত ছবি ঠিকঠাক মুড়ে সযত্নে কাঠের বাক্সগুলোতে প্যাক করলাম। অন্য সদস্যদের ছবির যদি কোনও ক্ষতি হয় সে দায়িত্ব তো আমাদের। এরকম কত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি।

একটা দল কেন সংগঠিত হয়? প্রধানত সারা পৃথিবীতে যেসব শিল্পীগোষ্ঠীর জন্ম হয়েছিল, যা দেখে আমরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম, তার কিছু সামাজিক-দার্শনিক কারণ আছে। এগুলো মূলত গড়ে ওঠে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অনিশ্চয়তা থেকে, আর কয়েকজন শিল্পীর শিল্পভাবনা বা দর্শনকে কেন্দ্র করে। তারপরে, স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টিচর্চারত মানুষ আবেগে ভর দিয়ে অনেক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তখন অনেক কিছুই যুক্তির ধার ধারে না। অর্থের সঙ্গে সঙ্গতি থাকে না। একটা বিশেষ আদর্শের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখা বা বিশ্বস্ত হওয়া, একমত হওয়ার প্রয়োজন আছে। কিন্তু একজন সৃষ্টিশীল মানুষ দীর্ঘদিন ধরে একই ভাবনায় কাজ করে যাবেন তা হতে পারে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ধ্যানধারণা জীবনবোধ যেমন পাল্টে যায় তেমনই পাল্টে যায় প্রয়োজন। এগুলি বাদ দিয়ে একটি দলকে টিকিয়ে রাখা যায় না। একটি দলের বিশিষ্টতাকেও প্রতিষ্ঠা দেওয়া যায় না। মধ্যবিত্ত ও মধ্যমেধার প্রচুর ভালো মানুষ আছেন যাঁরা দলে যুক্ত থাকেন এমনি এমনিই। সুযোগ খোঁজেন দলের সঙ্গে থেকে নিজেদের ঘাটতিগুলো পূরণ করে নেওয়ার। আমাদের দলে এই গুণটাও ছিল না। একেবারে গোড়ায় যে সমতা ছিল, সেটা পারস্পরিক অহংকারে ভেঙে যায়। এজন্য নানান চেষ্টা করেছি, জোড়া লাগিয়েছি, অসমদের সমতায় ফেরানোর চেষ্টা করেছি, কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি! কারও প্রতি কোনও অশ্রদ্ধা, অসম্মান না জানিয়ে বৃদ্ধ ঘোড়াদের আস্তাবল আমি পরিত্যাগ করি।

মানুষ সব সময়ই নিরুপদ্রব প্রাণীকে বিশ্বস্ত ভাবে। আমি সেই প্রাণীদের মধ্যে বিবেচিত হই না। তাই কোনও দিনই তেমন ভালো সদস্য হতে পারিনি কোনও দলের। বহু মানুষ ততদিনই ভালোবেসেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন, সঙ্গে রেখেছেন যতদিন আমি তাঁদের করুণার পাত্র। তারপরই যদি কখনও তাঁদের মনে হয়েছে আমি সশস্ত্র বা স্বতন্ত্র তখনই সন্দেহ, গুঞ্জন, উদাসীনতা কিংবা আমাকে শত্রুপক্ষ সাজিয়ে দেওয়া। আস্তে আস্তে অসংখ্য চেনা বন্ধু, চেনা শত্রু নিয়ে এই সমাজে, জীবনে স্বপ্ন দেখতে থাকি, কাজও করতে থাকি।

মাঝে আরেকটা ঘটনা ঘটে। এইসব ঘোলা দিনে একদিন আমার এই ছোট্ট স্টুডিওতে বিকাশদা (বিকাশ ভট্টাচার্য), শ্যামলদা (শ্যামল দত্ত রায়) আর প্রণবরঞ্জন রায় আসেন। সোসাইটি অব কনটেম্পোরারি আর্টিস্টস দলে যোগ দেওয়ার জন্য আমাকে প্রস্তাব দেন। সেইমতো একটা বয়ান লিখে দেন প্রণব রায়। আমার কাছে তা অপ্রত্যাশিত ছিল। ওঁরা মনে করেছিলেন, যেহেতু ক্যালকাটা পেইন্টার্স-এর আমি খুব সক্রিয় সদস্য অথচ আমাকে নিয়ে একটা বিবাদের ঘটনা ঘটছে সেহেতু আমি যুক্ত হতে পারি ওঁদের দলে। তখন এই দুটি দল ছিল পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। একে অন্যকে দোষারোপ করে, সমালোচনা করে। একদলের যেন ভারতের সীমানার মধ্যে অবস্থান, অন্য দল পাকিস্তানের। সেইমতো, বেশ কয়েকবার ধর্মতলার স্টুডিওর আড্ডায়, আলোচনায় যোগ দিই। লক্ষ করি আমাকে নিয়ে গুঞ্জন। আমি দলের যে গোষ্ঠীর প্রশ্রয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছি, সেই গোষ্ঠীর প্রতিদ্বন্দ্বী যাঁরা, তাঁরা আমাকে সুনজরে দেখছেন না। অপরপক্ষ মনে করছেন, আমি হয়তো কারও হাত মজবুত করতে পারি! এই আশঙ্কায় দলের মধ্যে কোন্দল শুরু হয়। এরই মধ্যে একজন অতিসক্রিয় হয়ে এক মিথ্যা অভিযোগ আনেন। সেই মিথ্যা অভিযোগ আমাকে এতটাই বিচলিত করেছিল যে তাতে আমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হই, আর সেই ক্রোধের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে ফেলি সেই ব্যক্তির কাছে। তাতে আমার জীবনের পথ পাল্টে যায়। সেই দলে আমার একান্ত আপনজনেরাও আমার পাশে দাঁড়াননি। অথচ তাঁরাই নানাভাবে আমার প্রতিবাদকে উৎসাহ দিয়েছিলেন। তখন থেকে ঠিক করি একলা কিছু করব।

একলা চলাও এ-সমাজে সহজ নয়। বিশেষ করে সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থাটা এমনই যে, সেখানে সামান্য কোনও সুযোগের জন্যও প্রচণ্ড বিসদৃশ প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়, যেখানে কোনও আদর্শ, মনুষ্যত্ব বিবেচিত হয় না। আমরা সকলেই সাধারণ মধ্যবিত্ত জীবন থেকে নানা ঘটনায়— দুর্ঘটনায় জড়ো হয়েছিলাম। আমাদের স্বপ্ন একজন শিল্পী হব, প্রতিষ্ঠা পাব। কিন্তু সেই স্বপ্নের স্বরূপ কী? আমার অজানা। আমাদের সমাজে শিল্পীরা সাধারণত যে সামাজিক স্তর থেকে আসেন, সেই স্তরে কোনও স্বপ্নের প্রশ্রয়, রসদ কিছুই মেলে না। পৌঁছতে হয় অন্য আরেকটা স্তরে। যাঁরা অর্থবান, সমাজের মাথা, ক্ষমতাবান, সমাজের চালক, যাঁদের কাছে পৃথিবীর সবকিছুই পকেটে মজুত থাকে, সেই স্তরে পৌঁছবার পথ আমার অজানা। অথচ, সেই মঞ্জিল ছাড়া আমি তো ব্রাত্যই থেকে যাব চিরকাল। পাড়া-প্রতিবেশীরা তো কৌতূহল ছাড়া কিছুই প্রকাশ করেন না! মলিন হলেও কৌতূহল, ঝকঝকে হলেও তাই।

দুটো দল থেকেই মুক্ত হয়ে গিয়েছি, আমার অসমবয়সি সতীর্থদের থেকে। সৌভাগ্য এই যে, ইতিমধ্যে বিদেশে পাড়ি দেওয়ার একটা সুযোগ এসেছিল। কিছুটা সাফল্যের জন্য, অন্তত আগামীদিনের রসদ সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম তা থেকে।

একদিন দুপুরে এক জার্মান দম্পতি আমার

রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষের পর থেকে কবি, লেখক আর লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকদের কাছে পঁচিশে বৈশাখ সার্বজনীন দুর্গোৎসবের মতো হয়ে উঠেছিল। তখন কলেজ স্ট্রিটে প্রতি ঘণ্টার কবিতা, দৈনিক কবিতা কত চমকপ্রদ সব ব্যাপার!

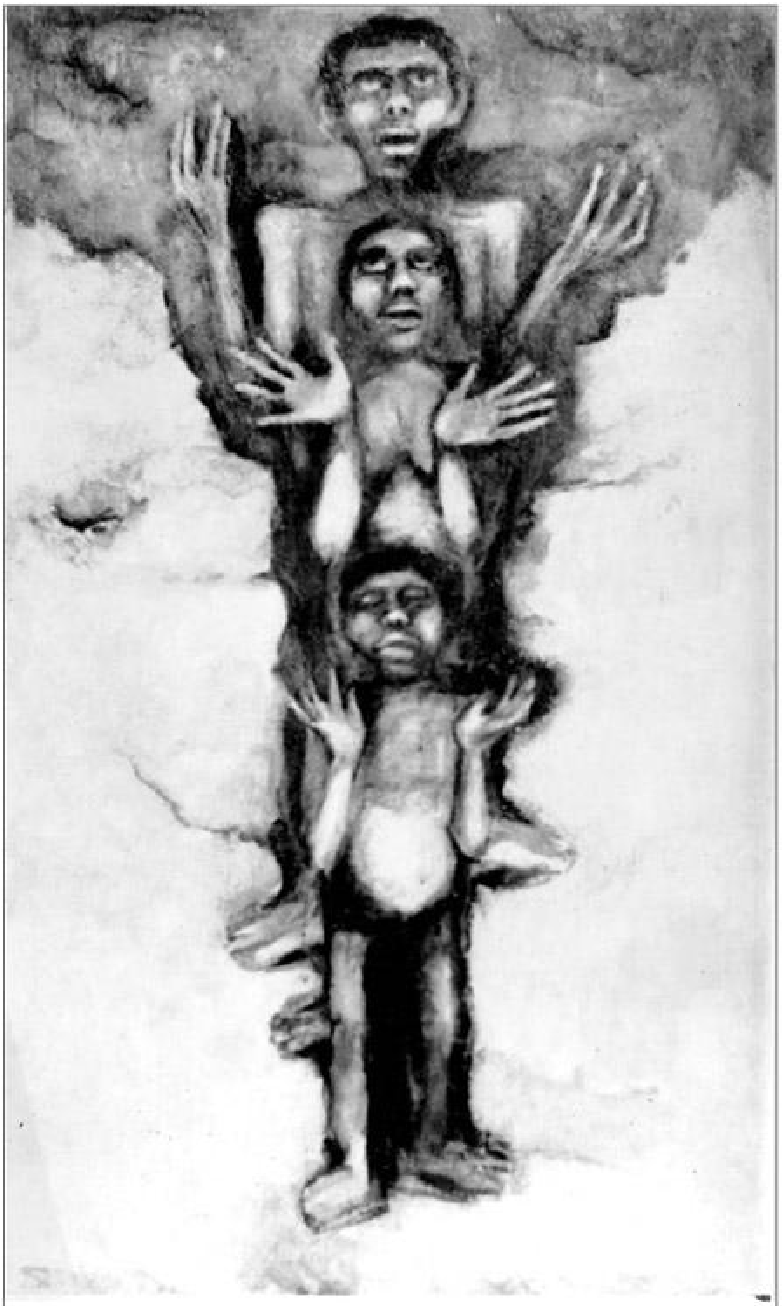

১৯৭১ মিউট সাইলেন্স ৫০ × ৩৫বি *শিল্পী: শুভাপ্রসন্ন*

স্টুডিওতে আসেন। ডঃ অশোক গাঙ্গুলি ছিলেন হিন্দুস্থান লিভারের বড় কর্তা, তখনও সর্বময় হননি। উনি চিনতেন আমাকে মুম্বইয়ের প্রদর্শনী-সূত্রে। তখন উনি পূর্বাঞ্চলের দায়িত্বে। ওই জার্মান ভদ্রলোক এসেছিলেন কোনও বৈজ্ঞানিক পরামর্শ দিতে। প্রসঙ্গত, তিনি ডঃ গাঙ্গুলিকে জানান, কলকাতার কোনও তরুণ শিল্পীর কাজ দেখতে চান। সেভাবেই তাঁদের আগমন আমার স্টুডিওতে।

বর্ষার দিন। জল দাঁড়িয়ে আছে আমাদের গলিতে। জল ডিঙিয়ে বিরাট বড় মাপের জার্মান দম্পতি এলেন। গ্যারেজের ওপরে গড়ে ওঠা ছোট্ট কুঠুরি, আমার স্টুডিও। এতই লম্বা তাঁরা যে ঘরে দাঁড়াবার মতো অবস্থা ছিল না। দরজার বাইরে একচিলতে বেআব্রু চাতালে নড়বড়ে একটা টুল এগিয়ে দিই ওঁদের। কিছু জমে থাকা ছবি দেখাতে থাকি। দুটি ছবি পছন্দ করেন ওঁরা। একটি 'মিউট সাইলেন্স' অন্যটি 'ফল্‌ন'। পঁয়ত্রিশ বাই পঞ্চাশ ইঞ্চি মাপের। বারোশো টাকা করে, দুটি চব্বিশশো টাকা। আমার এত বড় ছবি এর আগে ওই দামে কেউ নেওয়ার আগ্রহ দেখাননি!

ওঁদের হাতে বেশি সময় ছিল না। ছবি দেখে চলে গেলেন। আর একটা ছোট্ট কার্ডে গ্র্যান্ড হোটেলের রুম নম্বর লিখে আমাকে বলেন, ছবিদুটো খুলে রোল করে ওঁদের কাছে নিয়ে যেতে। সেইমতো পরদিন পৌঁছে যাই। উনি আমাকে চেক দেন। ডয়েস মার্ক-এ। কাটাকুটি করেও আমি হাতে পাব তিন হাজারের কিছু বেশি। এখনও ভাবলে গোটাটাই স্বপ্নের মতো মনে হয়। শুধু বড় ছবি বিক্রি নয়, আমার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি হাতে পাওয়ার স্মৃতি কি ভোলার?

নানা কষ্টের মধ্যেও এই ঘটনা আমায় সঞ্জীবনী জুগিয়েছিল। গ্যারেজের ওপরের ঘরে ম্যাজেনাইন ফ্লোরে খুপরির মতো একটি ঘর। সাকুল্যে ছ'ফুট উচ্চতা, মাঝখান বরাবর লোহার একটা বিম। সেটি কমপক্ষে আট ইঞ্চি চওড়া।

তাই কোনওরকমে সতর্কতা নিয়ে চলাফেরা করতে হতো। হয়তো দীর্ঘ সময় ধরে ওই ঘরের মধ্যে ছবির চর্চা করতে করতে আমি আর লম্বা হতে পারিনি! কিন্তু ওই ঘরে কত মানুষের ভালোবাসা মিশে গিয়েছিল! আর সে ঘরে কে না এসেছেন! মৃণাল সেন থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র, শক্তিদা (শক্তি চট্টোপাধ্যায়) থেকে

তখনকার তাবড় তাবড় তরুণ তুর্কিরা। অম্লান দত্ত, গৌরকিশোর ঘোষ, নীরেনদা (নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী), হেওয়ার্ড হজকিন থেকে শুরু করে বহু দেশি-বিদেশি শিল্পী, শিল্পরসিক, চলচ্চিত্রকার, কত কবি-বন্ধু, সাহিত্যিক, লিটল ম্যাগাজিনের বন্ধুরা আনাগোনা করতেন ওই কামরায়। তলায়, বাবার প্রশস্ত ডিসপেনসারি, তিনি গম্ভীর ও স্থিতধী। কে খ্যাতনামা, কে মাতাল, কে বাউন্ডুলে— এসব তিনি বুঝতেন না। যেহেতু তাঁর চেম্বারের মধ্য দিয়ে আমার স্টুডিওতে ঢুকতে হতো, তাই সেইটুকু পথ শৃঙ্খলা মেনে চলতে হতো। মৃণাল সেনের মতো লোকও রেহাই পাননি। অপরাধ? ওঁর হাতে জ্বলন্ত সিগারেট ছিল, বাবা তাঁকে সিগারেট হাতে চেম্বারের মধ্যে ঢুকতে মানা করেছিলেন। মৃণালদা অবশ্য পরে টেলিফোনে আলাপচারিতায় বাবাকে খুব সহজ করে নিয়েছিলেন।

আমি তখন মজে থাকি কিছু কবি, লেখকদের সঙ্গে। তাঁরাই আমাকে মাথায় করে রাখেন। প্রচ্ছদ এঁকে দিই। কখনও কখনও লেখা দিই। এঁদের মধ্যে আজ অনেকেই কবি, লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। আবার কেউ কেউ হারিয়ে গিয়েছে, কিংবা 'বর্ধমানের ট্রেন ধরতে পারেননি'। তবে কিছু ক্ষেত্রে সবই একটা পত্রিকা কিংবা বই প্রকাশের আগে যত ঘোরাঘুরি, যত ডাকাডাকি, যত প্রেম। প্রকাশের পর ছাপা বই দিতে কেউ আসত না। আর আমিও ভুলে যেতাম।

কখনও কখনও প্রেসিডেন্সির রেলিংয়ের গায়ে ঝোলানো পুরনো বইয়ের সারিতে দেখতে পেতাম, আমার কোনও না কোনও স্বাক্ষর। রাগ, অভিমান দুই-ই হতো। কিন্তু পুষে রাখতাম না। আবার ভাবতাম, তাঁরা তো আমাকে প্রয়োজনীয় মনে করেছেন। এটাই কম কী! তখন বইপাড়ায় ব্রজ মণ্ডল ঘুরঘুর করছে। শক্তিদা, সন্দীপনদাদের (সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়) মদের টাকা জোগান দিয়ে পাণ্ডুলিপি পাচ্ছে সে— সেই সময়টা হঠাৎই আধুনিক কবিতার রমরমা হয়ে উঠেছিল। অবশ্য এখনও বাংলাবাজার আসানসোল পেরোতে পারেনি! রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষের পর থেকে কবি, লেখক আর লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকদের কাছে পঁচিশে বৈশাখ সার্বজনীন দুর্গোৎসবের মতো হয়ে উঠেছিল। তখন কলেজ স্ট্রিটে প্রতি ঘণ্টার কবিতা, দৈনিক কবিতা কত চমকপ্রদ সব ব্যাপার! কফি হাউস, বইপাড়া, কলেজ স্ট্রিটের চৌহদ্দিতেই আমার সঙ্গে সবার ব্যক্তিগত পরিচয়, ভাব-ভালোবাসা সূর্যাস্ত পর্যন্ত অটুট থাকত।

ওদের তন্ত্রসাধনার সহযোগী হতে পারিনি, হইনি। মুক্তমেলা শেষ হয়ে গিয়েছে। ছবির জগতে দুই বড় গ্রুপ দামাল সর্দারের দাপটে বিচরণ করছেন। শর্বরী রায়চৌধুরী, মহিম রুদ্র, প্রকাশ কর্মকার— এঁরা তখন মধ্যগগনে। মূলস্রোতের সাহিত্যকার, শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সবার কাছেই এঁরা সমাদৃত। এঁদের কেউ বিদেশে বিয়ে করেছেন, কেউ দেশপ্রিয় পার্কের পাশের গলি থেকে বিদেশিনির কাঁধে হাত দিয়ে বাজারের থলি হাতে লেক মার্কেটে বাজার করতে যাচ্ছেন। 'কৃত্তিবাসের' কবিরা অ্যালেনের সঙ্গে মৃত্যু-মৃত্যু খেলায় যোগ দিচ্ছেন। আনন্দবাজার টুকটাক খবর লিখছে। দুই রাজনৈতিক দল চোরাস্রোতে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। বামাদর্শে বিশ্বাসী আঁতেলরা ভাবেন, বাকিরা অশিক্ষিত, প্রাচীনপন্থী, আর তাঁরা হলেন প্রগতিশীল, বিশ্বচিন্তার ধারকবাহক। রাশিয়া কিংবা চিন তাঁদের স্বর্গ।

তখন আমার বড় আয় বলতে পোর্ট্রেট এঁকে রোজগার। নানান মাপের নানা ধরণের মানুষের ছবি এঁকেছি অর্থের বিনিময়ে। সে অর্থ আজকের অনুপাতে এত কম যে নিজেরই উল্লেখ করতে লজ্জা আসে, হাসি পায়।

'সোভিয়েত দেশ' 'সোভিয়েত ল্যান্ড' দেববাণী প্রচার করে। এই বাতাবরণে এভাবেই আমার বেকার বাউন্ডুলে অভিভাবক-বর্জিত সংসারে পাত্তা না-পাওয়া জীবন মেতে থাকত। এরকম সময়ে একটা বিদেশি খাম আসে আমার হাতে। সুদূর সুইজারল্যান্ড থেকে পাঠানো এক চিরকুট। সেই আমার ছবির একমাত্র দুর্লভ ক্রেতা পাঠিয়েছেন। সে চিঠি গোপনে, উত্তেজনায় খুলে পড়ি। ডঃ আই এন জি রুডি লিখছেন—

প্রিয় শুভা, আমার বন্ধুরা তোমার ছবি দেখে খুব প্রশংসা করেছে। আমার বাড়িতে আমি একটা ব্যক্তিগত গ্যালারি তৈরি করেছি। তুমি যদি কখনও ইউরোপে আসার পরিকল্পনা করো তাহলে আমাকে জানিও। সেইমতো আমি তোমার প্রদর্শনীর আয়োজন করতে পারি।

তারপরে কুশলসংবাদ জানিয়ে তাঁর স্বাক্ষর আর পুরোপুরি তাঁদের ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর ইত্যাদি ইত্যাদি। চিঠি, খাম, লেখা সবই বিস্ময়ের, আনন্দের! কিন্তু সেই পর্যন্তই। তখন রোজ গড়ে চার পাঁচখানা পোস্টকার্ড লিখি। অনুরূপ চিঠি পাই, একসঙ্গে কিনে রাখি গোছা গোছা পোস্টকার্ড, আর ইনল্যান্ড লেটার। এর মধ্যে এলাহাবাদ থেকে প্রকাশদার চিঠি নিয়মিত পাই। যোগেনদা দিল্লি থেকে লিখতেন। আর ছিল অসংখ্য বন্ধুর চিঠি। আত্মীয়স্বজনেরা খুব বেশি আমায় চিঠি লিখতেন না। মেজদার চিঠি পেতাম। মেজদা বরাবরই নিষ্ঠাবান ছাত্র। বাবার সুনজরের। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ডাক্তারি পড়েছে। ভালোভাবে পাশ করেছে। ডাক্তারির শেষ ধাপেও অতিরিক্ত পাঠ শেষ করে দিল্লিতে এ-আই-এম-এস এ অধ্যাপনা করছে। আমার সঙ্গে তার দাদা-বন্ধুর মতো সম্পর্ক ছিল। ওর জীবনে, কাজে, দ্বিধা ছিল— মানুষকে মেনে চলার শিক্ষা ছিল। ভালোমন্দর ক্ষেত্রে স্বপ্নচারী ছিল না ও। সমাজে ভালো ছেলে হিসেবে সবার কাছে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। আমি তার প্রায় সবকিছুতেই বিপরীত। ও আমায় চিঠি লিখত।

তখন আমার বড় আয় বলতে পোর্ট্রেট এঁকে রোজগার। রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির জন্য রথীন ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিধানচন্দ্র রায়ের তৈলচিত্র এঁকেছি। অম্লান দত্তের অনুরোধে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এঁকেছি বিদ্যাসাগরের ছবি। নানান মাপের নানা ধরণের মানুষের ছবি এঁকেছি অর্থের বিনিময়ে। সে অর্থ আজকের অনুপাতে এত কম যে নিজেরই উল্লেখ করতে লজ্জা আসে, হাসি পায়। মনে আছে ছেলেবয়সে বাবা আমাদের কাছে গল্প করতেন যে পাঁচ আনায় ছ'আনায় ধনেখালি শাড়ি! আমি তখন চৌকো পেতলের দু'আনায় সন্তোষের দোকান থেকে একভাঁড় দই কিনতাম। মনে হত, বাবা কল্পরাজ্যের কথা বলছেন। রাশভারী গম্ভীর, সুন্দর সুপুরুষ গৌরকান্তি আমার বাবাকে যদিও কখনও কোনওদিন বাজার করতে দেখিনি! তাঁর চেম্বারে বড় টেবিলের সামনে তিনপায়া প্রশস্ত বেতের কারুকাজ করা ইংলিশ ডিজাইনের চেয়ারে বসা সেই মুখটা ভেসে আসে। তিনি থলে হাতে বাজারে যাচ্ছেন এ বড় বেমানান দৃশ্য! আমাদের কাছে বাস্তবে তাই এক টাকা চার আনায় এক মন চাল কিংবা পাঁচ আনায় ধনেখালি গল্প মনে হতো। আজ আমার ছবিজীবন লিখতে বসে ছবি আঁকার প্রাপ্য মূল্য ভাবতে গিয়ে আজকের অর্থনৈতিক মাপাঙ্কে নিজেরই হাসি আসে। ডাঃ কার্টেলের চিঠিতে ফিরে আসি। সেই চিঠি আর কাকে দেখাই! কেই বা সেই চিঠির মর্মের ভাগীদার হবে?

ক্রমশ

দেবেশ রায়ের দাওয়াত

আমাদের বন্ধুদের মধ্যে অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সমর্থ স্বপ্নদর্শী। তিনি নতুন কাগজ করছেন মানেই কাগজটা পুরনো হবেই। ও পুরনো হলেও নতুন থাকবে। এমন কাজে হাত লাগাতে না ডাকলে হাতের নিশপিশিনি কাটে না। আবার ডাকলে মগজে বান ডাকে।

আমি অমরেন্দ্রকে কথাটা পাড়ি।

আমার ধারণা বাংলায় ছোটগল্প-লেখক বেড়েছেন, লেখার জায়গাও বেড়েছে, পড়াও বেড়েছে, সাইজ কমেছে, সম্মান কমেছে। ফলে একজন কোনও লেখক লেখার গুণে নজরে পড়ছেন না। ম্যাগাজিনগুলির এমন একটা হিসেব ধরা পড়ে যায়— ওই একজনের লেখাই যেন ঘন ঘন ছাপা না হয়।

সবাই-ই ভালো লিখতে থাকলে এমন বিপদ ঘটে। আরও একটা বিপদ আছে— সব ভালোই একরকম হতে থাকে।

একটু বাড়িয়ে বলা যায়, আমি জ্যান্ত লেখকদের যত গল্প ছাপায় পড়েছি, তার চাইতে বেশি পড়েছি হাতের লেখায়। আরও একটু বাড়িয়ে বলা যায়, যাদের গল্প হাতের লেখায় পড়েছি, তারা যখন ছাপা ছাড়া লেখে না তখন তাদের সব লেখা আর পড়া হয় না। এই রটনা কি কমে গিয়েছে, না আমার কানে কম আসছে যে দারুণ একটা গল্প বেরিয়েছে! কানে এলে আর রক্ষে নেই লেখকের কিংবা আমার। আমার পড়া হয়নি অথচ গল্প ভালো হয়ে গেল এটা মানতে কী যে কষ্ট, আর এমন গুমর ধরা পড়ে গেলে কী যে লজ্জা!

কিন্তু এর একটা উল্টো দানও আছে। কারওই চোখে পড়ার উপায় নেই অথচ এক আমার ভালো-লাগা নিয়ে একটা গল্প আমার কাছে জমা হয়ে থাকল।

কী করে আসে এই গল্পগুলি আমার কাছে? সেকথা এখন নয়। আগে গল্পগুলো সত্যি-সত্যি দারুণ কী না সেটা যাচাই হোক। অন্য কারও যদি দারুণ নাও লাগে তাতে আমার দারুণ কিছু কমবে না। অন্যের রুচির ওপর আমার রুচির জোর খাটাতে যাব, আমি অত দুবলা রুচির ওপর ভর রাখি না। আবার, আমার রুচি অত লতানোও নয় যে অন্যের রুচির কাঠি বাইবে।

আমার সেরেস্তায় জমা-থাকা এই গল্পগুলি সম্পাদকের সহমতে এখানে ছাপা হবে। পাঠকরা আমাকে এস এম এস করে জানাতে পারেন— **বাঃ** বা **যাঃ**। নম্বর ৮৪২০০-১০৫০৪। তারপর তর্কাতর্কি করা যাবে।

আমার তাঁর গল্প পড়তে ভালো লাগে এমন এক লেখক এসে সেদিন আমাকে বকে গেলেন যে আমার দাওয়াতে শুধু নিরাপদ গল্প ছাপছি কেন। নিরাপদ গল্প কাকে বলে জানতে চাইলে তিনি বললেন — এমন গল্প যা ভালো না-লাগার কোনও উপায় নেই।

আমি একটু দুর্বল স্বরে নিজেকে সমর্থন দেওয়ার চেষ্টায় বলতে চেয়েছিলাম—তাহলে এসব লেখা এতদিন সবাই পড়েনি কেন?

আমার সেই বন্ধু আমাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে হাতের একটা ঝাপটায় বলে বসলেন— কে পড়ল না পড়ল তাই দিয়ে গল্প হবে নাকি? তাহলে এত চড়া গলায় দাওয়াত না দিলেই পারতেন।

সেই বন্ধুটির কথার ভেতর একটু জটিলতা ছিল। তিনি চলে যাওয়ার পর সেই জটিলতাটুকুই বুঝে উঠতে চাইছিলাম। খুব যে বুঝলাম, তা নয়। কিন্তু এ-কথাটা তো না মেনে উপায় নেই একটা গল্প যদি হকচকিয়ে না দেয়, তাহলে ঠিক গল্প হয় না।

গল্পের এই একটা আলাদা মজা। যিনি পড়েন, তিনিও পড়তে পড়তে গল্পটা লেখেন। লেখকের মজাটা হয়তো এইখানে যে পাঠককে অনেকদূর পর্যন্ত লিখতে দিয়ে একসময় ভুলিয়ে দেওয়া যে তিনি কী লিখছিলেন। পাঠককে ভোলানোর পর লেখক নিজের গল্পটা লিখে ফেলেন।

হয়তো কবিতায় এমনটা হয় না। কবিতা পড়ে মনে হতে হয়—আমার কবিতাটা কবি লিখে দিয়েছেন।

ওই বন্ধুর বকুনির পর খুঁজতে লাগলাম আমার সেরেস্তায় কি এমন কোনও গল্প নেই যে-গল্প লেখক নিজের জন্য লিখেছেন, পাঠকের জন্য নয়। আর, যে-গল্প পাঠকের জন্য নয় সে গল্প পাঠক পড়তে যাবেন কেন?

নিরুদ্দিষ্টের এমন বর্ণনা অনুযায়ী খুঁজতে-খুঁজতে সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই গল্প দুটি হাতে এল। বাঃ! সুমিতাই তো সেই লেখক, যার গল্প পাঠক কিছুতেই ভালো বলবে না। অথচ খারাপও বলবে না। কারণ হয়তো শেষ পর্যন্ত পড়ে উঠতেই পারবে না। যদি পারে তাহলে পাঠক দেখবে শেষ লাইন পর্যন্ত সুমিতা, সুমিতাই থেকেছে। কোনও একটি জায়গাতেও পাঠককে ছাড় দেয়নি।

সুমিতা অনেকদিন লিখছে। আমি সেই অনেকদিন ধরেই ওর লেখা পড়ছি। ওর হাতের লেখা কপিই কারণ ওর লেখা প্রায় কোথাওই ছাপা হয় না। আমি অবিশ্যি ঠাট্টা করে বলি, এত খারাপ হাতের লেখা, সম্পাদকরা পড়ার কষ্ট না করেই ফেরত পাঠিয়ে দেন। দুয়েকটি গল্প এদিক-ওদিক ছাপা হয়েছে বটে, কিন্তু সম্ভবত এই কারণে যে আমি পাঠিয়েছি। আমি সুমিতার একটি গল্পও পড়িনি, যা আমার ভালো লাগেনি ও আমি এমন একজন সম্পাদককেও পাইনি, যাঁর ওঁর গল্প ভালো লেগেছে। একটি বই ছাপিয়েছিল নিজেই খানিকটা। সে-বই উপহার পেয়েও তার বন্ধুরা তাকে খুব উৎসাহ দিয়েছে এমন শুনিনি।

আমি তাহলে এই একলা-লেখকের একলা-পাঠক হয়ে আছি কেন? আমার কারণগুলি বলছি। পাঠকরা এই গল্পটির সঙ্গে মিলিয়ে নেবেন। যদি আমার পড়ায় কোনও ভুল পান তাঁরা, জানাবেন। আমি ভাবব। যদি আমার মতোই তাঁদেরও ভালো লাগে, জানাবেন। ভালো লাগবে। আর, একজন ভালো গল্পলেখকের আরও একজন পাঠক জুটবে।

সুমিতার গল্পের মজাটা এই জায়গায় যে সে আমাদের রোজকার জীবনের ঘটনাই লেখে আর কখন যেন তার বিশেষণবহুল বাক্যে, সুসংগঠিত বাচ্যে সেই রোজকার ঘটনাকে করে তোলেন বিরল একটি ঘটনা। ছবি-আঁকার একধরণের পদ্ধতির কথা শুনেছিলাম। চিত্রকর যা দেখছেন তাই আঁকলেন, ধরা যাক, পেনসিলের লাইনে। তারপর, যা আঁকেননি, সেইটা আঁকতে শুরু করলেন ইরেজার ঘষে অবান্তর লাইনগুলি মুছে দিতে দিতে। এই পদ্ধতিকে ছবি-আঁকা না বলে ছবি-মোছা বলাই হয়তো ব্যাকরণসম্মত হত, যদি সেই মোছা ছবিটা ছবি হয়ে না উঠত। সুমিতার শব্দ, বাক্য, প্যারা, সংলাপ এগুলো এত বেশি রকম সারাৎসার যে কোনও ঘটনাই এমন ঘটে না যে-ঘটনার ভাষা আগে থাকতেই ঠিক হয়ে যায়। একটি লোক বাড়ি ফিরে এসে কিছুতেই ঠিকঠাক মনে করতে পারে না যে সে সবগুলো তালা ঠিকঠাক লাগিয়েছে কিনা! এই নিয়ে নানা মজা ঘটে; যেসব মজার শেষটা দাঁড়িয়ে যায়, তার সহকর্মীদের সমবেত যৌনলাঞ্ছনার ভাষায় বা ভাষাগত যৌনলাঞ্ছনায়। এমন একটা গল্প সাবেককালের হাসির গল্পও হতে পারত বা একটু প্রচলিত মজার গল্পও— লোকটা কীভাবে বাতিকে পড়ল। সুমিতা সেই সহজলভ্য কোনও আকারেই গল্পটা লিখলেন না। তিনি শেষ দিয়েই শুরু করলেন। এমন গল্প লিখতে গেলে লেখককে অনেকবার গল্পটা লিখতে হয়— মনে মনে কিংবা কাগজ-কলমে। ধরো তক্তা মারো পেরেক করে এ-গল্প লেখা যায় না। এ-গল্প লেখকের গল্প। পড়ার পর পাঠককে ভাবতে হয় লেখককে।

গত সংখ্যায় শাহীন আখতারের গল্প বেরিয়েছিল। শাহীন, বাংলাদেশের নামী লেখক, পশ্চিমবঙ্গেও চেনা। 'সখী রঙ্গমালা' নামে একটি উপন্যাস লিখেছেন, পড়ে আমি তাজ্জব। প্রচলিত

একটি লোককথার এমন উপন্যাসায়ন বাংলায় ঘটেছে বলে মনে করতে পারছি না। এমন কেউ কেউ এই চেষ্টা করছেন, কিন্তু শাহীন অতুলনীয়।

তাঁর ওই গল্প তিনটি বাছার কারণ অবিশ্যি একেবারেই আমার পক্ষপাতিত্ব। না, শাহীনের প্রতি নয়। তিনি আমার পক্ষপাতিত্বের চাইতে অনেক বড় লেখক। ওই তিনটি গল্পের প্রথম দুইটি— 'ভিউপয়েন্ট' ও 'ছয় বছর আগে' লেখা আমাদের জলপাইগুড়ি জেলার প্রাক-দেশভাগ তেঁতুলিয়া-পচাগড় নিয়ে। এখনও জলপাইগুড়ি— শিলিগুড়ি যাওয়ার একটা ঘুরতিপথের নাম, 'তেঁতুলিয়া রোড'। আর, আজও, আমরা জানি— সেসবই ছিল কাঞ্চনজঙ্ঘার ছায়াঞ্চল।

শাহীন আমার কাঞ্চনজঙ্ঘাতুতো বন্ধু।

সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

অবিনশ্বর বিস্মরণ

'সৌম্য... সৌম্য... অ্যাই সৌম্য...' এটা রজতাভর গলা। প্রয়োজনের ডাক নয়, তাই সৌম্য তার উদাসীন, মাঝারি দ্রুতচাল অপরিবর্তিত রেখে হাঁটতে থাকে। বিকেলের হাওয়ায় নির্দোষ রসিকতা উড়ছে, যার কোথাও-কোথাও বিছুটিমাখানো। রজতাভর স্বর মসৃণ, সুন্দর, নাগরিক-পালিশের পক্ষে সুবিধেজনকভাবে হালকা আবার একইসঙ্গে গুরুত্ব বুঝিয়ে দেওয়ার উপযোগী ওজনযুক্ত।

'সৌম্য, স্টোরের দরজায় তালা ঠিকমতো লাগিয়েছিস তো? ঠিক করে লাগিয়েছিস?' সৌম্য বাসস্টপের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। রজতাভর সঙ্গে গৌতম, দীপেন্দুদা, প্রতীক আরও অনেকে আছে। ডাকাডাকির সঙ্গে তারা হাসিও ব্যবহার করে। ঠোঁট, চোয়াল, গাল, চোখের বিভিন্ন জায়গায় লুকনো থাকে যেসব পেশি, সূক্ষ্ম তন্তু, অচেনা শিরা— তারা গলে যাওয়া মূর্তির ভেতরের ভ্যাপসানো খড়ের আদলে বাইরে বেরিয়ে আসে। সব খবরের কাগজেই আজকাল শরীর নিয়ে যে সাপলি থাকে, তাতে এমন হাসিকে সেক্সি বলে চিনিয়ে দেওয়া হয়।

'আরে সোমিয়া ডিয়ার, চাবিটা পকেটে ঢুকিয়েছ কি?'

'পকেট আর চাবির কথা পরে, আগে বল তালা লাগিয়েছিস কিনা, হাঃ হাঃ' বাস যত তাড়াতাড়ি আসে, সৌম্য তত তাড়াতাড়ি রেহাই পেয়ে যায়।

'লাগিয়েছিস' কথাটা ওরা বারবার বিভিন্নভাবে বলে, যার সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর স্বরান্তরে একশো-এক ভাগ সেই সেক্সি তুচ্ছতাকে ব্যবহার করে। স্বরক্ষেপণের প্রয়োগ যে কত বিস্তৃত হতে পারে; আর, তার শীর্ষে যে কী চূড়ান্ত মজা ভর করে থাকতে পারে, তা, নাটক বা সিনেমা থেকে নয় ফ্যাক্টরির এই তরুণ ইঞ্জিনিয়ার এবং অফিস-সেকশনের লোকেদের থেকেই বলতে পারা যায়, সৌম্য শিখেছে।

এটা গত কয়েকমাসে বেশ কয়েকবার ঘটেছে। সৌম্যর নিজের দোষেই ব্যাপারটা ধরা পড়েছে। একদিন রাত্রি দশটার সময় সে হঠাৎ পরোপকারী বলে খ্যাত অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের শিশিরদাকে ফোন করে। সে নাকি স্টোর বন্ধ করেছে কিনা মনে করতে পারছে না। শিশিরদা তো অবাক, কী বলছিস রে, তুই স্টোরে তালা দিয়ে আসিসনি?' 'না আমি তালা দিয়েছিলাম, স্পষ্ট মনে ছিল আমার। কিন্তু অদ্ভুত একটা ব্যাপার হচ্ছে জানো, আমি আজকে যখন তালা দিচ্ছিলাম, পিছন থেকে কে যেন খুব জোরে মোবাইলে কথা বলছিল। আবার এই কিছুক্ষণ আগে থেকে আমার মনে হচ্ছে লোকটা মোবাইলে কাল কথা বলছিল। আজ নয়। তাহলে আজ আমি তালাটা কখন দিলাম? যে সময়টায় তালা দিয়েছি, সেই পোর্শন-অব-টাইমটা মনে পড়ছে না।'

'কী সব বলছিস বুলশিট! রাসকেল একটা। তালা যদি সত্যিই না দিয়ে আসিস বল ঠিক করে। এতক্ষণে যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে, সিকিউরিটি থেকে যদি অলরেডি ম্যানেজমেন্টে খবর চলে যায়, তাহলে তো, ধরে নে তোর চাকরি আর নেই। ফোন রাখ। আমি দেখছি।'

তখনই সুপারভাইজারকে ফোন করে, তার মোবাইল বন্ধ দেখে শিশিরদা ৪ কিলোমিটার উজিয়ে তার বাড়িতে গিয়ে খবর দেন। সুপারভাইজার শর্মা সিকিউরিটি সেন্ট্রালে ফোন করে। সিকিউরিটি সেন্ট্রাল থেকে স্টোর অন্তত আধ কিলোমিটার দূরে। রাতের শিফটের লোকেরা ডিউটি রেজিস্টার দেখে স্টোরের কাছাকাছি জায়গায় ফ্লোটিং সিকিউরিটি কারা কারা আছে বের করতে-করতে সুপারভাইজার শর্মার সঙ্গে শিশিরদা নিজেই সেই রাত্রে স্কুটারে চড়ে জানুয়ারি মাসের ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে ফ্যাক্টরি চত্বরের শেষ প্রান্তে স্টোরে গিয়ে পৌঁছন এবং দ্যাখেন স্টোরের বাইরের লোহার দরজায় বড় তালাটা ঠিকঠাক আটকানো রয়েছে। এমার্জেন্সি থেকে অতিরিক্ত চাবি নিয়ে তালা খুলে দেখা যায় ভেতরের শাটার এবং দরজাতেও একাধিক তালা ঠিকঠাক বন্ধ রয়েছে। শর্মার সঙ্গে শিশিরদার কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে যায়। শিশিরদা ফোন তুলে সৌম্যকে বাপান্ত করতে যাওয়ার আগে হঠাৎ একটি অদ্ভুত তথ্য পান। স্টোরের সবচেয়ে কাছাকাছি পাহারা দেয় যে ছেলেটি, সে জানায়, স্টোর ম্যানেজার অর্থাৎ সৌম্য প্রত্যেকদিন তালা দেওয়ার পর অন্তত পাঁচ-সাত মিনিট ধরে তালাগুলোকে টেনে টেনে ঠিক করে বন্ধ হয়েছে কিনা পরীক্ষা করেন। আজকেও উনি তাই করেছেন। ছেলেটি খেয়াল করেছে। এরকম উনি আগে করতেন না। ইদানীং কিছুদিন ধরে করছেন। বাইরের লোহার দরজায় বড় ও শেষ তালাটা দেওয়ার পর কিছুক্ষণ বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তালার দিকে তাকিয়ে থাকেন। সেসময় যদি মোবাইলে ফোন আসে ধরেন না।

শিশিরদা সে-রাত্রে আর সৌম্যকে ফোন করেননি। সৌম্যও ফোন করে কিছু জানতে চায়নি। পরেরদিন সকালে স্নান করে খেয়েদেয়ে স্বাভাবিকভাবে অফিসে পৌঁছেছে। সহকর্মীরা এবং বাকি সবাই ঘটনাটা জানল। পাঁচ-পাঁচটা তালা বন্ধ করা এবং তারপর ঠিকমতো বন্ধ হয়েছে কিনা পরীক্ষা করার পরেও যদি কয়েকঘণ্টা বাদেই কারও সন্দেহ হতে শুরু করে যে, সে ঠিকমতো তালা বন্ধ করেছে কিনা, তাহলে তাকে স্বাভাবিক ভাবা অসম্ভব। কেন সৌম্য, শর্মা এবং শিশিরদাকে শীতের রাত্রে অহেতুক হয়রানি করল, কেন সে নিজে ছুটে এল না, কেন সে তালা দিয়েছে কিনা মনে করতে পারছে না বলছে— তার এরকম বিচিত্র আচরণের কেউ কোনও ব্যাখ্যা পেল না। সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সে এড়িয়ে গেল, কাউকে কিছু কৈফিয়ত দিল না। শিশিরদার সঙ্গে বা অফিসের আর কারও সঙ্গে তার কোনও শত্রুতা নেই। শত্রুতায় যাওয়ার কোনও ক্যাপাসিটিই তার মধ্যে নেই। যাই হোক, দুদিনের মধ্যেই দেশে নতুন ক্রিকেট-সিরিজ শুরু হয়ে গেল, ফলে আলোচনার উন্মাদনা থেকে সৌম্য রেহাই পেয়ে গেল।

কিছুদিন কেটে গেল। আবার একদিন সৌম্য আচমকা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দীপক মিত্রের চোখে ধরা পড়ে গেল। সৌম্য ডিউটি শেষ করে ছ'টার বাসে বাড়ি ফিরছিল। পনেরো মিনিট বাস চলার পর সিটে বসা অবস্থায় তালা দেওয়ার সময়টা মনে করতে গিয়ে সে দেখল ব্ল্যাঙ্ক। কিছু মনে পড়ছে না। সে সাড়ে পাঁচটার সময় একটা সবুজ রঙের বোতল থেকে জল খেয়ে বোতলটা টেবিলের ওপর রেখেছিল। বাইরে গুঁড়ি গুঁড়ি

কুয়াশা জমছিল। কড়ুই গাছ থেকে বাদামি ঝুরঝুরে পাতাগুলো পাক খেয়ে খেয়ে নীচে মাটিতে পড়ছিল। তারপর কী হল? সে এই মুহূর্তে বাসের সিটে বসে আছে। মাঝখানে সে যখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে দূর থেকে বাস আসতে দেখে হাত তুলে বাস থামিয়েছিল, সেই মুহূর্তটুকু তার মনে পড়ছে। তার আগের? জল খাওয়ার পর সে টেবিলে বোতল রেখে সবকিছু ফেলে সোজা বেরিয়ে আসেনি তো? আসেনি যে, কে নিশ্চিত করবে? তক্ষুনি সে সিট ছেড়ে বাসের দরজার কাছে গিয়েছে। বাস থেকে নেমে উল্টোদিক থেকে আসা একটা অটোতে করে অফিস চত্বরে ফিরে গিয়ে সে স্টোরের সামনে পৌঁছে লক্ষ করেছে, বন্ধ দরজায় তালা ঠিকমতো আটকানো রয়েছে। আর, ঠিক সেই সময় দীপক মিত্র সেকশন থেকে বেরোচ্ছে। সৌম্যকে দূর থেকে জোরে হেঁটে ফিরে আসতে দেখে সেই সিকিউরিটি ছেলেটি, যার নাম প্রবাল, এগিয়ে এসেছে। 'হ্যাঁ স্যার, তালা ঠিক আছে।' স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সে বলে দেয়। 'কী ব্যাপার?' দীপক জিজ্ঞেস করে। সে আন্দাজ করে ব্যাপারটা কিছুটা অস্বাভাবিক। সৌম্য আধঘণ্টা আগে বেরিয়ে গিয়েও আবার ফিরে এসেছে।

'স্যার তালা চেক করতে এসেছিলেন।' প্রবাল বলে।

'তালা চেক! আবার! এই তালা আর চাবির খপ্পর থেকে তুমি কি বেরোবে না ডার্লিং! তোমার রিয়েল অবসেশন হয়ে গিয়েছে দেখছি। চলো চলো' সে শিস দিতে দিতে টু-হুইলার পার্কিং-এর দিকে এগোয়। মানুষটা ভারি হাসিখুশি, সৌম্যর কাঁধ আঁকড়ে হাঁটে।

আস্তে আস্তে সবাই তার অস্বাভাবিক উদ্বেগের খবর জেনে যায়। হাসিঠাট্টা শুরু হয়। কেউ কেউ পিছনে তাকে 'পাগল' বলতে শুরু করে। অফিস নামের এক সমষ্টিবদ্ধ, শৃঙ্খলাপরায়ণ হিংস্র সামাজিক জন্তু, সে যদি কোনওক্রমে একবার কোনও মজা-খাদ্য পেয়ে যায়, তাহলে তার অনন্ত স্ফূর্তি-স্পাইরাল আর শেষ হতে চায় না।

অনেকগুলো দিন হয়ে গেল। আলাদা আলাদা করে দিনগুলোকে গুনলে সংখ্যায় অনেক হবে, যেসব দিনে সে স্টোরে তালা দিয়েছে কিনা মনে করতে গিয়ে দেখেছে কিছু মনে পড়ছে না। সারারাত সে আতঙ্কে ভুগেছে। আতঙ্ক থেকে বেরোবার উপায় নেই। ইচ্ছে করলে সে সিকিউরিটিদের মোবাইল নম্বর জেনে নিতে পারে, কিন্তু তাহলে সে ওদের হাতে একেবারে মজার খেলনা হয়ে যাবে। এখন পিছনে হাসে, এরপর সামনেই হাসার সাহস পেয়ে যাবে। ইদানীং পাহারার ছেলেগুলোকে ও দুচক্ষে দেখতে পারে না। দেখলেই মনে হয় ওরা প্রচণ্ড ওপর-চালাক। ওদের অতি-তরুণ হাসিখুশি

সব আশ্চর্য সুখবোধ, পৃথিবী উতরোল করে দেওয়া বিস্ময়-আনন্দের নীচে অপেক্ষা করে থাকা অবিনশ্বর বিষাদ। ভবিষ্যৎ পেরিয়ে দ্রুত সাঁতরে আসা শেষ হয়ে যাওয়ার চিন্তা গলায় হুল ফুটিয়ে দিয়ে যায়। ঘন কালো নিকষ একটি বড় পুঁতির দানার মতো বৃত্তাকার মৃত্যুবীজ। তার সম্পূর্ণ দেহ মুড়ে ছোট্ট করে লুকিয়ে রেখেছে গোলকের ভেতর। হঠাৎ কোনওদিন ভয়াবহ চওড়া ডানা মেলে দেবে।

স্বভাবের মধ্যে নানারকম শয়তানি লুকিয়ে আছে। কিন্তু এই অদ্ভুত ব্যাপারটা শুরু হওয়ার আগে সামান্য মাইনের কর্মরত অল্পবয়সি সৌজন্যপূর্ণ ছেলেগুলোকে তার ভালোই লাগত।

এই আশ্চর্য অস্বাভাবিকতার পিছনে নিশ্চয়ই কোনও-না-কোনও কারণ আছে। কিছু-না-কিছু এর জন্য দায়ী। আজ পর্যন্ত জীবনে যত উদ্বেগ সে বহন করেছে, কাউকে ছাড়া যায় না। সবারই কিছু-না-কিছু দায়িত্ব আছে। সেইসব ঝুঁকিবহুল অনুভূতির অতীত স্মৃতি এই আতঙ্ক তৈরি করে দিয়েছে। কেন? এরকম হতে পারে না? সে কি নেহাতই আজগুবি ভাবছে? চেয়ারের নীচে নিজের পড়ে-থাকা ছায়াকে সে মন দিয়ে দ্যাখে। তার সন্দেহ শক্ত হয়। সে যা ভাবছে তা শুধু সত্য নয়, সত্যের অধিক, ম্যাক্সিমাম লজিক্যাল। কণা কণা পাথরকুচি জমেই এই পাহাড় তৈরি হয়েছে। ভেবে দেখা দরকার আজ পর্যন্ত কারা কারা তাকে যথেষ্ট বিপজ্জনকভাবে উদ্বিগ্ন করেছে। তার মতো ধীরস্থির, ঢিলেঢালা স্বভাবের ছেলে অহেতুক আতঙ্কে ভুগবে কেন? তার মোটেই উদ্বিগ্ন হওয়া স্বভাব নয়। সে কোনওদিন পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোবার আগে উদ্বিগ্ন হয়নি। ইন্টারভিউ দেওয়ার সময় উদ্বিগ্ন হয়নি। আরও আরও সব নিশ্চল মুহূর্ত মনে মনে জমা করে সে প্রকৃতপক্ষে কত বেশি অনুদ্বিগ্ন স্বভাবের তা মাপতে থাকে।

তাহলে সে এরকম একটা বিশ্রী ব্যাপারের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে কেন? কোনও এক জটিল অসমীকরণ দুঃসহ বিস্মৃতিময়তা ডেকে এনেছে, যা একটা আপাততুচ্ছ কিন্তু গুপ্ত গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তকে বেছে নিয়েছে। সে ফ্যাক্টরির স্টোর ম্যানেজার। স্টোর সুরক্ষার প্রধান দায়িত্ব তার। কোটি কোটি টাকার মূল্যবান যন্ত্রপাতি, র-মেটিরিয়াল, স্টেশনারি। অভ্যন্তরীণ উপ-নিয়ম অনুযায়ী, কোনও তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী নয়, খোদ স্টোর ম্যানেজার, নিজে দিনের শেষে স্টোর বন্ধ করবে, অর্থাৎ তার সকল কাজের শেষে, সকল মিটিং, ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট, রক্ষণাবেক্ষণ, তাবৎ রেজিস্টার এবং কম্পিউটার এনট্রি প্রভৃতি সমাপ্তির পর এই সংরক্ষণে এসেই তার মূল দায়িত্ব শেষ হয়। স্নায়ুর পিচ্ছিল গলিপথে বড় হয়ে ওঠা কোনও চোরাগোপ্তা বিরুদ্ধভাব, আচমকা পথ চলতে চলতে, একটা পাতা ছিঁড়ে নেওয়ার মতো করে, তার এই তালা বন্ধ করার মুহূর্তটা স্মরণ পদ্ধতির ধারাবাহিকতা থেকে তুলে নিয়েছে।

সে কি কখনও চেয়েছিল কোনও এক বা একাধিক সময়খণ্ড তার স্মৃতি থেকে লুপ্ত হয়ে যাক? ক্লাস ফাইভে পড়ার সময় এক বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে বাড়ির লাগোয়া বাগানে খেলতে খেলতে সে দেখেছিল বাঁশঝাড়ের পিছনে পিটুলি আর বনডুমুরের ঘেঁষাঘেঁষি ঝোপের মধ্যে তার বাবা উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে। ভয় পাওয়া সত্ত্বেও সে দৌড়ে কাছে যায়। চিৎকার করে ডেকে শরীরটা টেনে-হিঁচড়ে সোজা করে। চোখ খোলা। বাবা মরে পড়ে রয়েছে। বাড়ির লোকে জানে বাবা বাড়ি থেকে বেরিয়ে কী একটা কাজে স্টেশনের দিকে গিয়েছে। বোধহয় ঘণ্টাখানেক ওইভাবেই পড়েছিল। কারোর চোখে পড়েনি। সাদা হাফশার্ট আর আকাশি পায়জামা পরনে। ঘাড় বেয়ে সারি সারি ছোট ছোট পোকা উঠে কানের ভেতরে গহ্বরে ঢুকে যাচ্ছিল।

ওই খণ্ড সময়টুকু তার চেতনাশৃঙ্খল থেকে লুপ্ত হয়ে যাক, সে চেয়েছিল। পরের অনেকগুলো দিন মা অসুস্থ, কখনও অচৈতন্য, বাড়িতে ঠিক করে রান্নাবান্না হয় না। ছোটখাটো রোগা চেহারায়; ন্যাড়ামাথায় চারপাশকে অসম্ভব রাক্ষুসে মনে হয়েছিল। কিন্তু বহুদিন হল ঘটনাটার ভয়াবহতা তার স্মৃতি থেকে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সে নিশ্চিত বোঝে। ওই প্রাচীন বিকেলের আর কোনও দায় নেই।

কলেজে প্রথম ঘোর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল যে মেয়েটার সঙ্গে সে একদিন ভরপুর আড্ডায় বন্ধুদের জমায়েতের মধ্যে নির্ধারিত বিয়ের কার্ড এগিয়ে দিয়েছিল। তারা সকলে মিলে

তখন কফি আর স্যাণ্ডুইচ খাচ্ছিল। এরকম অপদার্থ চতুরতা তার কাছে প্রত্যাশিত ছিল। এটা তার দেওয়া সারপ্রাইজ। আশ্চর্যচিহ্ন। ঋণাত্মক নম্বর দেওয়ার যোগ্য নিচুমানের হিংস্র স্যাডিজম দেখানো সেই আঘাতপ্রবণ সন্ধ্যাটিকেও সে ভুলতে চেয়েছিল এবং সম্পূর্ণ ভুলতে পেরেছে বলে জানে।

পরবর্তী যে ক'টি সম্পর্কে সে জড়িয়েছিল নষ্ট হয়ে গিয়েছে সব। একদিন না একদিন ম্লান দাড়িসমেত উদাসীন উপেক্ষা ভেসে এসেছে উল্টোদিক থেকে। তার মতো অতিখেয়ালি, খাপছাড়াভাবে চুপ করে থাকা, কখনও অকারণ বিমর্ষ এবং তার পরমুহূর্তে ভারসাম্যহীনভাবে উৎফুল্ল লোকের সঙ্গে আরেকজন মোটামুটি প্রথাবদ্ধ স্বাভাবিক, অন্তত প্রচলিত অর্থে কিছুটা লজিক্যাল মানুষের বিনিময়ের সমস্যা অনেক। চারপাশের কোলাহল, জীবনপীড়া ও যাপনের সঙ্গে তার যে নিজস্ব, অতিমৌলিক, একইসঙ্গে সানন্দ অথচ ক্লিষ্ট যোগাযোগের ধরণ, তার মধ্যে প্রেমনির্ভর যৌথতার টিকে থাকা কঠিন। তবু আত্মতৃপ্ত লোকটি বারবার ভুল সম্পর্কে জড়িয়েছে। প্রতিটি হার ভুলতে চেয়েছে আর অবিশ্বাস্য সার্থকভাবে ভুলতে পেরেছে।

তাহলে?

প্রতিটি নিয়তিনির্দিষ্ট মুহূর্ত, করুণায় বিনষ্ট হওয়ার মুহূর্ত, অপমানের মুহূর্ত, চারদিকের সজ্জিত বন্ধনের মধ্য থেকে আচমকা তলপেট থেকে উঠে আসা বিষ-অবসাদের ক্ষণমুহূর্ত, ভেঙে যাওয়া, নষ্ট হয়ে যাওয়া, নরকের দিকে চলে যাওয়া সবকটি পল, অণুপল, অণুতম পল— সময়ের সকল বিস্ফারিত হয়ে ওঠা একক— এসব সে আর সামলাতে পারছে না। তার নির্জন বিস্মৃতিবৃক্ষের একটি একটি করে পাতা খসে পড়ছে।

বহুদূরে, উঁচুতে উড়ন্ত একটি কালো ছোট ঢেউ অবদমিত রোমাঞ্চকর শিসে তার মাথার ভেতর শব্দ ঢেলে দিয়ে যায়। বিষাদ, সৌম্য, বিষাদ। সকল বিস্মরণের পিছনে লুকনো অনিবার্য বিষাদ। সব আশ্চর্য সুখবোধ, পৃথিবী উতরোল করে দেওয়া বিস্ময়-আনন্দের নীচে অপেক্ষা করে থাকা অবিনশ্বর বিষাদ। ভবিষ্যৎ পেরিয়ে দ্রুত সাঁতরে আসা শেষ হয়ে যাওয়ার চিন্তা গলায় হুল ফুটিয়ে দিয়ে যায়। ঘন কালো নিকষ একটি বড় পুঁতির দানার মতো বৃত্তাকার মৃত্যুবীজ। তার সম্পূর্ণ দেহ মুড়ে ছোট্ট করে লুকিয়ে রেখেছে গোলকের ভেতর। হঠাৎ কোনওদিন ভয়াবহ চওড়া ডানা মেলে দেবে। এ-জীবনের সকল পিছনে চলে যাওয়া অতীত সময় যে বহমান অপ্রাপ্য মুহূর্তসমগ্রকে হারিয়ে যেতে দেখেছে যাকে আর চরম আর্ত প্রার্থনাতেও কখনও কোনওভাবে ফেরত পাওয়া যাবে না, যে চ্যুত গাছের পাতাটি আর কখনও কালো হয়ে আসা একদা সবুজ বৃন্তের সঙ্গে মিলিত হবে না, সেই প্রত্ন হাহাকার তার স্নায়ুসংকেতে যাতায়াত করছে। অকল্পনীয় সংকেতরেখা। এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যাচ্ছে, কিন্তু ও-ঘর থেকে আর এ-ঘরে ফেরত আসছে না।

দূরের অনির্দিষ্ট দিগন্ত দ্যাখে সৌম্য। কোনও ব্যক্তি বা ঘটনার জন্য নয়, চলে যাওয়া অতীত সময়ের জন্য সে বিষণ্ণ? একটি ত্রুটিহীন পরিচ্ছন্ন সমাধানে তাকে পৌঁছতে হবে। তার গহিন ধারাবাহিক যাপন, পৌনঃপুনিকতা, তার স্টোর, যন্ত্রপাতি, দামি জিনিসপত্রের দায়িত্ব, লেজার, রেজিস্টার, কম্পিউটার, ইনভেনট্রি, ডেসপ্যাচ, ক্লোজিং স্টক, তার নষ্টপ্রেম, গূঢ় গহন পারিবারিকতা, তার সকল ডোরাকাটা কালো হলুদ বর্ণিল মুহূর্তপাত— এ-সবই গভীর রক্তচিহ্নে স্মৃতিনিবিষ্ট আছে। নষ্ট হয়নি। কোনও-কোনও মুহূর্ত, মুহূর্তগুচ্ছ কোষসমূহের ভেতরে অতলান্ত সরোবরের তলার অন্ধকার কাদায় ঢুকে গিয়েছে। হারিয়ে যাওয়া সেইসব অস্পষ্ট প্যাঁচালো সংকেত তার চিন্তাশৃঙ্খলার সামনে গদাম করে আকাশ থেকে ভূমিতে নামিয়ে দিয়েছে এক অনিঃশেষ লৌহদরজা। দৃষ্টি রুদ্ধ করে দেওয়া জগতবিস্তৃত কপাট। স্টোরের দরজা। বড় বড় লাল রঙের স্ক্রু আটকানো কঠিন বোল্টের শক্ত বৃত্তপাকে আবদ্ধ দানবীয় দৃশ্যঘোর তাকে দুর্বলতম বিস্মরণের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কিছু করার নেই। তাকে এই তাৎক্ষণিক বিস্মৃতি মেনে নিতে হবে। অতলান্ত স্বচ্ছ সরোবর আর তার তলায় কয়েকশো ফুট নেমে যাওয়া গভীর অন্ধকার কাদা। মেনে নেওয়ার প্রসন্নতায় তার নিজেকে কিছুটা সহজ বহনযোগ্য লাগে।

প্রতিদিন সে স্টোর বন্ধ করে পাঁচিলের ভেতর লম্বা পথ হেঁটে গেট পেরিয়ে বাইরে আসে। শিল্প-শহরের চওড়া রাস্তা, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছের ছায়া দিয়ে হাঁটে। 'লাগিয়েছিস!' বলে যারা বৃথা যৌনলাঞ্ছনার চেষ্টা করে, কোনও এক আচমকা পাতালে নেমে যাওয়া শূন্যতার সামনে এলে তাদের সব যৌনমস্করা, তাচ্ছিল্য, সপ্রতিভ উত্তেজনা, উদ্যত দেহভঙ্গির নীচে তাদের অনন্ত শক্তিবোধ, অনন্ত স্বাভাবিকতা কেমন ঝুরঝুরে, বাতিল, অনুভবের সম্মান থেকে ভয়াবহ নীচে অসম্ভব জড়তায় চলে যায়, তা মনে করলে এদের আর তত হিংস্র লাগে না, বরং করুণা হয়।

বিহ্বল দিগন্ত। অন্তঃপ্রকৃতি জাঁকিয়ে ওঠা নেশার মতো রক্তিম। নীচের দিকে ঢালু হয়ে নেমে যাওয়া হাইওয়ের প্রান্তে সে বাস ধরার জন্য দাঁড়ায়। ফ্যাক্টরি গেট থেকে সাঁ সাঁ করে একটির পর একটি মোটরবাইক বেরিয়ে যাচ্ছে। সে অতীত জীবনসমগ্রকে আচমকা চোখ বন্ধ করে একপলক আঁকড়ে নেয়। এই মুহূর্তে তার নিজেকে সুরক্ষিতই লাগে।

স্বর্ণাক্ষরে পত্রিকা

কর্মক্ষেত্র

সব সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক
বাংলা পত্রিকার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিক্রি*

ভ্রমণ

ভারতে সবচেয়ে বেশি পড়া ভ্রমণ পত্রিকা*

কালের কষ্টিপাথর

নতুন মাসিক সাহিত্য পত্রিকা

ছেলেবেলা

ছোটদের পরমাশ্চর্য মাসিক পত্রিকা

****

কিংবদন্তি পত্রিকার
সংরক্ষণযোগ্য সংকলন
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
কবিতা-পরিচয়

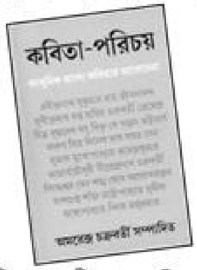

রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে
থেকে শুরু করে শক্তি চট্টোপাধ্যায়,
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার
পর্যন্ত ২১ জন কবির ৪০টি কবিতা
নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন
বুদ্ধদেব বসু, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন
দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
প্রমুখ কবি। ₹১৫০

****

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
গল্প ও কবিতা সংকলন
নিমফুলের মধু ₹৬০
মৃত্যুর অধিক এই মেরে ফেলা ₹৫০
নদী জানে, কচি নিমপাতারাও জানে ₹৩০

আমাদের সব বই ও পত্রিকা
অনলাইনেও পাওয়া যায়:
www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kol-19
Phone: 2283-2320 **Fax:** 2287-6448
Website: www.swarnakshar.in
E-Mail: info@swarnakshar.in

*তথ্যসূত্র: *IRS (Indian Readership Survey) 2012 Q4*

ভ্রমণ কথা

আমাজন

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

১৯৯৯-এর গ্রীষ্মে আটলান্টিক মহাসাগরে, স্পেন আর আফ্রিকার প্রায় মাঝামাঝি টেনেরিফ নামে একটা দ্বীপ থেকে ফেরার পথে খবরের কাগজে আমাজনের অরণ্য ধ্বংসের বিষয়ে ছোট্ট একটা খবর পড়ে আমি প্রথম আমাজন সম্পর্কে সচেতন হই। আমাজনের চিরহরিৎ অরণ্য ধ্বংসের বিরুদ্ধে আমার সেদিনের ক্ষোভ ও বেদনার কথা বিমানে বসেই লিখে পাঠিয়েছিলাম 'ভ্রমণ' পত্রিকায়। সে যাত্রায় জুরিখে বিশ্ব সম্পাদক সম্মেলনে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার কয়েকটি সংবাদপত্রের সম্পাদকদের সঙ্গে এ নিয়ে আমার আলোচনাও হয়। তখন ঘুণাক্ষরেও জানি না, পরের বছরই আমি স্বপ্নের মতো সুদূর সেই আমাজনে যাব।

আশ্চর্যের হলেও তাই ঘটল। এবছর গ্রীষ্মে ঘটনাচক্রে আমিই আমাজনের জলে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালাম। আরও কাকতালীয়, সঙ্গে নানা দেশের সংবাদপত্র-সম্পাদকদের দল। ব্রাজিল-আর্জেন্টিনারও। আমার পক্ষে এ যেন ইচ্ছাভ্রমণ! গত বছর যখন আটলান্টিকের নীল জলরাশির তিরিশ-বত্রিশ হাজার ফুট উঁচুতে আমাজনের মহা অরণ্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছিলাম তখন নিশ্চয়ই এবারের এই আমাজনভ্রমণ— ইচ্ছা হয়ে ছিল মনের মাঝারে।

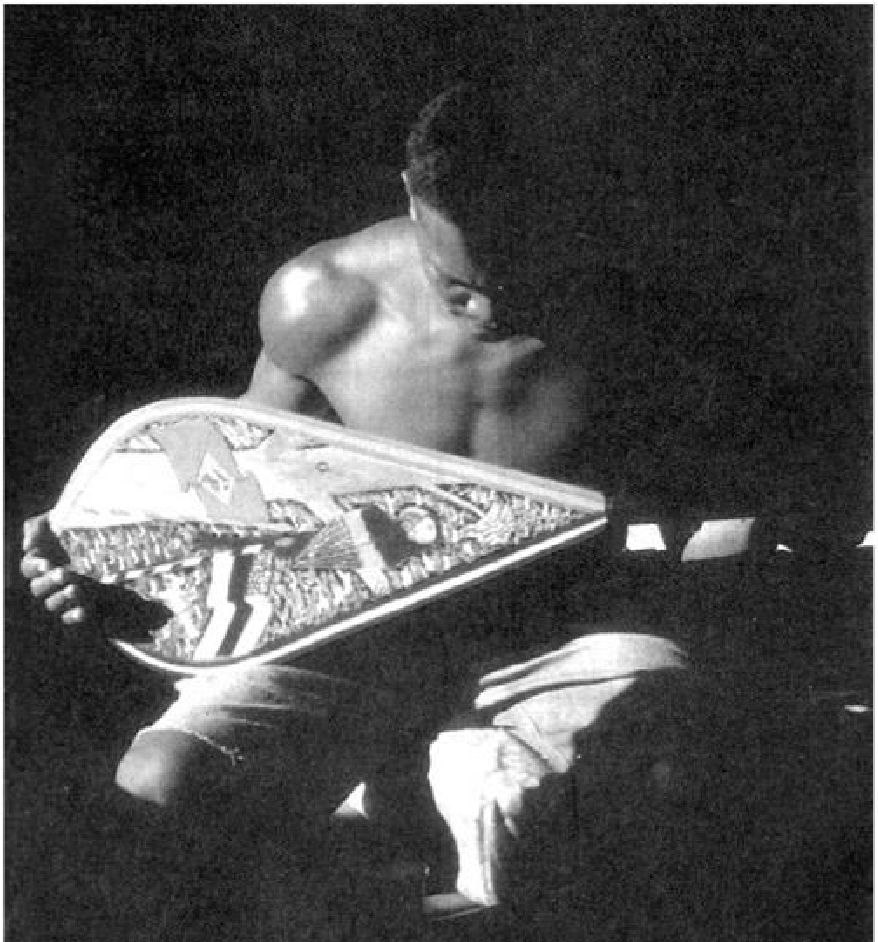

জুন মাসের এক সকালে রিও ডি জেনেরো থেকে ওদেশের জাতীয় বিমান ভারিগে চড়ে এক ঘণ্টায় ব্রাজিলের রাজধানী ব্রাজিলিয়া ছুঁয়ে আরও তিন ঘণ্টায় মানাউস পৌঁছলাম। মানাউস আমাজন রাজ্যের রাজধানী, এটাই আমাজনের প্রবেশদ্বার। মানাউস বিমানবন্দর থেকে বাসে মানাউস জেটি,

আমাজনের দ্বীপে

নদীর বুকে কাঠের পাটাতনে কাঠকুটো ফলের বিচির তৈরি মালা দুহাতে ধরে দুটি জলপরী নয় তো? ভারতীয়দের মতোই শ্যামলাবরণ, কালো চোখ, কালো চুল, গায়ে লতাপাতা কাঠকুঠোর নামমাত্র পোশাক, বক্ষাবরণ বলতে কালো দুটি নারকোলমালা। অতিথিরা একে একে নামছেন, দুই জলপরী দুজন করে অতিথির অবনত গলায় মালা পরিয়ে দিচ্ছে।

ঘণ্টাদুয়েকের পথ। এখানেই নিগ্রো নদীর ওপর দাঁড়িয়ে আছে আরিয়াউ আমাজন টাওয়ার্স হোটেলের নিজস্ব দুটি বোট। দুই বোটে ভাগ হয়ে পৃথিবীর বহু বিখ্যাত পত্র-পত্রিকার সম্পাদক পরিচালকরা চলেছেন আমাজনের জল-জঙ্গল দেখতে। আমি যে বোটটায় উঠেছি তার নাম অ্যালিগেটর।

এবারের আমাজন ভ্রমণে যাঁদের সঙ্গী পেয়েছি তাঁদের তুলনায় আমি অতি সামান্য লোক। তবে এঁদের অনেকেই নিজগুণে আমার বন্ধু, তার আনন্দ আলাদা। এঁদের মধ্যে সুইডেনের বোনিয়ের সংবাদপত্রগোষ্ঠীর কর্ণধার— বেঙ্গট ব্রাউন, ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েশন অব নিউজপেপার্স-এর মহাপরিচালক তিমতি বলডিং, বর্তমান প্রেসিডেন্ট, কানাডার জাতীয় সংবাদপত্র দ্য গ্লোব অ্যান্ড মেইল-এর চেয়ারম্যান রজার পারকিনসন, জার্মান প্রকাশক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আলেকজান্ডার ফন কুক, ভারতের মালয়ালা মনোরমা পত্রিকা গোষ্ঠীর কর্ণধার ম্যামন ম্যাথু ও জেকব ম্যাথু, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের পরিচালক শেখর গুপ্ত, দ্য হিন্দুর জয়েন্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর নরসিংহম মুরলী, মাতৃভূমি পত্রিকা গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান বীরেন্দ্রকুমার— এরকম অনেকেই ছিলেন। লিথুয়ানিয়ার রেসপুবলিকা পত্রিকার প্রধান সম্পাদক বিতাস টমকুস ও এরকম আরও কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকেও পেয়েছিলাম। অধিকাংশই সপরিবারে চলেছেন আমাজন দর্শনে।

বন্ধুসঙ্গের আনন্দের মধ্যেও নিঃসঙ্গের জন্য একটা আকুলতা আমাজনের জল-জঙ্গলে আমাকে সব সময়ই পেয়ে বসেছিল। তার কারণ আমাজন মানেই এক বিস্ময়কর জগৎ! লক্ষ লক্ষ বর্গমাইল জুড়ে আদিম অরণ্য। নটি দেশ জুড়ে মোট ষাট লক্ষ বর্গকিলোমিটার এর ব্যাপ্তি। এগারোশো উপনদী। সাত হাজার ছশো কিলোমিটার লম্বা আমাজন নদী। লক্ষ লক্ষ প্রজাতির কীটপতঙ্গ, তাদের সকলের পরিচয় এখনও অজানা। বনের কোন অজানা গভীরে অসংখ্য উপজাতির বাস, যাদের কোনও কোনওটিকে আজ অবধি সভ্য পৃথিবীর মানুষ চোখেই দেখেনি!

নিগ্রো নদী ৩,২০০ কিলোমিটার দীর্ঘ। কালো জলের নদী। মানাউস জেটি থেকে উত্তর-পশ্চিমে তিন ঘণ্টায় ৬৫ কিলোমিটার কালো জলস্রোত পেরিয়ে নদীর ওপরেই আরিয়াউ আমাজন টাওয়ার্স হোটেলে যখন পৌঁছলাম তখন রিও ডি জেনেরোর ঘড়ি অনুযায়ী বিকেল ৫টা, আমাজনের ঘড়িতে বিকেল ৪টে। হোটেলের প্ল্যাটফর্মে (নাকি পাটাতনে!) নেমে আমি তো অবাক! নদীর বুকে কাঠের পাটাতনে কাঠকুটো ফলের বিচির তৈরি মালা দুহাতে ধরে দুটি জলপরী নয় তো?

আমাজনের দ্বীপে

ভারতীয়দের মতোই শ্যামলাবরণ, কালো চোখ, কালো চুল, গায়ে লতাপাতা কাঠকুঠোর নামমাত্র পোশাক, বক্ষাবরণ বলতে কালো দুটি নারকোলমালা। অতিথিরা একে একে নামছেন, দুই জলপরী দুজন করে অতিথির অবনত গলায় মালা পরিয়ে দিচ্ছে। হোটেলের পর্তুগিজ পরিচালকদের কেউ বলে দিলেন এটাই আমাজনের অতিথি বরণের চিরাচরিত রীতি। তবে তো এ মালা না নিয়ে গেলেই নয়! আমার দুই কন্যা, অতএব দুবার মাথা নত করে দুটি মালা সংগ্রহ করতে হল। ইউরোপ-আমেরিকার বড় বড় সাহেব-সুবোরা যখন গলায় মালা নিচ্ছেন তখন তাঁদের সাধ্বী স্ত্রীরা বা সঙ্গী বান্ধবীরা ক্যামেরায় ফট ফট করে ছবি তুলছেন। আমার সঙ্গে এরকম কেউই নেই, অগত্যা আমার পুরনো বন্ধু মালয়ালা মনোরমার জেকব ম্যাথু এগিয়ে এসে আমার এমন অবিশ্বাস্য সম্বর্ধনার একটা ছবি তুলে দিলেন। আমিও তাঁর, তাঁর স্ত্রী ও তাঁর ছেলের জলপরীর হাতে মালা পরার মুহূর্তগুলোকে তাঁদের ক্যামেরায় ধরে দিয়েছি।

পরদিন সকাল থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমাজনের চিরহরিৎ অরণ্যে, এ যেন আদি-অন্তহীন এক গভীর কুহেলিকা। অন্ধকার, ভিজে স্যাঁতসেঁতে, গাছ-গাছালি লতাগুল্মের জট, অসংখ্য ঝুলন্ত ঝুরি, সিঁড়ির মতো শিকড়, কত রকম ফল ফুল বীজ পাতা, কত রকম কীটপতঙ্গ পাখি প্রাণী— দেখতে দেখতে মনে হয় আদিমকালের অবিকল পৃথিবীর সঙ্গে আজ আমার দেখা হয়ে গেল। কেউ যদি এভাবে দু-চার ঘণ্টাও আমাজনের জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান, পদে পদে উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের অসংখ্য বিস্ময় আবিষ্কার করে হয়তো মূক হয়ে যাবেন।

মাঝে মাঝে দু-চার ফোঁটা বৃষ্টি হচ্ছে, মাঝে মাঝে পথ হারিয়ে যায়, বহু জায়গায় গাইড ডালপালা কেটে পথ করে দিলে তবেই এগোতে পারছি।

ডালপালা ছাঁটায় আমার অস্বস্তির কথা শুনে গাইড আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন, অরণ্যের এতে কোনও ক্ষতি হয় না।

ঘণ্টাদুয়েক গাইডের সঙ্গে ঘোরার পর আমি একটা মস্ত ব্রাজিল-নাট গাছের নিচে বসে গাইডকে ছুটি দিলাম, বললাম ঘণ্টাখানেক পরে আসতে। গাইডের তাতে প্রবল আপত্তি। শেষপর্যন্ত আমি এখানেই থাকব, কোনও কারণেই অন্য কোথাও চলে যাব না— এই রকম

সামনের গাছ থেকে হরীতকীর মতো একটা ফল ছিঁড়ে নিয়ে হাতের মস্ত দা-এর এক কোপে সেটাকে দু-টুকরো করে ভেতর থেকে ছোট্ট তুলতুলে একটা পোকা বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, আমাজনের জঙ্গলে পথ হারিয়ে গেলে কেউ আর তার চেনা পৃথিবীতে ফিরতে পারে না, তখন ক্ষুন্নিবৃত্তি করাই সবচেয়ে সমস্যা। ওই অবস্থায় এই পোকা খেয়েই আমাজনের জঙ্গলে বেঁচে থাকার লড়াই শুরু করতে হয়।

কড়ার করে আমাজনের অরণ্যে একলা হবার সুযোগ পেলাম।

পর্তুগিজ গাইডের নাম সোলেই। হঠাৎ সামনের গাছ থেকে হরীতকীর মতো একটা ফল ছিঁড়ে নিয়ে হাতের মস্ত দা-এর এক কোপে সেটাকে দু-টুকরো করে ভেতর থেকে ছোট্ট তুলতুলে একটা পোকা বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, আমাজনের জঙ্গলে পথ হারিয়ে গেলে কেউ আর তার চেনা পৃথিবীতে ফিরতে পারে না, তখন ক্ষুন্নিবৃত্তি করাই সবচেয়ে সমস্যা। ওই অবস্থায় এই পোকা খেয়েই আমাজনের জঙ্গলে বেঁচে থাকার লড়াই শুরু করতে হয়।

এর মধ্যে একদিন আকাজাতুবা নামে একটা গ্রামে গিয়েছিলাম, গ্রামের মানুষজনের ছবি তুলেছি। গিয়েছি প্রায়াগেরাঞ্জি নামে একটা দ্বীপে। কিন্তু নটি দেশ জুড়ে পরিব্যাপ্ত ষাট লক্ষ বর্গকিলোমিটার আয়তনের এই মহারণ্যের প্রায় ছত্রিশ লক্ষ বর্গকিলোমিটারই যেখানে ব্রাজিলের মধ্যে পড়েছে, সেখানে দুটো একটা গ্রাম, দুয়েকটা দ্বীপ, দু-দশ ঘণ্টার অরণ্য অভিযানে সাধ মেটে না। তাও আবার নিছক এই কথার পিঠে কথা বসিয়ে আমাজনের কীই বা বলা যায়!

শুধু আমাজনের ছবি তুলেই বিখ্যাত হয়েছেন ইতালীয়-ফরাসি আলোকচিত্রী লিওনাইড প্রিন্সিপি। আমাজন নিয়ে বহু দিন ধরে একটা বই লিখেছেন ফ্রান্সিসকো রিত্তা বেরনারদিনো, তাঁর সেই 'আমাজন ইমোশানস' নামের বইয়ে প্রিন্সিপির অসামান্য সব ফটো আছে। আমার আমাজন অভিযানের উপরিপাওনা বেরনারদিনোর সঙ্গে আলাপ হওয়া, তাঁর মুখে তাঁর আমাজন অভিজ্ঞতার কথা শোনা। তাঁর পর্তুগিজ ভাষা মুখে মুখে আমাকে ইংরিজি করে শোনান তাঁর মেয়ে এলিয়েনা, আমার ইংরিজি পর্তুগিজে বুঝিয়ে দেন বেরনারদিনোকে।

এলিয়েনার সঙ্গে কথা হল, প্রিন্সিপির সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবেন, আমি 'ভ্রমণ'-এ তাঁর কয়েকটি ফটো ছাপার ব্যাপারেও কথা বলতে চাই।

এলিয়েনা বললেন, প্রিন্সিপি এখন এখানেই আছেন, ওঁর সঙ্গে কথা বলে আপনি আনন্দ পাবেন।

সাত সকালেই খবর পেলাম, প্রিন্সিপি গতকালই আবার জঙ্গলে গেছেন, কবে ফিরবেন কেউ জানে না।

বেরনারদিনোর বইটির ছবিগুলো প্রিন্সিপির দশ বছরের পরিশ্রমের ফসল। তার পরেও প্রায় পাঁচ বছর কেটে গেছে, আজও আমাজনের ছবি তোলার কাজ তাঁর শেষ হয়নি।

> নিগ্রো নদীর ওপর দুবছর ধরে আমাজনের লোকদের দিয়ে তাদেরই গৃহনির্মাণরীতি অনুযায়ী বৃক্ষচূড়ার উচ্চতায় সম্পূর্ণ কাঠের তৈরি দুশো ঘরের এই আরণ্যক হোটেলটি। এই বিস্ময়কর পর্যটক-আবাসটির স্রষ্টা কে জানেন? 'আমাজন ইমোশানস' বইয়ের লেখক ফ্রান্সিসকো রিত্তা বেরনারদিনো।

আমাজন শুধু পৃথিবীর অতীত নয়, পৃথিবীর ভবিষ্যৎও। মানুষের চিরকালের পরমায়ু। আমাজন বাঁচলে তবেই পৃথিবী বাঁচবে, সেটাই এই জল-জঙ্গলের এক আশ্চর্য সৌন্দর্য। আমাজন একদিন আমজনতার বিস্ময় হয়ে উঠবে।

আমাজনের বলতে গেলে আগে এই বিস্ময়কর আরণ্যক হোটেলটার কথা বলতেই হয়। নিগ্রো নদীর ওপর দুবছর ধরে আমাজনের লোকদের দিয়ে তাদেরই গৃহনির্মাণরীতি অনুযায়ী বৃক্ষচূড়ার উচ্চতায় সম্পূর্ণ কাঠের তৈরি দুশো ঘরের এই আরণ্যক হোটেলটি। এই বিস্ময়কর পর্যটক-আবাসটির স্রষ্টা কে জানেন? 'আমাজন ইমোশানস' বইয়ের লেখক ফ্রান্সিসকো রিত্তা বেরনারদিনো। ব্রাজিল-আমাজনে যাঁরা বেড়াতে আসবেন তাঁদের জন্য এই হোটেলটাই যেন এক কল্পরাজ্য। জল-জঙ্গলের মধ্যে, দূরে দূরে, বৃক্ষচূড়ার উচ্চতায় একেকটি টাওয়ারের অনেকগুলি তলায় বেশ কয়েকটি করে ছোট বড় ঘর, বিশাল স্যুইট। এক টাওয়ার থেকে আরেক টাওয়ারে যাবার কাঠের সরু পথটি যেন একটা দীর্ঘ মাচা। সবটাই নদীর বুকে বা জঙ্গলের অভ্যন্তরে। এই মাচাপথের কোথাও কোথাও জোয়ারে জল বয়। জুনের মাঝামাঝি এক মধ্য রাতে আমি নিজেই চার-ছ ইঞ্চি জলের মধ্য দিয়ে হেঁটে গেছি। আমাজন রেইন ফরেস্টের ভেতরে বৃক্ষচূড়ার সমতলে ২৬০ ঘরের এত বড় 'ইকোলজিক্যাল জাঙ্গল হোটেল' শুনলাম সারা পৃথিবীতেই আর নেই। টাওয়ারগুলোর মধ্যে কাঠের তৈরি যাতায়াতের সরু মাচাপথের মোট দৈর্ঘ্য ৮ কিলোমিটার! বারোটি বিশেষ স্যুইটের একটির নাম টারজান হাউস, সেটি প্রায় একশো ফুট উঁচু আমাজনের দৈত্যাকার জ্যান্ত গাছের মাথায়।

আমি ছিলাম ছয় নম্বর টাওয়ারে। তেতলার ঘরে। জঙ্গলের মধ্যে বাতানুকুল বিরাট ঘর। সব ঘরের সঙ্গেই লাগোয়া স্নানঘর ও জঙ্গলমুখী নিজস্ব বারান্দা। সন্ধেবেলা সাত নম্বর টাওয়ারের সর্বোচ্চ তলে ডিনার শেষ করে ফিরে এসে বারান্দায় বসে থাকতে থাকতে এক সময় আমার পূর্বজীবন মন থেকে ঠিক কর্পূরের মতো উবে যায়। রাত যত বাড়তে থাকে ততই নিজের অতীত লোপ পেতে থাকে, চতুর্দিকে শুধু জেগে ওঠে এই পৃথিবীর অতীত। অন্ধকারে একা বসে বসে আমার দৃষ্টি থেকে এতকালের সব চেনা দৃশ্য মুছে যায়, আমার শ্রবণ থেকে এত কালের সব চেনা ধ্বনি মুছে যায়, আমার চোখ জুড়ে থাকে অনাদি অরণ্য, কান ভরে থাকে অসংখ্য ধ্বনিতে। এতরকম কীটপতঙ্গের এমন বিচিত্র ডাক ও আওয়াজ কে লিখবে!

একদিন রাতে বারান্দায় বসে থাকতে থাকতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আমাজনের নদী উপনদীতে অত্যধিক অ্যাসিডের জন্য ওখানে মশা নেই। ফলে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছি। ঘুম যখন ভাঙল তখনও বেশ রাত। ঘরে চলে আসার সময় অন্ধকারে চোখে পড়েনি, সকালের আলোয় দেখি বারান্দা ভরা জীবিত ও মৃত অসংখ্য পোকামাকড়। অদ্ভুত তাদের রং ও নকশা! আমার জামাকাপড়ের মধ্যেও পেলাম কয়েকটিকে। দরজা খোলা পেয়ে বারান্দা থেকে ঘরে ঢুকে পড়েছে সাত-আটটা নানা বয়সের ব্যাঙ ও বিচিত্রদর্শন পোকা ও প্রজাপতি। আমার মাথার চুলে, কপালে, ঘাড়ে, জামাকাপড়ে, পায়ের পাতায়ও পেলাম কয়েকটাকে। এদের এই আদিম অক্ষুণ্ণ পৃথিবীতে আমি যে একজন কিম্ভুত বিদেশি সেটা এইসব প্রাণীর সরল মনে ধরা পড়েনি মনে হয়।

আমাজন নিয়ে লেখবার একটা খুব বড় সমস্যা— দু-চারদিনে দুয়েকটা দিক ঘুরে দেখে অনন্ত রহস্যময় আমাজনের কতটুকুই বা দেখা হয়!

আমি মাত্র চারদিন ধরে জলে-জঙ্গলে ঘুরেছি। দুটি দ্বীপে ও একটি গ্রামে গিয়ে সেখানকার মানুষের ঘরসংসার জীবনযাত্রা দেখেছি। আমার খুব ইচ্ছা, পুরো একটা বছর সব কটি ঋতুতে আমাজনের জলে জঙ্গলে দ্বীপে গ্রামে গভীর অরণ্যে ঘুরে বেড়াব। এতটা যদি নাও পারি, অন্তত এই আরিয়াউ আমাজন টাওয়ার্স হোটেলের ব্যবস্থাপনায় সারা রাত জঙ্গলে থাকব। গভীর জঙ্গলের মধ্যে ইন্ডিয়ান উপজাতিদের নানা অনুষ্ঠান দেখব আর

ক্যানোয় চড়ে আনাভিলানাস দ্বীপপুঞ্জের দ্বীপ থেকে দ্বীপে ঘুরে বেড়াব। চারশো দ্বীপ নিয়ে এই আনাভিলানাস আর্কিপেলাগো, এটাই পৃথিবীর বৃহত্তম ফ্রেশ ওয়াটার দ্বীপপুঞ্জ। বলা যায় আরিয়াউ আমাজন টাওয়ার্স হোটেলের সামনে থেকেই শুরু হয়েছে।

হোটেলটার কথায় ফিরে আসি। সামান্য অতিরঞ্জন সইলে বলা যায়, মরুভূমিতে যেমন উট, সমুদ্রে যেমন জাহাজ, আমাজন রেইন ফরেস্টে তেমনই এই আরণ্যক হোটেল।

এই বিস্ময়কর আরণ্যক হোটেল তৈরির ইতিহাসটি না বললে একইসঙ্গে দুইকূল রাখার মতো ব্যবসা ও পরিবেশ সুরক্ষার ক্ষেত্রে হোটেল মালিকের কল্পনা ও দূরদৃষ্টি বোঝা যাবে না।

বিখ্যাত সমুদ্রতত্ত্ববিদ ফরাসি অভিযাত্রী জাক কুস্তো ১৯৮২ সালে তাঁর আমাজন অভিযানের সময় ঘোষণা করেছিলেন যে আজকের এই পারমাণবিক যুদ্ধের আশংকা একদিন মিলিয়ে যাবে। ভবিষ্যতের যুদ্ধ হবে যারা প্রকৃতিকে রক্ষা করে আর যারা প্রকৃতিকে ধ্বংস করে সেই দুটি দলের মধ্যে। ফলে আমাজন পড়বে প্রবল ঝঞ্ঝার মুখে, এই মহা অরণ্যের কী করা হচ্ছে দেখতে সারা পৃথিবী থেকে ছুটে আসবেন বিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ, শিল্পী— সবাই।

কুস্তো তাঁর সেই আমাজন অভিযানের সময় থাকতেন মানাউসে ফ্রান্সিসকো রিত্তা বেরনারদিনোর মোনাকো হোটেলে। বেরনারদিনো নিজে পর্তুগিজ, আমাজন রাজ্যের রাজধানী মানাউসে হোটেল চালান, সেখানেই থাকেন, আমাজনের রেইন ফরেস্ট তাঁর প্রিয় পৃথিবী, তিনি কুস্তোর কথাবার্তায় ভবিষ্যতের আঁচ পেয়ে তাঁরই পরামর্শে আমাজন রেইন ফরেস্টের মধ্যে নিগ্রো নদীর তীরে চার স্যুইটের ছোট্ট একটা জঙ্গল-হোটেল তৈরি করেন। সেটাই এখন বিশ্বের বৃক্ষচূড়ার সমতলে তৈরি পরিবেশসই বৃহত্তম জঙ্গল-হোটেল।

রিত্তা বেরনারদিনোর সঙ্গে এ যাত্রায় আমার আমাজন অরণ্যের নানা কথা হল, আমাকে তাঁর বইটিও দিয়েছিলেন, সেই বই নিয়ে আলোচনা হল, সবই অবশ্য তাঁর মেয়ে এলিয়েনা রিত্তার ইংরিজি অনুবাদের মধ্যস্থতায়। বেরনারদিনো হোটেলের প্রেসিডেন্ট, এলিয়েনা চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার। বেরনারদিনোর কথায়— এই কর্মকাণ্ডের পিছনে আমার লক্ষ্য, আমাজনের পরিবেশ একটুও ক্ষুণ্ণ না করে সুসমৃদ্ধ এই চিরহরিৎ অরণ্য একেবারে ভেতর থেকে প্রাণ ভরে উপভোগ করার সুযোগ করে দেওয়া।

মস্ত বড় রাজাই হোন আর সামান্য প্রজাই

আমাজনের দ্বীপে

হোন, ব্রাজিলের আমাজনের জল-জঙ্গল দেখতে আপনাকে এই হোটেলেই উঠতে হবে। আমি একদিন কয়েক ঘণ্টা হোটেলের বিভিন্ন টাওয়ার বিভিন্ন তলা যতটা সম্ভব ঘুরে দেখেছিলাম, দেখারই মতো, বিশেষ করে আমাজনের নানা কাঠের কাজ, শিল্পকর্ম দেওয়ালে দরজায় ছাদের সিলিংয়ে, তার মধ্যেই কোথাও কোথাও আবাসিকদের পরিচয় শুনে চমকে উঠতে হয়।

এখানে থেকে গেছেন মাইক্রোসফট সম্রাট বিল গেটস, আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার, জার্মানির প্রেসিডেন্ট রোমান হেরসগ, প্রাক্তন চ্যান্সেলার হেলমুট কোল, নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী গ্রো বুটলান্ড, ডেনমার্কের প্রিন্স ফেডেরিক— এইরকম রাজা-উজিররা। আর আমার মতো নিতান্ত সাধারণ প্রজারও এখানে ঠাঁই মেলে। এখানে একটা বাতানুকূল ঘরের এক রাতের ভাড়াও খুব বেশি নয়। তাছাড়া ১৮১টি সাধারণ ঘরও আছে, লাগোয়া বাথরুম ও বারান্দা সহ, তবে এ সি নেই, বৈদ্যুতিক পাখা, তার ভাড়া আরও কম।

যাঁরা আমাজনের জল-জঙ্গলে বেড়াতে যাবেন তাঁদের ওই হোটেলের থাকা-খাওয়া ঘোরাঘুরি সমেত দুই, তিন বা চার রাতের প্যাকেজ ট্যুরে যাওয়াই সবচেয়ে ভালো। মানাউস জেটি থেকে বোটে তুলে নিয়ে জল-জঙ্গল ঘুরিয়ে আবার জেটিতে নামিয়ে দেবে। আরও ভালো হয় চার-পাঁচ জন বা আট-দশ জন মিলে দু-তিনটে সাধারণ ঘর ভাড়া নিয়ে অন্তত দু-তিন সপ্তাহ ধরে কখনও হোটেল থেকেই একজন গাইড নিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে, কখনও দিশি ক্যানোয় চড়ে নদীতে নদীতে ঘুরে

প্রায়াগোরাঞ্জি দ্বীপের বালক দালিসু

বেড়ানো। কখনও দ্বীপে, কখনও গ্রামে, দিনের পর দিন এক রহস্যময় পৃথিবীতে বেড়িয়ে বেড়ানো।

আমাদের দেশে যাঁরা জল-জঙ্গল জলাভূমি বাঁচিয়ে পরিবেশসই পর্যটন প্রসারের কথা ভাবছেন তাঁদের আমাজনের আরিয়াউ আমাজন টাওয়ার্স হোটেল অবশ্যই দেখে আসা উচিত। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনে ভবিষ্যতের ভাসমান হোটেল, কাশ্মীরের ডাল লেকে হাউসবোট বা কেরালার কুইলন-কুমারাকোম খাঁড়িপথে রাইসবোটের জন্য আরিয়াউ আমাজন টাওয়ার্সের সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যোপযোগী পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা পুরোপুরি অনুকরণ করা উচিত।

প্রায়াগোরাঞ্জি দ্বীপে একটা ছোট ছেলের সঙ্গে আলাপ হল। ছেলেটা খুব লাজুক, অনেক ডাকাডাকির পর নদীর কিনারে এনে আমাকেই তার লজ্জা ভাঙাতে হল। ছেলেটা জলের পোকা। জল তোলপাড় করে একা একা সাঁতরে বেড়াচ্ছে। কখনও আমাজনের ডলফিনের মতো ডিগবাজি খাচ্ছে। আমার ডাকাডাকিতে সে হাঁটু জল অবধি এসে তীরের একটা গাছের সামান্য আড়াল নিয়ে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। বহু চেষ্টায় তার নাম জানলাম— দালিসু। ভাষার বাধায় তার মনের কথা, জীবনের কথা আমার জানা হল না। ধরা পড়া মাছ ছাড়া পেয়ে যেমন লাফ দিয়ে ফের জলে পড়ে, আমার কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে ছেলেটাও তেমনই লাফিয়ে পড়ে এক ডুবে অনেক দূরে গিয়ে ভেসে উঠেই তীরের দিকে আমাকে একবার দেখল।

দ্বীপে এক বৃদ্ধ মাচায় শুকোতে দেওয়া মাছ ঘরে তুলছে, যুবকরা গাছতলায় টিভিতে ফুটবল খেলা দেখছে, একেবারে সভ্য জগতের গ্রাম্যজীবন।

এরকম আরও কয়েকটি দ্বীপেও দরিদ্র ঘরসংসার ঘুরে দেখেছি। কিন্তু এরকমই একটা গ্রাম থেকে নদীপথে ক্যানোয় চড়ে হোটেলে ফেরার সময় আরণ্যক আমাজনের সাংঘাতিক পরিচয় পেলাম।

ক্যানোয় ব্রাজিলের দুজন সাংবাদিক ছিলেন, এটা নাকি তাঁদের প্রথম আমাজন ভ্রমণ। নৌকো চলছিল নদীর কিনার ঘেঁসে। বহুকালের প্রাচীন বড় বড় গাছের ঝুরি নদীর জল পর্যন্ত ঝুলছে, কোথাও কোথাও তীরে গাছের ডালপালা থেকে মাথা বাঁচাতে মাথা হাঁটুর কাছে নামিয়ে আনতে হচ্ছে।

হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দ ও প্রবল ঝাঁকুনি! নৌকো এক মুহূর্ত কাত হয়ে আবার সোজা হয়ে দুলছে। কী ব্যাপার? দুই সাংবাদিকের একজন চলন্ত নৌকো থেকে একটা ঝুলন্ত ঝুরি ধরে টান দিতেই অনেকটা মৌচাকের মতো দেখতে মস্তবড় একটা চাঁই গাছের উঁচু ডাল থেকে নৌকোর পাটাতনে আছড়ে পড়েছে। বিপদের এটা মাত্রই শুরু।

এক মিনিটের মধ্যেই দেখি হাজার হাজার ঢেউপিঁপড়ে ওই ভাঙা চাঁই থেকে বেরিয়ে নৌকো ছেয়ে ফেলেছে। আমরা উঠে নিমেষে মাঝের কাঠের ফালিগুলোর ওপর দাঁড়িয়ে জোরে জোরে পা ঠুকছি, একবার ডান পা একবার বাঁ পা। যাতে পা বেয়ে উঠতে থাকা পিঁপড়েগুলো আমাদের পা থেকে খসে পড়ে। যে কোনও সময় নদীতে পড়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা, তবু পিঁপড়ের কামড়ের ভয়ে এই মারাত্মক কুচকাওয়াজ থামানো অসম্ভব! আমাদের এই নিশ্ছিদ্র সতর্কতার সুফলও পেয়েছি— হাতে পায়ে সারা গায়ে মাত্র পনেরো-কুড়িটা ডুমো ডুমো দাগ আর পাল্লা দিয়ে চুলকোনি!

আমি পরে ওই সাংবাদিকটিকে বহুবার জিজ্ঞেস করেছি, আপনি ওরকম করলেন কেন? উনি শুধু হাসেন, অর্থাৎ নিছকই কৌতূহলে। এই ছোট্ট ঘটনাতেও বোঝা যায়, আমরা কেন ও কতদূর এই পৃথিবীতে বাসের অযোগ্য!

আমাজন থেকে চলে আসার আগের দিন আমাকেই আগ বাড়িয়ে বলতে হল, কালো জলের নিগ্রো নদী আর হলুদ জলের সোলিময়েস নদী যেখানে আমাজন নদীতে গিয়ে মিশেছে সেখানে আমরা কখন যাব?

পর্তুগিজ গাইড জানালেন, এবারের ভ্রমণসূচিতে এটা নেই।

আমাজনে এসে আমাজন নদীই দেখব না? তাই আবার হয় নাকি!

ঠিক হল, কাল খুব ভোরে বেরিয়ে আমাজন ছেড়ে যাবার আগে নিগ্রো আর সোলিময়েসের মিলনজল আমাজন নদীর সঙ্গে আমাদের দেখা হবে। আমাজনে পড়েও অনেক দূর অবধি দুই নদীর কেউই তাদের নিজস্ব রং ধুয়ে ফেলেনি।

বেরনারদিনোর অনুমতি নিয়ে তাঁর কন্যার সৌজন্যে 'আমাজন ইমোশানস' বই থেকে দুটি অংশ এখানে তুলে দিলাম:

আমাজনের নদী লালিত জীবন

৩,২০০ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বয়ে চলা নিগ্রো নদীর জল নিকষ কালো। জঙ্গলের সবুজের পাশাপাশি দারুণ দেখায় গরমকালে নদীর ধারে জেগে ওঠা সাদা বালুময় জায়গাগুলি। বাঁদিকের তট ধরে যে নদীগুলি আমাজনে এসে পড়ে তাদের উৎস আন্দিজ পর্বতমালায়। সেখান থেকে পাথরের ওপর দিয়ে বয়ে আসা নদীগুলি যখন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বইতে থাকে তখন সেই জলে নানা জৈব পদার্থ মিশে যায়। ফলে জলের রং কালো ও অ্যাসিডধর্মী হয়ে ওঠে।

যদিও ডানতটের অধিকাংশ নদীই আন্দিজ পর্বতমালা থেকেই আসছে, কিন্তু সেগুলি বাঁদিকের নদীগুলির থেকে অনেক বেশি লম্বা। ডানদিকের নদীগুলির কোনও নির্দিষ্ট খাত নেই। তাই তারা বালুময় সমতলের মধ্য দিয়ে এসে, পাড় ভেঙে, ছোট ছোট দ্বীপ তৈরি করে। আবার নিজেরাই সেই দ্বীপ ভেঙে গাছপালা, গ্রাম সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এমনকী বিখ্যাত আমাজন নদীরও নিজস্ব কোনও নদীখাত নেই। বছরে প্রায় ৮০০ মিলিয়ন টন নুড়ি, বালি, পলি ইত্যাদি বয়ে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রে মেশে। যার ফলে ফরাসি গায়ানা ও স্টেট অব আমাপার উপকূল অঞ্চলের জমির পরিমাণ বেড়ে চলেছে বলে উপগ্রহচিত্রের মাধ্যমে জানা গেছে। আমাজনের ডানতটের উপনদীগুলিই বেশি পরিমাণে মাটি, খনিজ ও জৈব পদার্থ বয়ে নিয়ে আসে। তাই তাদের জলের রং হালকা খয়েরি এবং হোয়াইট ওয়াটার নদী হিসেবে পরিচিত।

যদিও কালো রঙের নদীগুলিতে অক্সিজেনের পরিমাণ কম ও জীব বৈচিত্র্যের অভাব, বরং অ্যাসিডের পরিমাণ বেশি কিন্তু

ঝাঁকড়া মাথার ইপে গাছ যখন হলুদ ফুলে ভরে যায়, মনে হয় সবুজ জঙ্গলের মাথায় কে যেন হলুদ রং ঢেলে দিয়েছে। স্থানীয় অধিবাসীরা এই গাছের ডাল থেকে ধনুক বানায় বলে, তার নাম ধনুক গাছও বটে।

সেখানে এমন কিছু পদার্থ আছে যার জন্য এই জলে মশা জন্মায় না। কিন্তু হোয়াইট ওয়াটার বলে চিহ্নিত নদীগুলিতে মশার প্রাদুর্ভাব রয়েছে। এই নদীগুলিতে প্রাণধারণের জন্য খাদ্য পাওয়া যায় বলে মাছ ও অন্যান্য ছোট প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে, সেইসঙ্গে মশাও। এই নদীগুলির জল পান করার অযোগ্য। শুধু নদীর ধারে বসবাসকারী রিবেরিনস উপজাতির লোকেরা বিশেষ কায়দায় প্রচণ্ড স্রোতের অংশ থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করতে পারে এবং তাদের এই জল সহ্য হয়ে গেছে বলে কোনও অসুবিধা হয় না।

প্রায় ১,১০০টি শাখানদী এসে আমাজনে পড়ে। তাছাড়াও অনেক ছোট ছোট নদীও আছে। আমাজন বেসিন অঞ্চল থেকে একমাত্র আমাজন নদীই গিয়ে সমুদ্রে পড়ে।

আমাজন নদী নিজেই এক সমৃদ্ধ মহাদেশ। ৭,২০০ কিলোমিটার লম্বা ও দুই থেকে ত্রিশ কিলোমিটার চওড়া এই নদী। নদীতট ও উঁচু জমির মাঝামাঝি অংশগুলি বেশ সমৃদ্ধ, নদীতে প্রচুর মাছও পাওয়া যায়। আমাজন সম্বন্ধীয় বইপত্র থেকে প্রায় ১,৫০০ ধরনের মাছের কথা জানা যায় এবং মনে করা হয় যে আরও বহু প্রজাতি অজানা রয়ে গেছে।

রিবেরিনস উপজাতি ছাড়াও বহুসংখ্যক লোক এই নদীর পাড়ে বসতি স্থাপন করেছে। গ্রাম, শহর তৈরি হয়েছে অগুনতি। যদিও এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের পানীয় জলের জন্য বহুদূর অবধি যেতে হয়, তবুও খাদ্যবস্তুর প্রাচুর্যের জন্য তারা এখানে থাকতেই পছন্দ করে।

তাই আমাজনের সম্পূর্ণ চিত্রটি নিয়ে কথা বলতে গেলে লিয়াদ্রো তোকানতিসের ভাষায় 'নদীই জীবনধারণের নিয়ামক' কথাটি বলতে ইচ্ছে করে।

প্রতি বছর বন্যার সময়ে নদীর ধারগুলি অন্তত ১০০ কিলোমিটার চওড়া হয়ে যায়। প্রায় প্রতিদিনই তিন থেকে পাঁচ সেন্টিমিটার করে জল বাড়তে থাকে। যার ফলে গরমের সময় জলের মাপ যা থাকে বন্যার সময়ে তার থেকে প্রায় কুড়ি মিটার উঁচু হয়ে যায়। এই সময়ে রিবেরিনসদের গবাদি পশু নিয়ে উঁচু জমিতে রেখে আসতে হয়। বন্যার শেষে তারা আবার নিজেদের জায়গায় ফিরে আসে। তারা জানে যে এখন তাদের বাসভূমি আরও চাষযোগ্য ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

লিয়াদ্রো তোকানতিস তাঁর 'রিও কমানডা আর ভিডা' বইটিতে কাবোক্লোস উপজাতির নদী-প্রীতির কথা উল্লেখ করেছেন। এই উপজাতির জীবনে লোককথা, উপকথা, ধর্মীয় চিন্তাভাবনা বেশ গুরুত্বপূর্ণ হলেও তারা কিন্তু নিঃসন্দেহে খুব সাহসী। তারা প্রকৃতির সঙ্গে এমন একাত্ম হয়ে গিয়েছে যে শহরে গিয়ে বাস করার কথা ভাবতেই পারে না। তারা কখনও বলবে না যে আমি অমুক শহরে জন্মেছি। তারা বলবে আমি অমুক নদীর ওপর জন্মেছি— হয়তো বলবে আমি জুরুয়া নদীর ওপরে জন্মেছি। আমাজনের ডানদিকের উপনদী জুরুয়া।

আমাজনের জীবজগৎ

আমাজনের গাছপালা জন্তু-জানোয়ার সবেরই কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য আছে।

ঝাঁকড়া মাথার ইপে গাছ যখন হলুদ ফুলে ভরে যায়, মনে হয় সবুজ জঙ্গলের মাথায় কে যেন হলুদ রং ঢেলে দিয়েছে। স্থানীয় অধিবাসীরা এই গাছের ডাল থেকে ধনুক বানায় বলে, তার নাম ধনুক গাছও বটে।

আকাই গাছটি আসলে তাল গাছেরই একটি প্রজাতি। স্যাঁতসেঁতে মাটিতে জন্মায়। সারা বছর এই গাছে উজ্জ্বল খয়েরি রঙের ফল হয়, যার থেকে স্থানীয় লোকেরা রস বের করে। বালাতেইরো গাছ শুকনো জমিতে হয়। এই গাছের কাঠ নানা কাজে ব্যবহার হয়। আরা গাছের আঠা থেকে তৈরি হয় চুয়িং গাম।

কাকাউ গাছের ফলের বীজ থেকে ভালো জাতের চকোলেট তৈরি হয়। কুপুয়াকু গাছের ফল অত মূল্যবান না হলেও, সেখান থেকে পাওয়া বীজ থেকেও হালকা রঙের চকোলেট তৈরি হয়।

ভারতে উৎস হলেও, আমাজনের জঙ্গলেও পাওয়া যায় পাট। স্থানীয় নাম জুটা। উরুকু গাছের ফল থেকে লাল রং তৈরি করা হয়। স্থানীয় ইন্ডিয়ান আদিবাসীরা যুদ্ধের সময়ে বা উৎসবের দিনে গায়ে এই লাল রং দিয়ে নকশা আঁকেন।

বিশাল আকারের জলজ লিলি ভিক্টোরিয়া আমাজনিকা পাতার ব্যাস প্রায় দুমিটার।

ফুলগুলি রাতে ফোটে ও ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গুটিয়ে যায়।

শুধু অর্কিডই আছে বহু ধরনের। স্কিউটিকারিয়া স্টিলি অর্কিডের পাতাগুলি লম্বা, চাবুকের মতো দেখতে। উজ্জ্বল বেগুনি রঙের ফুলের জন্য কাটলেয়া ভায়োলাসি অর্কিডটি সবার প্রিয়। অনেকেই জঙ্গল থেকে ফুলটি তুলে আনেন কিন্তু বাঁচাতে পারেন না। জঙ্গলের কোনও কোনও অংশে এত বেশি ফুল তোলা হয়েছে যে অর্কিডটি রীতিমতো বিরল হয়ে যাচ্ছে।

জঙ্গলে চলতে চলতে নজরে পড়বে গুয়ারানা লতা। লতাটি চিনতে না পারলেও, বীজসমেত ফলটি চিনতে ভুল হবে না। উজ্জ্বল লাল রঙের ফলের মধ্যে সাদা-কালো বীজ, হঠাৎ দেখলে মনে হবে ফলের মধ্যে একজোড়া চোখ।

আন্দিরা ও মাউয়েস নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে এক বিশেষ সম্প্রদায়ের আদিবাসীরা থাকে। তারা এই লতার চাষ করে। শিমের মতো দেখতে ফলের বীজ থেকে ক্যাফেইন-জাতীয় উত্তেজক পদার্থ তৈরি হয়। বীজগুলি পুড়িয়ে, গুঁড়ো করে, জল দিয়ে মেখে কেকের আকারে রেখে দেওয়া হয়। ওই কেকের অংশ পিরারুক মাছের রুক্ষ জিভ দিয়ে গ্রেট করে আবার জলে মিশিয়ে বিশেষ একটি পানীয় তৈরি করা হয়। কাজের ক্ষেত্রে রাত জাগার জন্য ওই পানীয় খুব জরুরি হয়ে পড়ে। গায়ের জোর বাড়ানো থেকে শুরু করে পেট ব্যথা সারানোর মতো নানা কাজে ওই কেক ব্যবহার করা হয়।

ওই আদিবাসীদের উপকথায় চোখ সদৃশ বীজ সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। মাতৃ-পিতৃহীন তিন ভাইবোন থাকত একটি গ্রামে। ভাইয়েরা বোনের রোজগারের ওপর নির্ভরশীল ছিল বলে তারা বোনের পাঁচ বছরের শিশুটিকে হত্যা করে। তারা বাচ্চার শরীর পুড়িয়ে ফেলার আগে তার মা চোখদুটি তুলে এনে একটি গাছের ফলের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। মায়ের প্রার্থনা অনুযায়ী আদিবাসী দেবতা টুপা, চোখদুটিকে ওই ফলের বীজ হিসেবে অমরত্ব দেয়।

আমাজনের জঙ্গলে পাবেন জাগুয়ার। গাছে চড়তে পারে, সাঁতরে নদীও পার হতে পারে। জঙ্গলের আর কোনও জন্তু তার সঙ্গে লাফিয়ে বা দৌড়ে এঁটে উঠতে পারে না। শিকারি হিসেবেও দক্ষ। সাধারণত সন্ধ্যার মুখে জাগুয়ার শিকারে বেরোয়। শিকার ধরে, সেটাকে টেনে আনে আড়ালে। অর্ধভুক্ত অংশ ঢাকা দিয়ে রাখে পরের বারের জন্য। চট করে জাগুয়ারের দেখা মেলা ভার। তবে তাদের শরীরের সঙ্গে গাছের পাতার ঘর্ষণের খসখসানি আওয়াজ অনেক সময়ে জাগুয়ারের উপস্থিতি টের পাইয়ে দেয়।

বন কেটে নাকি ওখানে চাষাবাদ হবে। এর আগেও আমাজনের ১,৬০,০০০ বর্গ কিলোমিটার জঙ্গল কেটে এই চেষ্টা হয়েছে, কোনও ফল হয়নি। এভাবে ব্রাজিলীয় রেইন ফরেস্টের অর্ধেক সাফ করে দিলে ওখানে বিশাল মরুভূমি জেগে উঠবে।

আমাজনের জঙ্গলে পাওয়া যায় রেড হাউলার মাংকি। লাল রঙের এই বাঁদরগুলি সকালে ও সন্ধেয়, এমনকী আবহাওয়ার পরিবর্তন হলেও, গাছের মগডালে উঠে দলবদ্ধভাবে চেঁচাতে থাকে। জঙ্গলের ফল-পাকুড় ছাড়াও তারা হানা দেয় খেত-খামারে। মজার ব্যাপার হল, দলের বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ বাঁদরটিকে রাখা হয় পাহারাদারের ভূমিকায়। কোনওরকম বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই তার কাজ বাকিদের সাবধান করা। স্থানীয় বাসিন্দারা অনেকেই দেখেছেন যে পাহারার কাজে গাফিলতি হলে, দলের বাকি সদস্যরা ওই পাহারাদারকে শাস্তি দিয়ে থাকে।

আমাজনের জঙ্গলে বাঁদর প্রজাতির মধ্যে রয়েছে কালো মাথা উয়াকারি, উলি মাংকি, টাকমাথা ও লালমুখো উয়াকারি ইত্যাদি।

গত মাসে 'লোনলি প্ল্যানেট ট্র্যাভেল গাইড'-এর লেখিকা ফিলিপা স্যাক্সটনের ই-মেল পেলাম: তুমি ব্রাজিল থেকে সদ্য ফিরেছ, ব্রাজিল-আমাজনের অরণ্য ধ্বংসের খবরে তুমি নিশ্চয়ই ব্যথা পাবে আর তার বিরুদ্ধে কিছু করতেও তোমার আন্তরিক ইচ্ছা হবে। ব্রাজিল কংগ্রেস ব্রাজিল-আমাজনের রেইন ফরেস্টের অর্ধেকটাই কেটে ফেলার একটা প্রকল্প হাতে নিচ্ছে। চিরহরিৎ এই অরণ্য বহুজাতিক সংস্থাগুলো ঘর-দরজা, আসবাবপত্র তৈরির কাঠ হিসেবে আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি করবে। অর্ধেক অরণ্য মানে পর্তুগালের চার গুণেরও বেশি এলাকা। বন কেটে নাকি ওখানে চাষাবাদ হবে। আসল সত্য এই যে, আমাজন অরণ্যে অরণ্যই হচ্ছে ভূমির প্রাণ, সেই অরণ্যই যদি না থাকে তাহলে ওই ভূমিও নিষ্ফলা হয়ে যায়। এর আগেও আমাজনের ১,৬০,০০০ বর্গ কিলোমিটার জঙ্গল কেটে এই চেষ্টা হয়েছে, কোনও ফল হয়নি। এভাবে ব্রাজিলীয় রেইন ফরেস্টের অর্ধেক সাফ করে দিলে ওখানে বিশাল মরুভূমি জেগে উঠবে।

আমি ওই মহা অরণ্যের কিনার মাত্র ছুঁয়ে এসেছি, অরণ্যের অভ্যন্তরে দূর গভীরে যাবার জন্য আমার মন কাঁদে, তার ওপর এই দুঃসংবাদ!

মানুষের হাতে মানুষের ভবিষ্যতের এত বড় সর্বনাশ কে মানবে!

ছবি: লেখক

প্রথম প্রকাশ 'ভ্রমণ' অক্টোবর ২০০০

ধা রা বা হি ক

ল ঘু ভা ষ - গু রু ভা ব

মৃত্যু : জীবনের প্রথম পাঠ

পবিত্র সরকার

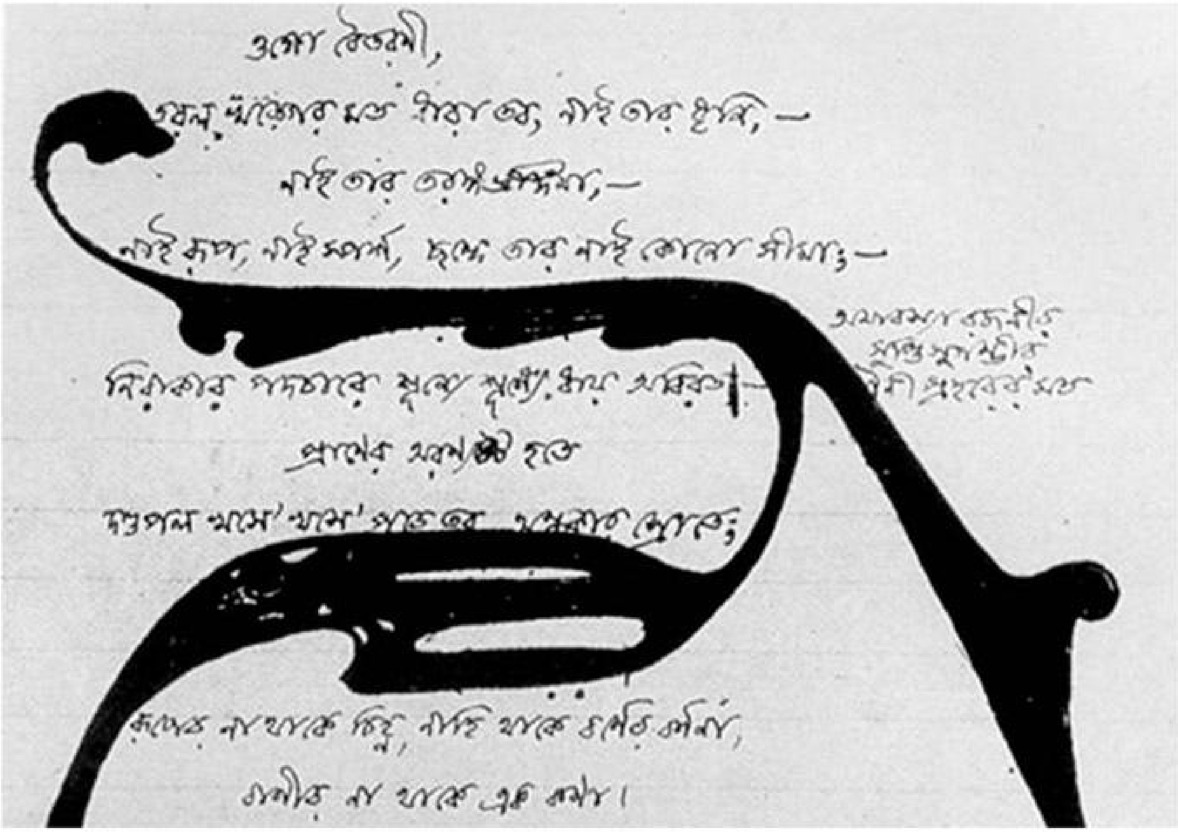

> জীবনের গভীর দর্শনের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর ওই অনিবার্য বাস্তবকে বোঝবার চেষ্টা করেছেন, এবং বুঝেছেন যে জীবনের এই পূর্ণাঙ্গ ছেদকে মানুষ কোনওদিনই চরম ও অবিকল্প বলে মেনে নেয়নি...

পর্ব : ৪

অমরত্বের কল্পিত বাসনা: মানুষের শিল্প

মৃত্যুর কাছে হার না মানবার আরেকটা জব্বর উপায় মানুষ বার করেছে, সে হল তার শিল্প। তার সঙ্গে পরলোকের কোনও সম্পর্ক নেই। তার সৃষ্টি ও স্থিতি ইহলোকে, কিন্তু শিল্প মানুষকে একধরণের অমরত্ব দেয়। সব মানুষ সে সম্বন্ধে সচেতন নয় নিশ্চয়, যে ছবি আঁকছে, মূর্তি গড়ছে, কবিতা লিখছে, সুর তৈরি করছে, সে সেই মুহূর্তে যে ভাবছে এগুলি আমার মৃত্যুনদী পার হওয়ার নৌকো, তা একেবারেই নয়। শিল্পের তাগিদ মানুষের মনে অনেকরকম চেহারা নিয়ে এসেছে, যুগে যুগে তার ধরণও পাল্টেছে।

পণ্ডিতেরা বলেন, প্রথম যেসব মানুষ ছবি এঁকেছিল, তার মধ্যে তারা একটা মন্ত্রবিশ্বাস বা ম্যাজিক ভরে দিতে চেয়েছিল, শুধু সৌন্দর্যসৃষ্টি তার মূল প্রেরণা ছিল না। এটা অনেকেই বলেছেন, পশুর ছবি আঁকলে তার মৃত্যুর পরোয়ানা লেখা হয়ে গেল, আদিম মানুষ এরকম ভাবতেই পারে, কারণ তখন তার

শান্তিনিকেতনের রোজকার হাজার হাজার পর্যটকের কতজন ও মূর্তিগুচ্ছকে রামকিংকরের সৃষ্টি বলে দেখে। তারা দেখে মুগ্ধ হলেও তাদের কাছে রামকিংকর ওই কাজের স্রষ্টা হিসেবে বেঁচে নেই।

সঙ্গের ছবিতে রামকিংকর বেইজের ভাস্কর্য 'সাঁওতাল দম্পতি'

কুসংস্কার একটা খুব বড় সম্বল। কিন্তু সেটাই সব নয়। যেমন স্পেনের আলতামিরা গুহায় আদিম মানুষের আঁকা বাইসন ও অন্যান্য জীবজন্তুর ছবি। এসম্বন্ধে ব্রনিস্লাভ্স্কি একটা ভারী সুন্দর কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে এ-ছবি বাইসনকে দেখে তার অনুকরণ করে নিজের খুশির জন্য আঁকা নয়, এ ছবিতে আছে একটা anticipation বা প্রত্যাশা। তা হল, এরকম একটা বাইসন দেখলেই আমরা শিকার করব। এ-ছবি আদিম মানুষকে এ-শিক্ষাও দিচ্ছে যে, শিকারে গেলে বাইসন তোমার দিকে এইভাবে ধেয়ে আসতে পারে, কাজেই তুমি কোথায় দাঁড়াও, কী করো খেয়াল রেখো। ওই দ্যাখো হরিণ দৌড়চ্ছে, ওই দ্যাখো শুয়োর হঠাৎ পাশ ফিরল। তুমি একা মানুষ এইসব বিপদের মধ্যে একা দাঁড়িয়ে। কী করবে সত্বর ভেবে নাও, প্রস্তুত থাকো। শিল্পী নাকি একা আদিম মানুষকে এইরকম একটা ভয়ের মুহূর্তের মধ্যে হঠাৎ দাঁড় করিয়ে দিতে চেয়েছেন, বলছেন ভেবে নাও মানুষ, এ-অবস্থায় তুমি কী করবে। অর্থাৎ শুধু ম্যাজিক নয়, এ-ছবি শিক্ষারও পাঠ। শুধু অতীতের নথি নয় তা, ভবিষ্যতেরও নিশানা।

আবার অনেকে বলেছেন, যে জানোয়ারটাকে শিকার করা হবে, তার ছবিটা আর কিছুই না, একটা 'প্রযুক্তি' মাত্র। ছবিটা আঁকলাম, ব্যস, জানোয়ারটা মরে গেল। লেভি ব্রুল বলে এক নৃবিজ্ঞানীর কাছে এক 'সু' (Sioux) সম্প্রদায়ের আদিবাসী আমেরিকান (তথাকথিত রেড ইন্ডিয়ান) এই বলে অভিযোগ করেছিল: 'আরে মশাই, আপনাদের এক গবেষক তার খাতায় আমাদের এখানকার বাইসনগুলোর ছবি আঁকছিল গাদা গাদা। তারপর থেকে আমাদের তল্লাটে আর একটাও বাইসন দেখতে পাই না!' ফলে প্রত্ন-প্রস্তর যুগে অনেক পাহাড়ে বা গুহায় পশুদের এমন ছবিও দেখা যায় যে সেগুলিতে তির বা বর্শা বেঁধা রয়েছে। ফলে, পণ্ডিতদের মতে, এ-ছবিগুলি একইসঙ্গে আদিম মানুষের ইচ্ছা আর ইচ্ছাপূরণকে প্রকাশ করছে। এগুলি সৃষ্টি করেছিল যারা তারা কোনও অমরত্বের স্বপ্ন দেখেনি। এই ছবি এঁকে আমি মৃত্যুকে কাঁচকলা দেখাব, প্রজন্মের পর প্রজন্ম আমাকে স্মরণ করবে, এমন ভাবেইনি।

ভাবলেও লাভ হত না। ছবিটি কোন ব্যক্তির সৃষ্টি, তা পরের লোকেরা কী করে জানবে? তখন লেখা আবিষ্কৃত হয়নি যে ছবিতে শিল্পী সই করে দেবে, সেই সই দেখে পরের বা অন্য জায়গার লোক বলবে, বাঃ, অমুকের পুত্র তমুক তো বেশ ছবিটা এঁকেছে! হয়তো সে-ছবিতে ব্যক্তির শৈলী লেগে থাকত কিছু, কিন্তু তখন তো শৈলী দেখে ছবির শিল্পীকে চেনার দক্ষতাও তৈরি হয়নি মানুষের।

অথচ এখন আমরা যেভাবে শিল্পকে দেখি তা ডিউইয়ের বইয়ের শিরোনাম থেকে ধরতে পারি: 'আর্ট' হল 'এক্সপিরিয়েন্স', শিল্প একটি অভিজ্ঞতা, তা দেখামাত্র, বা শোনামাত্র, আমার চৈতন্যে তা একটি ধাক্কা তৈরি করে, আমাকে দুলিয়ে দেয়।

আমি ছবির কথা আগে বলেছি, হয়তো কাজটা আমার উচিত হয়নি। ছবি এঁকে শিল্পী অমর হয়ে যায়, বা মূর্তি তৈরি করে, বা বিশাল স্থাপত্য নির্মাণ করে, এসব আমাদের সংগত অনুমান। আর নিশ্চয় অনেকে বলেনও যে আমার ছবিই আমাকে অমর করে রাখবে। এ-ব্যাপারে শিল্পীদের জীবনী ঘাঁটলে আমরা নিশ্চয় এরকম কথা দেখতে পাব। দেখবও আমরা সেসব কথা।

ভালো কথা, শিল্পী যে শিল্পীর মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই, এটা তো আমরা সবাই জানি। কিন্তু ও হেনরি নামে আমেরিকান লেখকের এক গল্পে এই কথাটা আরেকভাবে কি সুন্দরভাবে অন্য

অর্থে ফুটে উঠেছিল, তা হয়তো অনেকের পড়া নেই। সে গল্পটার নাম 'দ্য লাস্ট লিফ'। গল্পটা সংক্ষেপে বলতে লোভ হচ্ছে। গল্পটা বলব, কিন্তু আমাদের মতো করে, ও হেনরি যেমনভাবে বলেছেন সেভাবে নয়। আমার ছেলেবেলার পড়া থেকে গল্পটাকে ভুলতে ভুলতে তার মধ্যে নিজের কল্পনার মালমশলা ঢোকাতে ঢোকাতে এখন আমার মাথায় গল্পটা যেভাবে দাঁড়িয়ে আছে সেইভাবে বলব। পাঠকরা আসল গল্পটা পড়তে হলে ও হেনরি দেখুন।

শহরে নিউমোনিয়ার আক্রমণ ঘটেছে। দুটি মেয়ে, দুই বান্ধবী। দুজনেই শিল্পী, মোটামুটি দুঃস্থ শিল্পীই বলা যায় তাদের— ছবিটবি তেমন বিক্রি হয় না, খাবারদাবারও জোটে না তেমন। তারা সু আর জন্‌সি বা জোয়ানা, দুজনেই দোতলার একটা বাসায় থাকে। তাদের মধ্যে জন্‌সিকে নিউমোনিয়ায় ধরেছে। দোতলার জানলার ধারে তার শয্যায় শুয়ে সে ভাবছে সে আর বাঁচবে না। ডাক্তার এসে দেখে বলছেন জন্‌সি বাঁচার ইচ্ছেই হারিয়ে ফেলেছে। জানলার বাইরে একটা ছোট পরিসর, তারপরে আরেকটা বাড়ির বড় দেয়াল। সেই দেয়াল বেয়ে উঠেছিল একটা আইভিলতার গাছ। হেমন্তের শেষে তার পাতা ঝরে যাচ্ছে, আর সে ভাবছে, এইভাবে যখন গাছটার সব পাতা ঝরে যাবে তখন তারও আয়ু শেষ হবে। সু-কে বলছে একথা। 'বারো, এগারো, দশ, নয়, আট, সাত' করে সে গুনছে কটা পাতা থাকছে। সবাই বলছে, 'পাগল! এমন কখনও হয় নাকি?' মেয়েটি জেদ ধরে বলছে, 'হয়, দেখবে আমার বেলা ঠিক তাই হবে। পাতাগুলো ঝরে যাবে, আর আমিও শেষ হয়ে যাব!'

আমরা সবাই জানি এ-তার অসুস্থ কল্পনা, এর সঙ্গে প্রকৃতির কার্যকারণের কোনও যোগ নেই। কিন্তু তাকে সেকথা বোঝাবে কে? সে সবাইকে বলছে একথা, 'দেখো, ঠিক আমি যা বলছি তাই হবে। শেষ পাতাটা যেদিন খসে যাবে, আমিও সেদিন চলে যাব।'

আমরা আগে আদিবাসী আমেরিকানদের নানা সংস্কারের কথা বলেছি। তারা অনেকে বিশ্বাস করত, প্রতিটি মানুষের একটা বিকল্প আত্মা কোনও গাছ বা প্রাণীর মধ্যে জন্ম নেয়। এই মেয়েটি তার কথা জানত কিনা সেকথা ও হেনরি আমাদের জানাননি। আমাদের ধারণা, সে জানত না। এ-নিশ্চয় তার নিজস্ব কল্পনা।

কিন্তু এ-কল্পনার জোর কত দেখুন। যে তাকে যতই বোঝাক, সু কাতর ছলছল চোখে তার সঙ্গে যতই কথা বলবার চেষ্টা করুক, সে কিন্তু ওই বিশ্বাস প্রাণপণে ধরে বসে আছে, এবং তার ফলে সে দিন দিন আরও অসুস্থ হয়ে পড়ছে। কিন্তু ডাক্তার বা সু তাকে কিছুতেই বোঝাতে পারছে না যে, এরকম হয় না কোথাও। গাছের পাতার ঝরে যাওয়ার সঙ্গে মানুষের মৃত্যুর কোনও সম্পর্ক নেই। প্রত্যেকের বাঁচা-মরার হিসেব আলাদা।

একদিন এমন অবস্থা দাঁড়াল যে, একটিমাত্র সরু ডালে একটিমাত্র পাতা লেগে রইল। তাতেও হলুদ মৃত্যুর রং লাগল বলে। মেয়েটি সু-কে বলল, 'আর একদিন কী দুদিন। পাতাটা ঝরবে, আমিও মরে যাব।' মেয়েটির মুখেও লেগেছে মৃত্যুর রং, সে যা বলছে তা হয়তো সত্যিই হবে শেষ পর্যন্ত।

এখন হয়েছে কী, ওই বাড়িতেই একতলায় থাকত এক পাগলাটে শিল্পী। বেরমান। সে জার্মানি থেকে চলে এসেছে আমেরিকায়, মুখের কথায় এখনও জার্মান টান আছে। বদমেজাজি, সবসময় জিন-এর ওপর থাকে। ছবিটবি এঁকে তার যে খুব জুত হত তা নয়, তার গরিবের দশা ঘুচত না। তার স্বপ্ন সে কোনওদিন একটা মহাছবি বা মাস্টারপিস আঁকবে, তারপর তার আর কোনও দুঃখ থাকবে না। সু বেচারা অসহায় হয়ে তার কাছে গিয়ে বলল কথাটা। সে তো জন্‌সির এই ন্যাকামিতে ভয়ঙ্কর চটে গেল। এ-শুধু মেয়েদের পক্ষেই সম্ভব! কী উদ্ভট কাণ্ড! শেষ পাতাটা ঝরবে আর মেয়েটাও মরবে, এ-কখনও হয় নাকি! যত সব পাগলের কথাবার্তা।

মনে হল সেই রাত এল, যে রাত্রেই পাতাটা ঝরে যাবে বলে সবাই ভয় করছে। মেয়েটিরও জীবন যেন ক্ষীণ হয়ে এসেছে, প্রদীপের আলোর নিবু-নিবু শিখার মতো। মেয়েটি পড়ে আছে আচ্ছন্নের মতো, সে জেগে আছে কি ঘুমোচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না। সু-র চোখে ঘুম নেই, অন্ধকার শেষ হলে তাদের জীবনে আর আলো ফুটবে না। বাইরে শীতের হাওয়া, বৃষ্টি আর বরফপাত সেই অন্ধকারের মধ্যেই যেন কোনও এক হিংস্রতায় জানলার বন্ধ কাচে এসে ধাক্কা দিচ্ছে। সু জানলার পর্দা টেনে নামিয়ে দিল।

জন্‌সি সারারাত ঘুমোয়নি, ভোরের দিকে ঘণ্টাখানেক তার তন্দ্রামতন এসেছিল। ভোর হল, সূর্যের আলো ফুটল আকাশে, সু-কে বলল জানলা খুলে দাও। জানলা খুললে দুজনেই অবাক হয়ে দেখল, আইভির শেষ পাতাটা ঝরে যায়নি। বরং তা ডালকে আঁকড়ে যেন স্থির হয়ে আছে। যেন সে কিছুতেই ঝরবে না বলে পণ করে আছে।

একদিন গেল, দুদিন গেল, পাতাটা ঝরল না। মেয়েটি নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'সু, আমি খুব বিচ্ছিরি কাজ করেছি। মরার কথা ভাবা পাপ, তাই আমি ভেবেছি। সু, আমার খুব খিদে পেয়েছে। দে সুরুয়া-টুরুয়া কী খেতে দিবি।'

সু জানত যে আসল পাতাটা কখন ঝরে গেছে, যা গাছে রয়েছে সেটা ওই বেরমানের আঁকা একটা পাতার ছবি মাত্র। ওপাশের বাড়ির দেয়ালে এমনভাবে আঁকা যে মনে হয় তা ডালের গায়েই ঝুলে রয়েছে। ওটাই বেরমানের আঁকা সেই মাস্টারপিস, মহাছবি।

পরে খবর পাওয়া গেল সে বৃদ্ধ নিউমোনিয়ায় মারা গিয়েছে হাসপাতালে। সারা রাত প্রবল শীতে বরফঝড়বৃষ্টির মধ্যে মই লাগিয়ে সে পাতাটা এঁকেছে, অসুস্থ শরীর সেই ধকল আর সহ্য করতে পারেনি।

মেয়েটি কিন্তু ফিরে এসেছে জীবনে।

এই গল্পে শিল্পী মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করেছিল একভাবে। নিজের মৃত্যুর সঙ্গে নয়, নিজের অমরত্বের কথা সে ভাবেইনি। সে ওই মেয়েটিকে মৃত্যুর হাত থেকে (বা মারাত্মক মৃত্যুবাসনার হাত থেকে) ছিনিয়ে আনবার চেষ্টা করেছিল, আর সে সফল হয়েছিল।

কিন্তু চিত্রশিল্পী, ভাস্কর, স্থপতি, সংগীতকার প্রভৃতির অমরত্বের চেহারাটা কীরকম? শিল্প জীবনের চেয়ে অনেক বেশিদিন টেকে, এটা ঠিক। সব শিল্প নয়, তার কোনও-কোনও নমুনা, যা সত্যকার শিল্প হয়ে ওঠে। সেরকম কতজন শিল্পীকে আমরা মনে রেখেছি? তার সংখ্যা অবশ্যই কম নয়।

এইসব শিল্পী অনেক সময় তাঁদের নাম সই করেন ছবিতে, ভাস্কর্যে স্থাপত্যে তা করার নিয়ম নেই। ফলে প্রখ্যাত চিত্রকরেরা হয়তো নামে অমরত্ব পান, কিন্তু তাঁদের কথা শিল্পের ইতিহাসে লেখা হয়, কিন্তু ইতিহাসে থাকলেও আমরা যখন কোনও মূর্তি দেখি বা, ধরা যাক রামকিংকরের সাঁওতাল দম্পতির ভাস্কর্য, কজন মানুষ সে ইতিহাস জানে তা দেখি? লেখাপড়া জানা লোকেরা জানে ওটা রামকিংকরের কাজ, কিন্তু শান্তিনিকেতনের রোজকার হাজার হাজার পর্যটকের কতজন ও মূর্তিগুচ্ছকে রামকিংকরের সৃষ্টি বলে দেখে? তারা দেখে মুগ্ধ হলেও তাদের কাছে রামকিংকর ওই কাজের স্রষ্টা হিসেবে বেঁচে নেই। আর পিরামিড, অ্যাক্রোপোলিস বা তাজমহলের স্থপতি বা স্থপতিদের কথা কে জানে? তাদের নাম ইতিহাস থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। তার বদলে বেঁচে আছে যাদের নাম তারা সেগুলি সৃষ্টি করেনি, প্রাথমিক নকশাও করেনি। সম্রাট রামেসিস বা তুতেনখামেন, কিংবা শাজাহান, যারা হয়তো একটা ধোঁয়াটে ধারণা দিয়েছিলেন মাত্র আসল স্থপতিকে, একটা অসম্পূর্ণ স্বপ্ন, আর অঢেল টাকা। আসল শিল্পীদের কৃতিত্ব আর অমরত্ব তাঁরাই গ্রাস করে নিয়েছিল। শিল্পীদের নাম লোকে ভুলে গেল, বেঁচে রইল তাদের স্পনসরদের নাম। অমরত্বের নামে এই পরিহাস ইতিহাসে প্রচুর দেখা যায়। অনেক সময় টাকাও জুটত কিনা সন্দেহ, চাবুকের নীচে শিল্পীদের কাজ করতে হত, ক্রীতদাসরা তো ছিলই মজুর খাটার জন্য।

বন্ধুকে চিঠিতে 'মেঘনাদবধ কাব্য' সম্বন্ধে লিখছেন, Will not this make me immortal? নিজের সমাধিতে মধুসূদন কী ব্যাকুল প্রার্থনা করেছেন পথিকের কাছে, 'মহীর কোলে মহানিদ্রাবৃত দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদনের' সমাধিস্থলে একটু দাঁড়িয়ে যাওয়ার জন্য।

তেমনই যাঁরা সংগীতের ইতিহাস বা সমালোচনা পড়ি তারা জানি বাখ্ বেটোফেন মোৎসার্টের কথা। তাদের সৃষ্টি যখন উপভোগ করি তখন আমরা শিল্পীর নামটাকেও মনে রাখি। কিন্তু কতজন জানি, কতজন মনে রাখি? তাঁরা আমাদের চিরদিনের আনন্দের ডালি তৈরি করে দিয়ে গিয়েছেন, কিন্তু বহুক্ষেত্রেই তাঁদের শিল্প তাঁদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেঁচে থাকে, বেশিরভাগ মানুষের স্মৃতির মধ্যে তাঁদের নামের প্রবেশই ঘটে না।

নাট্যশিল্পী অর্থাৎ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের, এবং সেইসঙ্গে নৃত্যশিল্পীদের, দুর্দশা আরও করুণ, অন্তত কিছুদিন আগে পর্যন্ত তাই ছিল। চলচ্চিত্র আবিষ্কার হওয়ার আগে পর্যন্ত, যখন তাদের অভিনয়শিল্প বা নৃত্যশিল্পের কোনও নিদর্শন ধরে রাখার কোনও উপায় ছিল না। একই দুর্ভাগ্য বাগ্মী, জাদুকর আর সার্কাসের কৌশলীদের, যাদের কাজ মূলত অভিকরণ, অর্থাৎ 'পারফরম্যানস'। তাঁদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের শিল্পও গেল লুপ্ত হয়ে, অমৃতলাল বসুর কথায়, 'দেহপট সনে নট সকলি হারায়।' পরে অবশ্য চলচ্চিত্র-প্রযুক্তির, ভিডিও-প্রযুক্তির উদ্ভব হওয়ায় তাঁদের কাজের নমুনা আমরা দেখতে পাই, কিন্তু সেও কোনও জীবন্ত অভিকরণের নয়। তার অভিজ্ঞতাই আলাদা। এইভাবে কত অভিকারের কাজ ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। তাঁদের অমরত্ব শুধু আছে নামে, ইতিহাসের পাতায়। তখনকার দিনের দর্শক-সমালোচকদের লেখায়। বাগ্মীদের অসামান্য সব বক্তৃতা হয়তো লিখিত অবস্থায় কিছু আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে, যেমন ইংল্যান্ডের বার্ক, আমেরিকার অ্যাব্রাহাম লিঙ্কনের, কিন্তু বক্তৃতা, নাটক, নৃত্য— এগুলি হল জীবন্ত অভিকরণ, তা শুধু ছবি বা লেখা নয়, তার ধ্বনি আছে, চারপাশের প্রতিবেশ আছে, আলো আছে, শ্রোতাদের করতালি বা ধিক্কার আছে, লেখাতে সেগুলির কিছুই পাওয়া যায় না। ফলে এঁদের অমরত্ব আংশিক ও অতৃপ্তিকর।

সে তুলনায় কবি ও লেখকদের সুবিধে আছে বেশ খানিকটা। তাঁরা যেহেতু কথা দিয়ে পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করেন, সেহেতু তাঁরা মানুষকে সোজাসুজি বলতে পারেন, 'আমাকে মনে রেখো।' ছবি রং রেখা রূপ দিয়ে তৈরি, তাতে শিল্পীর প্রত্যক্ষভাবে দর্শককে বলার উপায় নেই যে, 'আমাকে মনে রেখো।' ছবিতে নামসইয়ের বেশি আর কিছু লেখার সুযোগই নেই চিত্রশিল্পীর। ভাস্কর, স্থপতি প্রভৃতির তো নামসইও নেই, কে কীভাবে মনে রাখবে তাঁদের? বেশিরভাগ মানুষ ইতিহাস সমালোচনার ধার ধারে না, তারা শুধু দেখে বা শোনে, শিল্পের সঙ্গে তাদের মুখোমুখি সাক্ষাৎকার হয় পথে-ঘাটে প্রদর্শনীতে মিউজিয়ামে। এসব শিল্পী তাঁদের সৃষ্টির মধ্যেই নিজেদের অমরত্বের আবেদন লুকিয়ে রাখেন, সবাই সে আবেদন পড়িও না আমরা।

লেখায় কবিরা একসময় মূল গান বা কবিতা পাঠের মধ্যেই নিজেদের নামটা গেঁথে দিতেন। লেখার বিষয় বা আখ্যানের সঙ্গে তার কোনও প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। যেমন মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এইসব নমুনায়:

মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরামদাস কহে শুনে পুণ্যবান।।

কিংবা

চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া বঁধুর সনে।।

কাশীরাম দাসের ভনিতা যেমন শুধুই সংবাদ, যে রচনাটি তাঁর, চণ্ডীদাস সেখানে পাঠের মধ্যে নিজেকে আরেকটু ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়েছেন, তিনি একটু মন্তব্য করে রাধার পাগলের মতো নানা ব্যবহারের ব্যাখ্যা দিয়েছেন পাঠককে। এইসব ভণিতার এইরকম নানা বৈচিত্র্য আছে। কিন্তু বড় কথা হল, রচনার মধ্যে কবি নিজের নামটা কোনওভাবে গেঁথে দিয়েছেন, রচনার সঙ্গে কবির নামও কাল পেরিয়ে যাবে, কিংবা তাঁর স্বকালেই অন্যরা জানবে। যেহেতু তখন সাহিত্য লিখিত হলেও তার মূল প্রচারের মাধ্যমটি ছিল মৌখিক, লেখা তখন ক-জনই বা পড়তে পারত!— তাই রচনার শিরোনামের নীচে কবি বা লেখকের নাম লেখা তখন শুরু হয়নি। পুথির টানা লেখার ঢং তার অনুকূল ছিল না।

আর এতে, এই মধ্যযুগে যে বিচিত্র ব্যাপার ঘটত সেকথা আগে বলেছি: অর্থাৎ অনেক অন্য নামের কবিও নিজের কবিতায় নিজের নাম না দিয়ে চণ্ডীদাস বা বিদ্যাপতি নামটা গেঁথে দিতেন। ভাবনাটা যেন এই যে, আমার নাম না বাঁচুক, আমার সৃষ্টি যেন বেঁচে থাকে। বিখ্যাত নামের ভেলায় ভাসতে ভাসতে যেন আমার আয়ুষ্কাল পার হয়ে অনন্তকালের দিকে যায়।

যাক বা না যাক, ব্যাপারটা তো এই যে, শিল্প জীবনের চেয়ে বেশি আয়ু পায়। শিল্পের মধ্যে আমার নাম না রইল, আমার আমিত্ব তো খানিকটা ভরে দিয়েছি, সেটাই চলুক কালান্তরে।

এইসব পরোক্ষ ও দীনদরিদ্র ইচ্ছার তোয়াক্কা করেন না মধুসূদনের মতো কবিরা। তাঁর 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় তিনি সোজাসুজি অমরত্ব প্রার্থনা করছেন তাঁর জন্মমাতৃকার কাছে, তাঁর কণ্ঠস্বরটি বিনীত, কিন্তু তাতে অন্তর্গত হয়ে আছে আত্মবিশ্বাস:

রেখো মা দাসেরে মনে এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন কোরো না গো, তব মনঃ কোকনদে।

প্রবাসে দৈবের বশে   জীবতারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হতে,   নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে,   অমর কে কোথা কবে?
চিরস্থির কবে নীর   হায় রে জীবন-নদে?

তবু যদি দয়া কর   ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর   দেহ দাসে সুবরদে।
ফুটি যেন স্মৃতি জলে,   মানসে মা যথা ফলে
মধুময় তামরস,   কী বসন্ত কী শরদে।।

বন্ধুকে চিঠিতে 'মেঘনাদবধ কাব্য' সম্বন্ধে লিখছেন, Will not this make me immortal? নিজের সমাধিতে মধুসূদন কী ব্যাকুল প্রার্থনা করেছেন পথিকের কাছে, 'মহীর কোলে মহানিদ্রাবৃত দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদনের' সমাধিস্থলে একটু দাঁড়িয়ে যাওয়ার জন্য। ১৩০০ বাংলা সনে রবীন্দ্রনাথ আশা করেছেন ১৪০০ সালে, 'শতবর্ষ পরে', কোনও তরুণী বসে বসে 'কৌতূহলভরে' তাঁর কবিতা পড়বে।

পৃথিবীর নানা দেশে নানা ভাষার কবি এই একই প্রত্যাশা পোষণ করেছেন, শিল্পীরাও লালন করেছেন একই গোপন বা প্রকাশ্য স্বপ্ন, তাঁদের সৃষ্টি তাঁদের অমর করে রাখবে। এ-বিষয়ে আমার বহু পাঠকই আমার চেয়ে অনেক বেশি খবর রাখেন বলে মনে করি।

৯

মৃত্যুর নানা রূপ ও রূপক, দক্ষিণ মুখ: রবীন্দ্রনাথ

এই বহু-আলোচিত প্রসঙ্গটি আবার এখানে টেনে আনবার কারণ কিছুই না, পৃথিবীর তাবৎ কবি-মনীষীদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে মৃত্যুকে একটু অন্য চোখে দেখেছেন তা শুধু আমাদের নয়, অন্যান্য দেশে আর সংস্কৃতিতেও সেটা অনেকের চোখে পড়েছে, প্রচুর মানুষ তাঁর দ্বারা উজ্জীবিত বোধ করেছেন।

একাধিক জায়গায় আমি বলেছি, যে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ধারণা একমাত্রিক নয়। তাঁর মৃত্যুবোধ ও মৃত্যুদর্শন সম্বন্ধে যেসব গবেষণা হয়েছে বা প্রবন্ধ লেখা হয়েছে তাতে মৃত্যুর যেন একটাই রূপ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, এইরকমই বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। অবশ্যই অন্যান্য পার্থিব মানুষের মতো শুধু নয়, জীবনের গভীর দর্শনের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর ওই অনিবার্য বাস্তবকে বোঝবার চেষ্টা করেছেন, এবং বুঝেছেন যে জীবনের এই পূর্ণাঙ্গ ছেদকে মানুষ কোনওদিনই চরম ও অবিকল্প বলে মেনে নেয়নি, তাকে পার হয়ে নানা আশ্বাস ও সান্ত্বনা সন্ধান করেছে। রবীন্দ্রনাথও সেই একই কাজ করেছেন— মৃত্যুর এমন একটা বহুমাত্রিক অর্থ বা চরিত্র আমাদের কাছে নির্মাণ করতে চেয়েছেন যা আমাদের মৃত্যুভয় কেড়ে নেয়, সহজে এই অমোঘ বাস্তবের মুখোমুখি হতে আমাদের সাহায্য করে। মৃত্যুভীত মানুষের কাছে এ-সাহায্যের দাম কম নয়। নিশ্চয় এ-নির্মাণ তাঁর নিজেরও জন্য, কারণ দীর্ঘ জীবনের নানা পর্যায়েই, বাস্তব মৃত্যুর অনেক আগেই, তাঁর মনে হয়েছে এ-পৃথিবীতে তাঁর যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে, এবার তাঁর সকলের কাছে বিদায় নেওয়ার পালা। তাঁকেও নিজের জন্য, নিজের মতো করে মৃত্যুর সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিতে হবে। যেভাবেই দেখুন মৃত্যুকে, তা যে জীবনের অনিবার্য সমাপন, তা যে জীবনকে এই (নিরুপায়?) পূর্ণতা দেয়, এবং পৃথিবীর জীবনপ্রবাহের স্বাস্থ্য ও শক্তি অব্যাহত রাখে, এই হল তার মূল কথা। কাজেই এই মৃত্যুকে ভয় পাওয়ার বা ধিক্কার দেওয়ার কিছু নেই।

সেই আলোচনায় যাওয়ার আগে বলি, রবীন্দ্রনাথ সব মৃত্যুকেই 'জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা' বলে মনে করেন না। কখনও-কখনও এমন মৃত্যুও ঘটে যার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের তীব্র ক্রোধ ও ধিক্কার গর্জে ওঠে, সে মৃত্যুকে রবীন্দ্রনাথ ক্ষমা করেন না। জাহাজডুবিতে পুরীর তীর্থযাত্রীদের সমুদ্রে মৃত্যু হলে রবীন্দ্রনাথ তাতে তাদের মহাপুণ্য হল বলে কোনও অলীক সান্ত্বনা খুঁজে পান না, কিন্তু বিশ্ববিধানের মঙ্গলপরিণাম সম্বন্ধে কঠিন প্রশ্ন তোলেন *মানসী*-র 'সিন্ধুতরঙ্গ' কবিতায়। 'তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে' পাথরে যখন 'নিষ্ফল মাথা কুটে' মরে, সে মৃত্যুকে রবীন্দ্রনাথ মোটেই বরণীয় মনে করেন না। মৃত্যু যেখানে নির্মম ধ্বংস ও হত্যা, যেমন জালিয়ান-ওয়ালাবাগে বা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের চিনে, সেখানে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর বেদনায় ও ক্রোধে কম্পিত হয়। না, সব মৃত্যু রবীন্দ্রনাথের কাছে বন্ধু নয়, তাকে শান্তভাবে গ্রহণ করার কথাও বলেন না তিনি। বিদ্রূপ করেন জাপানি ও ইউরোপের যুদ্ধবাজদের, যারা অগণিত মানুষকে মৃত্যু উপহার দেওয়ার জন্য বুদ্ধ আর খ্রিস্টের মন্দিরে গিয়ে পুজো দেয়, উপাসনা করে। আসন্ন মহাযুদ্ধের ধ্বংসের পূর্বসংকেত তিনি আগেই যেন লক্ষ করেছিলেন, সেই ১৯৩৭-এর শেষেই তাই লিখেছিলেন *প্রান্তিক*-এর ১৭ কবিতায়—

...দেখিলাম একালের
আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততা, দেখিনু সর্বাঙ্গে তার
বিকৃতির কদর্য বিদ্রূপ।...
...এ দিকে দানবপক্ষী ক্ষুব্ধ শূন্যে
উঠে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে বৈতরণীনদীপার হতে
যন্ত্রপক্ষ হুংকারিয়া নরমাংসক্ষুধিত শকুনি,
আকাশেরে করিল অশুচি। মহাকালসিংহাসনে-
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী নারীঘাতী
কুৎসিত বীভৎসা-'পরে ধিক্কার হানিতে পারি
যেন ...

এই হল একধরণের মৃত্যু, মানুষের হিংস্রতার ফলে মানুষের ধ্বংস সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব। কেন জানি না, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুভাবনা নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁদের কাছে এই মৃত্যুর ছবি ও রবীন্দ্রনাথের তীব্র আর্তি তেমন প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেনি। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথকে 'ঋষি' বা 'গুরুদেব' মূর্তিতে থিতু করে রাখার প্রচ্ছন্ন বাসনা এর মূলে। কিন্তু আমাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু-বোধের এই অভিমুখটিও গুরুত্বপূর্ণ। এখানেই রবীন্দ্রনাথ মানবতার এক মহৎ কবি হয়ে থাকেন।

অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুভাবনার আরও দুটি দিক আছে— এ দুটি দিকই বহু-চর্চিত। তার প্রথমটি হল, প্রিয়জনের মৃত্যু, ১৮৯৯ থেকে ১৯০৭ পর্যন্ত তাঁকে পরপর আঘাত করতে করতে এগিয়েছে। ১৮৯৯-এ প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ, ১৯০২-এ স্ত্রী মৃণালিনী দেবী, ১৯০৩-এ মধ্যমা কন্যা রেণুকা, ১৯০৫-এ পিতা দেবেন্দ্রনাথ, ১৯০৭-এ তাঁর অতি প্রিয় কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ। এই মৃত্যুমিছিলের মধ্যে একমাত্র দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু পরিণত জীবনের শেষে, অষ্টআশি বছর বয়সে। কিন্তু বলেন্দ্রনাথের মৃত্যু উনত্রিশ বছরে, মৃণালিনী দেবীরও তাই। মধ্যমা কন্যা, অকালবিবাহিতা রেণুকার প্রাণবিয়োগ হয় তার পিতার সম্মুখে চোদ্দ বছরে পৌঁছে; পুত্র শমীন্দ্রনাথকে কেড়ে নেয় কলেরা, যখন তার বয়স তেরো বছর।

এমন নয় যে, রবীন্দ্রনাথ এই ক-বছর শোকাভিভূত জড়ত্বে অতিবাহিত করেছেন। বরং এসময়েই তাঁকে দেখি জীবনে পূর্বাপরহীন এক অভাবিত কর্মোদ্যমের মধ্যে। তাঁর লেখনীর স্রোত অব্যাহত, এই সময়ের মধ্যে বেরিয়েছে তাঁর 'কথা', 'কাহিনী', 'কল্পনা', 'ক্ষণিকা' (চারটিই ১৯০০ তে), 'নৈবেদ্য' (১৯০১), 'খেয়া' (১৯০৬)— এই ছ-টি কাব্যগ্রন্থ, তিনটি উপন্যাস 'চোখের বালি' (১৯০৩), 'নৌকাডুবি' (১৯০৬), 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' (১৯০৬)। 'গোরা' ১৯১০-এ প্রকাশিত হলেও 'প্রবাসী' মাসিকপত্রে তার পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদে ধারাবাহিক প্রকাশ শুরু হয়েছে আগস্ট ১৯০৭ থেকে, আড়াই বছর ধরে তা প্রকাশিত হবে। পরের অক্টোবরেই মৃত্যু হবে শমীন্দ্রের, কিন্তু 'প্রবাসী'তে পাঠানো মাসিক কিস্তিতে কোনও ছেদ পড়বে না। শুধু কবিতা বা উপন্যাস নয়, এসময়ের মধ্যে প্রবন্ধের বই বেরিয়েছে ছয়টি: 'বিচিত্র প্রবন্ধ', 'চারিত্রপূজা', 'প্রাচীন সাহিত্য', 'লোকসাহিত্য', 'সাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য'। এছাড়াও আলাদা আলাদা একাধিক স্মরণীয় ('আত্মশক্তি', 'ভারতবর্ষ' ইত্যাদি) প্রবন্ধ বেরিয়েছে পুস্তিকার আকারে, বেরিয়েছে গল্প, এবং দুটি ছোট কৌতুক ও

সঙ্গের ছবিতে সপরিবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর বাঁদিকে কন্যা মাধুরীলতা ও পুত্র রথীন্দ্রনাথ। ডানদিকে কন্যা মীরা দেবী ও রেণুকা দেবী।

'শমী যে রাত্রে গেল তার পরের রাত্রে রেলে আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে, কোথাও কিছু কম পড়েছে তার লক্ষণ নেই। মন বললে কম পড়েনি, সমস্তর মধ্যে সবই রয়ে গেছে, আমিও তারই মধ্যে...'

ব্যঙ্গনাটিকার বই, 'হাস্যকৌতুক' ও 'ব্যঙ্গকৌতুক'।

১৯০১-এ প্রতিষ্ঠা করেছেন শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয়, তার পিছনে চেষ্টা ও উদ্যোগের অন্ত নেই। ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসবেন, সভা করবেন, প্রচুর গান রচনা করবেন, গান শেখাবেন, মিছিলের পুরোভাগে থাকবেন। ওই বছরই জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কাজে সক্রিয় অংশ নেবেন। ১৯০৮-এ পাবনায় জাতীয় সম্মিলনীতে গুরুত্বপূর্ণ সভাপতির ভাষণ দেবেন।

মনে রাখতে হবে, ওপরের এই তালিকা সম্পূর্ণ নয়, কোনও জীবনীর তথ্যই যে অর্থে সম্পূর্ণ নয়। আমাদের মনে হতেও পারে যে, হয়তো সব মানুষের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক, এইভাবে অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের মধ্যে একটা দূরত্ব রক্ষা করা। কিন্তু খুব কাছের মানুষের মৃত্যুর যতিপাতের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের এই বিপুল কর্মৈষণা আমাদের কাছে কখনও প্রায় দানবিক মনে হতে পারে।

কী ভেবেছেন রবীন্দ্রনাথ এইসব প্রিয়বিয়োগ সম্বন্ধে? মৃত্যু যেখানে তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে আঘাত করে, সেখানে তার তিনি কতটুকু মূল্য দেন? এক্ষেত্রে আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় দলিল হল শমীন্দ্রের মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁর স্মৃতি, যার কথা তিনি বলেন তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবীকে। মীরা দেবীর একমাত্র সন্তান নীতীন্দ্রনাথ ১৯৩২ সালে জার্মানিতে দূরপ্রবাসে গিয়ে মারা যায়। সেই সময়ে নানা দুঃখকাতর মীরাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে তিনি তাঁকে যে চিঠি লেখেন, তার এ কথাগুলি বহুবার উদ্ধৃত হয়েছে:

'শমী যে রাত্রে গেল তার পরের রাত্রে রেলে আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে, কোথাও কিছু কম পড়েছে তার লক্ষণ নেই। মন বললে কম পড়েনি, সমস্তর মধ্যে সবই রয়ে গেছে, আমিও তারই মধ্যে। সমস্তর জন্যে আমার কাজও বাকি রইল। যতদিন আছি সেই কাজের ধারা চলতে থাকবে। সাহস যেন থাকে, অবসাদ যেন না আসে, কোনোখানে কোনো সূত্র যেন ছিন্ন না হয়ে যায়— যা ঘটেছে তাকে যেন সহজে স্বীকার করি, যা কিছু রয়ে গেল তাকেও যেন সম্পূর্ণ সহজ মনে স্বীকার করতে ত্রুটি না ঘটে।'

এ-চিঠিতে একটু আগেই তিনি যা লিখেছেন তাও উদ্ধারযোগ্য:

'নিতুকে খুব ভালোবাসতুম, তা ছাড়া তোর কথা ভেবে প্রকাণ্ড দুঃখ চেপে বসেছিল বুকের মধ্যে। কিন্তু সর্বলোকের সামনে নিজের গভীরতম দুঃখকে ক্ষুদ্র করতে লজ্জা করে। ক্ষুদ্র হয় যখন সেই শোক সহজ জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করে, সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।'

এ তো গেল প্রবল দুঃখশোকের অভিঘাতে প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সংযত রাখার কথা, মৃত্যুর চরম দুঃখও সেই প্রকল্পের অন্তর্গত। এ হল জীবনের সাধনা, যে সাধনায় আমরা কেউ উত্তীর্ণ হতে পারি, কেউ পারি না। সমাজতাত্ত্বিকেরা কেউ বলেন, এই সংযম ইউরোপীয় চরিত্রের স্বাভাবিক লক্ষণ, কিন্তু আমরা এরকম সহজ 'প্রাচ্য'-'পাশ্চাত্য' বিরোধ স্বীকার করি না। পাশ্চাত্যের সাহিত্যে দুঃখশোকে বিকল হওয়ার দৃষ্টান্ত প্রচুর আছে, আবার প্রাচ্যদেশে 'দুঃখেষু অনুদ্‌বিগ্নমনা, সুখেষু বিগতস্পৃহঃ বীতরাগভয়ক্রোধঃ' ব্যক্তির অভাব ছিল না বা নেই, তাদের 'মুনি' বলি আর নাই বলি। রবীন্দ্রনাথের দুঃখদর্শন আসলে দুঃখকে উত্তীর্ণ হওয়ার দর্শন, দুঃখের মধ্যেই আনন্দকে আবিষ্কারের দর্শন।

এই ব্যক্তিগত সাধনার পাশাপাশি ছিল রবীন্দ্রনাথের শিল্পের সাধনা। তাঁর মৃত্যুবোধের তৃতীয় এক সূত্র— মৃত্যুকে একটা শিল্পিত সত্তা দেওয়ার চেষ্টা। সে কি বিবাহের নববধূ, প্রিয়া, কবির সঙ্গে যার মিলন-বিরহের খেলা চলে— 'আমি পরানের সাথে খেলিব আজিকে মরণখেলা'? নাকি কবির জীবনই সেই বধূ, *'গীতাঞ্জলি'*- তে এই মরণকেই 'এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা' বলে স্বীকার করে আনন্দময় প্রতীক্ষা করছেন তার—

মিলন হবে তোমার সাথে
একটি শুভ দৃষ্টিপাতে,
জীবনবধূ তোমার হবে
নিত্য-অনুগতা।...
বরণমালা গাঁথা আছে
আমার চিত্তমাঝে,
কবে নীরব হাস্যমুখে

আসবে বরের সাজে।
সেদিন আমার রবে না ঘর,
কেই বা আপন, কেই বা অপর,
বিজন রাতে পতির সাথে
মিলবে পতিব্রতা।

এই মৃত্যু কি এক মাঝি, দিনশেষের শেষ খেয়ায় কবি যার প্রতীক্ষা করেন, বলেন,

বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে।
শূন্য ঘাটে একা আমি, পার করে লও খেয়ার নেয়ে।

কিংবা সে কি *'ডাকঘর'*-এর রাজা, যে মধ্যরাত্রে এসে অমলকে সঙ্গে যাওয়ার জন্য ডাক দেবে? নাকি সে জীবনের অধীশ্বর, যাকে প্রশ্ন করেন প্রায় একই সময়ে— 'এখন সময় হয়েছে কি, সভায় গিয়ে তোমায় দেখি?'

গবেষকেরা সেইসব প্রশ্ন তুলে তালিকা প্রস্তুত করতে থাকুন। আমরা শুধু এখান থেকে বুঝে নেব রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদর্শনের তৃতীয় মাত্রা, যেখানে তিনি নিজের মৃত্যুর কথা ভাবেন, যে বয়সেই হোক। তাকে নিয়ে সৃষ্টি করেন নানা শিল্পিত রূপক (metaphor), আবার প্রগাঢ় জীবনমমতা সত্ত্বেও ('এই তো ভালো লেগেছিল আলোর নাচন পাতায় পাতায়') তার জন্য শান্ত প্রতীক্ষা কখনও বিচলিত হয় না রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে।

একা বসে সংসারের প্রান্ত-জানালায়
দিগন্তের নীলিমায় চোখে পড়ে অনন্তের ভাষা।
আলো আসে ছায়ায় জড়িত
শিরীষের গাছ হতে শ্যামলের স্নিগ্ধ সখ্য বহি।
বাজে মনে— নহে দূর, নহে বহু দূর।
পথরেখা লীন হল অস্তগিরিশিখর-আড়ালে,
স্তব্ধ আমি দিনান্তের পান্থশালা-দ্বারে,
দূরে দীপ্তি দেয় ক্ষণে ক্ষণে
শেষতীর্থমন্দিরের চূড়া।
সেথা সিংহদ্বারে বাজে দিন অবসানের রাগিণী
যার মূর্ছনায় মেশা এ জন্মের যা-কিছু সুন্দর,
স্পর্শ যা করেছে প্রাণ দীর্ঘ যাত্রাপথে
পূর্ণতার ইঙ্গিত জানায়ে।
বাজে মনে— নহে দূর, নহে বহু দূর।

এই শান্ত, বিষণ্ণ— হয়তো এক পরিপূর্ণ ও বহুবিচ্ছুরিত জীবন পাওয়ার জন্য কৃতার্থ ('ধন্য হল, ধন্য হল মানবজীবন')— রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুবোধ পৃথিবীর বহু মানুষকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে, উজ্জীবিত করেছে। আমরা সকলে এমন পূর্ণাঙ্গ জীবন বা এমন সার্থক জীবন পাই না। তবু মৃত্যুকে তাঁর চোখ দিয়ে দেখলে হয়তো আমাদের নানা অপ্রাপ্তির মধ্যেও এই জীবনের ওপর কোনও নতুন আলো পড়ে, যে আলো এই অচরিতার্থ জীবনকেই নতুনভাবে দেখতে শেখায়।

এমন নয় যে, রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করেননি। কান-ঘেঁষে চলে গিয়েছে মৃত্যু, ঠাট্টা করতে তাঁর আটকায়নি। যেমন *ছিন্নপত্র*-এর একটি চিঠিতে (২১ জুলাই, ১৮৯২) ভাইঝি ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন আগের দিন ব্রিজে বোটের মাস্তুল *ঠেকে* নৌকাডুবিতে প্রায় মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসার কথা—

কাল যে কাণ্ডটি হয়েছিল সে কিছু গুরুতর বটে। কাল যমরাজের সঙ্গে একরকম হাউ-ড্যু-ডু করে আসা গেছে। মৃত্যু যে আমাদের 'নেক্‌স্ট্-ডোর-নেবার' তা এরকম ঘটনা না হলে সহজে মনে হয় না। হয়েও বড়ো মনে পড়ে না। কাল চকিতের মতো যার আভাস পাওয়া গিয়েছিল আজ তার স্মৃতিখানা কিছুই স্মরণ হচ্ছে না। অপ্রিয় অনাবশ্যক বন্ধুর মতো একেবারে অনাহত ঘাড়ে এসে না পড়লে তাঁর বিষয়ে আমরা বড়ো একটা ভাবি নে। যদিও তিনি আড়াল থেকে আমাদের সর্বদাই খোঁজখবর নিয়ে থাকেন।

আবার আরেকটি চিঠিতে (২৫ নভেম্বর, ১৮৯৪) আছে আরেক ধরণের দার্শনিকতা, যার মধ্যে তাঁর পরবর্তী মৃত্যুদর্শনের আভাস ফুটে ওঠে, যা থেকে বোঝা যায়, তাঁর মৃত্যুভাবনা একদিনে গড়ে ওঠেনি—

এই তো পিঁপড়ে মরছে, মশা মরছে, তাকে আমরা এত তুচ্ছ মনে করি কেন? একটা পাতা শুকিয়ে পড়ে গেলে, একটা প্রদীপ বাতাসে নিবে গেলে, সেই বা শোকের কারণ কেন না হয়? সেও তো কম পরিবর্তন নয়। অনন্তের কাছে একটা সৌরজগৎ নিবে যাওয়া, পাতা ঝরে যাওয়া, মানুষ মরে যাওয়া, সব সমান— অতএব আমাদের শোক এবং সুখদুঃখ সব আমাদেরই। আমার এক-এক সময় মনে হয় জগৎটা দুই বিরোধী শক্তির রঙ্গভূমি— একজন আমাদের মধ্যে থেকে নিত্য বাঁচবার চেষ্টা করছে, আর-একজন তাকে নিত্য বধ করবার উদ্যম করছে— তা যদি না হত তা হলে মৃত্যু আমাদের পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক মনে হত, কিছুমাত্র শোচনীয় বোধ হত না— একসময় একরকম ছিলুম আর আর-এক সময় আর-এক রকম হয়ে গেলুম, এটার সঙ্গে কোনোরকম দুঃখশোক বিস্ময় জড়িত থাকত না।

কিন্তু আমাদের প্রকৃতির ভিতর থেকে বলছে 'বেঁচে থাকব', বলছে 'মৃত্যু আমার বিরোধী পক্ষ— তাকে জয় করতেই হবে'— অথচ কোনোকালে কেউ তাকে জয় করতে পারেনি। কিন্তু তবুও চেষ্টার ত্রুটি নেই। সেইজন্যই মৃত্যুযন্ত্রণা, মৃত্যুশোক— বেঁচে থাকবার একটা চিরসম্ভাবনা আছে, মৃত্যু তাকে বারবার পরাভূত করছে।

রবীন্দ্রনাথের এই মৃত্যুর ভাবনার কাছাকাছি আরেকটি ভাবনা আছে, তা 'মুক্তি'র ভাবনা। তা যেন খানিকটা বৌদ্ধ নির্বাণের ভাবনার মতো— একবার 'মুক্তি' হল তো ব্যস, আর জন্মান্তরের ঘূর্ণিপাকে চক্কর খেতে হবে না। পৃথিবীর নানা ধর্মেই 'মোক্ষ', salvation ইত্যাদির ধারণা আছে, যার পরে আর কিছু নেই। আগে বলেছি, বৈষ্ণবের বৃন্দাবন পাওয়া, বাংলা দেহতত্ত্বের রূপকে 'পার হওয়া', 'ওপারে যাওয়া' ইত্যাদি একই চিন্তা বহন করে। যেন তারপরে আর কিছু নেই। জানি না, নানা ধর্মের স্বর্গলাভ এরই সঙ্গে সমার্থক কিনা।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এই মুক্তির বিষয়ে এক স্পষ্ট ও দ্বিধাহীন কথা বলেন, জীবনের নানা পর্যায়ে। প্রথম দিকে যেমন বলেন,

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়;
অসংখ্যবন্ধনমাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ...

তেমনই অন্যত্রও প্রায় একইভাবে বলেন,

আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে,
আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে।

প্রথমটিতে মানবসংসারের স্নেহপ্রীতির বন্ধনের কথা প্রথমে এসেছে, গানটিতে প্রথমে এসেছে প্রকৃতি ও শিল্পের কথা ('গানে গানে আমার মুক্তি ঊর্দ্ধে ভাসে')। *গীতাঞ্জলি*-তেও একই প্রত্যয় থেকে তাঁর প্রশ্ন: 'মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি? মুক্তি কোথায় আছে? আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন পরে বাঁধা সবার কাছে!' সবখানেই আছে ইহজীবনের পরিপূর্ণ অস্তিত্বের বিষয়ে তাঁর সম্পূর্ণ ইতিবাচক মনোভাব। না, এই জীবনের বাইরে কোনও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তাঁর নেই। *আরোগ্য*-এর প্রথম কবিতাটি এই মুক্তির কথাই একটু অন্যভাবে বলে,

এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি—
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি
এই মহামন্ত্রখানি,
চরিতার্থ জীবনের বাণী।
দিনে দিনে পেয়েছিনু সত্যের যা-কিছু
উপহার
মধুরসে ক্ষয় নাই তার।

তাই এই মন্ত্রবাণী মৃত্যুর শেষের প্রান্তে বাজে—

সব ক্ষতি মিথ্যা করি অনন্তের আনন্দ বিরাজে।
শেষ স্পর্শ নিয়ে যবে যাব ধরণীর
বলে যাব, তোমার ধূলির
তিলক পরেছি ভালে,
দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে।
সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মুরতি,
এই জেনে এ ধুলায় রাখিনু প্রণতি।

আগামী সংখ্যায় শেষ

সবে যারা অক্ষর চিনেছে তাদের জন্য এক আশ্চর্য সুন্দর বই

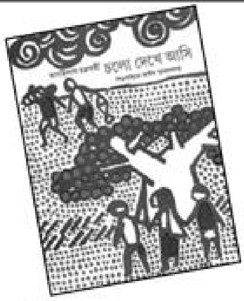

কানাইলাল চক্রবর্তীর

চলো দেখে আসি

শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত

পাতায় পাতায় রঘুনাথ গোস্বামী ও পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি।

দাম ২০ টাকা

অনলাইনে পেতে
www.swarnakshar.in
লগ অন করুন

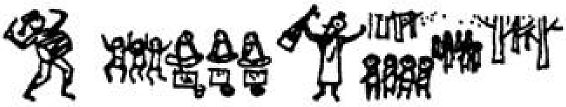

বইটি শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে। এটি লেখা হয়েছে শিশুদের জন্যে যত্ন করে ও যুক্তাক্ষরবর্জিত করে। রবীন্দ্রনাথের সহজ পাঠ প্রথম ভাগের পর, সদ্য অক্ষর পরিচয় হয়েছে যাদের তাদের জন্যে এরকম বই বেশি লেখা হয়নি। 'এস, এস। চটপট কর। সময় কম।' এইরকম ছোট ছোট সরল বাক্য দিয়ে পাঠ শুরু হয়েছে।

ছোট-ছোট বর্ণনাগুলি ক্রমশ সুন্দর ছবির রূপ নিয়েছে।

আনন্দমেলা □ ১৬-৩-১৯৮৮

'চলো দেখে আসি' বলে বাংলা প্রথম পাঠের বইখানি এরই মধ্যে বহু যশ অর্জন করেছে। প্রথম ভাগ 'সহজ পাঠে'র চাইতেও সহজপাঠ এ বই। মোট তিনটি অধ্যায়ে লেখক স্বরবর্ণযোগের যাবতীয় বৈচিত্র্য পরিক্রমা করে নিয়ে গেছেন যুক্তবর্ণের সীমানা অবধি, ওপরে ওপরে গাঁ আর গ্রামজীবনের ছবি দিয়ে দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছেন সারা পথ।

আনন্দবাজার পত্রিকা □ ১৮-৯-১৯৮৮

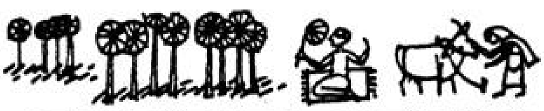

একলা একটা পাখি দূর থেকে ডাকছে না? সে কি এই দিকেই উড়ে আসছে? চলো দেখে আসি।

হঠাৎ মেঘ ডাকল না? এখন তো মেঘ ডাকার সময় নয়! চলো দেখে আসি।

ছোটদের নিয়ে ছোটদের জন্য এরকম কত কথাই যে তিনি লিখেছেন তার শেষ নেই। এরকম কিছু কথার পিঠে ছবি আঁকলেন শিল্পী রঘুনাথ গোস্বামী আর পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়— তাই নিয়ে হল একটা ছোটদের বই— 'চলো দেখে আসি।'

যুগান্তর, ছোটদের পাততাড়ি □ ১১-৬-৮৫

সদ্য বর্ণ-পরিচিতদের কাছে এক বিশ্বাস্য, প্রামাণিক আর ব্যক্তিগত পৃথিবীর দরজা খুলে দিয়ে কানাইলাল চক্রবর্তী ডাক দিয়েছেন: চলো দেখে আসি।

মিনিমাসী আর তার গাভী মালিনী, লালু-ভুলু আর তাদের কুকুর ভুকু, চূড়ামণি ঠাকুর, ভূষণমালী, ঋষি দাশ, শৈল, ভোলা, গৌরময়রা, কংসারিবেদে— এই বইতে এরা শুধু বর্ণ-পরম্পরাতেই ধরা পড়েনি, অপত্য স্নেহের এক অকৃপণ ফল্গুধারায় বাঁধা পড়ে এরা সবাই মিলেমিশে হয়ে উঠেছে প্রাক্-বিভাজন বাংলাদেশের এক প্রতিষ্ঠান।

একুশ বছর আগে লেখা 'চলো দেখে আসি' ছোট্টদের শ্রেষ্ঠ বই হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিল ১৯৭০ সালে।

আজকাল □ ২৩-৮-১৯৮৮

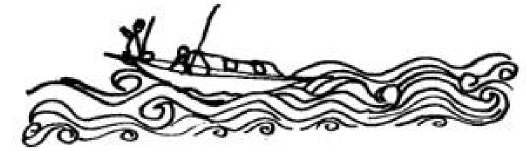

কানাইলাল চক্রবর্তী সেই সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে একজন, যাঁরা ছোটদের জন্য আন্তরিকভাবে চিন্তাভাবনা করেন।... এই বইতে অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে তিনি অ-কার, আ-কার ইত্যাদির পরিচয় করিয়েছেন সেইসব শিশুদের যাদের সদ্য অক্ষরপরিচয় হয়েছে। যুক্তাক্ষরবিহীন প্রতিটি ছত্র। প্রতিটি কাহিনী শিশুদের কাছে মেলে ধরেছে প্রকৃতি এবং জীবনের অপরূপ রূপচ্ছবিকে।

বর্তমান □ ১১-২-১৯৯০

এই লেখকের আরও দুটি ছোটদের বই

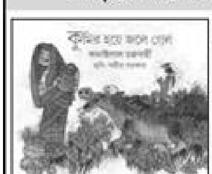

কুমির হয়ে জলে গেল

প্রথম স্বর্ণাক্ষর সংস্করণ ₹৩০

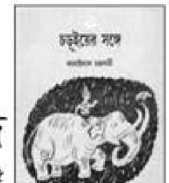

চড়ুইয়ের সঙ্গে

₹১৫

স্বর্ণাক্ষর **Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.**, 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320, 2283-5526 **Fax:** 2287-6448 **E-mail:** books@swarnakshar.in

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, **বলাকা বুক স্টল** (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাবেন।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর

স্বনির্বাচিত দুটি গল্প

১ // গৃহ

ভোরবেলা বাবা এলেন, মাথার জট এবার আরও বেড়েছে, হাতে কচি কচি চারটে সজনে ডাঁটা।

এর আগে যেবার এসেছিলেন, সেবার এনেছিলেন চারটে সবেদা। মায়ের, আমার, নীলুর আরেকটা নিজের জন্য। এবারও চারটে। বাবা তো আর জানতেন না, নীলু জেলে।

বাবার ডাক শুনেই মা আমার ঘুম ভাঙান। মাথায় কাপড় দিতে দিতে বললেন, 'দরজা খোল তো।' বলে নিজেই দরজা খুলে দিয়ে বাবার চোখে চোখ রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। বাবার মাথার ওপর দিয়ে দেখলাম আকাশে তখনও শুকতারা জ্বলজ্বল করছে।

বাবা বললেন, 'ঘুমোচ্ছিলে?'

কথার উত্তর না দিয়ে মা শুধু বললেন, 'ভেতরে এসো।'

বাবাকে বসবার ঘরে বসিয়ে মা বোধহয় বিছানা তুলতে গেলেন। আগের বার বাবার পরনে ছিল গেরুয়া, মা রাগে কুটি কুটি করে ছিঁড়ে দিয়েছিলেন। এবার ময়লা, ছেঁড়া ধুতি আর ফতুয়ায় বাবাকে দেখাচ্ছে ঠিক একটা ভিখিরি।

হাতের চেটোয় সিগারেট আড়াল করে বাথরুমে যাবার সময় দেখলাম, বাবা ঘাড় ঘুরিয়ে দরজা-জানলার পর্দা দেখছেন। আমাকে দেখে বললেন, 'আজকাল কী করছ-টরছ শুনব। স্নান সেরে এসো। নীলুকে তো দেখছি না?'

বছরের পর বছর খবর রাখেন না, আজ এত খবরে কী দরকার আপনার! মুখে বললাম, 'আপনি রেস্ট করুন, মা চা আনছে।'

বাবাকে দেখে এবার কেন জানি না আমার আনন্দ হল না। বরং অস্পষ্ট একটা বিরক্তি ক্রমশই মনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। শুকনো রুগ্‌ণ চেহারা, ভিখিরির অধম জামাকাপড়, বাবা এভাবে জীবনে কী আহরণ করছেন, তিনিই জানেন!

বাথরুমের দরজায় খটখট। মায়ের গলা— 'তোর কি দেরি হবে মলু?'

বেরিয়ে দেখি মায়ের হাতে বাবারই বহু যুগ আগের পাটভাঙা ধুতি। বাবার পাশে রেখে বললেন, 'ছাইভস্ম ধুয়ে, রাজবেশ ছেড়ে এসো।'

বাবার মুখে অপরাধীর হাসি। সজনে ডাঁটাগুলো তখনও হাতে ধরা, মায়ের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'বড় উপকারী। অল্প আঁচে রেঁধো।'

'তুমি খাবে না?'

'না হলে আর চারটে এনেছি!'

'তুমি বাড়ির রান্না খাবে? তোমার জন্য আলাদা হাঁড়ি মাজতে দিয়ে এলাম।'

বাবার মুখে আবার সেই গোঁফ-দাড়ি ছাপানো অপরাধীর হাসি।

মা আজ বোধহয় চায়ের কথা ভুলে গেছেন। আমার জেলের দেরি হয়ে যাচ্ছে, শুধু তো দেখতে যাওয়া না, নীলুর জন্য কিছু কেনাকাটাও করতে হবে। এদিকে ইন্টারভিউ শুরু হবার আগেই জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্টকে দরখাস্ত না দিতে পারলে সেদিন আর দেখা হবার উপায় নেই।

রবিবার এমনিতে আমার ছুটির দিন। কিন্তু জেলের তাড়াহুড়োয় সকালটা আলস্যে কাটাবার উপায় থাকে না। খবরের কাগজে চোখ বুলিয়ে চানটান করে তৈরি হয়ে নিই। সপ্তাহে ওই একদিনই নীলুর সঙ্গে দেখা করা যায়, অন্য দিন নিষিদ্ধ।

এর সঙ্গে আজ আবার একটু বাড়তি তাড়াও আছে। দুপুরে ঋতু আসবে। আমাদের সঙ্গে খাবে। বেরবার আগে মুরগি কিনে দিয়ে যেতে হবে। মায়ের তা অজানা নয়।

মা বাবাকে তোয়ালে দিতে ভুলে গিয়েছিলেন, তোয়ালে নিয়ে বাথরুমের দরজায় খুব আস্তে ঠকঠক করতেই বাবা দরজা খুলে দিলেন। বাবা ধুতি পরে চান করছিলেন, তোয়ালেটা নিতে নিতে বললেন, 'নীলুকে দেখলাম না তো!'

'সে বাবু সন্ন্যেসী হয়ে গেছে!'

'সে কী!' বাবা খুব চমকে উঠেছেন মনে হল।

'সন্ন্যাসীর ছেলে সন্ন্যাসী ছাড়া আর কী হবে?' বলে এদিকে মুখ ঘোরাতেই দেখলাম, মায়ের নাকের পাটা হঠাৎ দুবার ফুলে উঠল।

মা রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিলেন, আমি বললাম, 'নীলুর সঙ্গে আজও দেখা হওয়া

মা গলা তুলে বললেন, 'লক্ষ্মী! এদিকে একবার আয় তো। ফতুয়াটা নিয়ে একেবারে রাস্তায় ফেলে দিয়ে আয়!' বাবা ব্যস্ত হয়ে ফতুয়াটা তুলে ধরে পকেট থেকে একটা বড় রঙিন পাথর বার করে নিলেন, একবার মায়ের দিকে, একবার আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'এটা নিয়ে আমি খেলি!' মা বললেন, 'তোমার তো এখন খেলারই বয়েস!'

মুস্কিল হবে! ঋতুরও আসার সময় হয়ে যাচ্ছে!'

খাবার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে মা বললেন, 'ঋতুর আজ এখানে না আসাই ভালো। তুই বরং নীলুর কাছ থেকে ঋতুদের বাড়ি চলে যাস। তোরা হোটেল থেকে কিছু খেয়ে নিস।'

'বাবার কথা ঋতু তো জানেই?'

'সে জানা আর হঠাৎ এরকম দেখা এক কথা না।'

'বাবা নিশ্চয়ই দু-তিন সপ্তাহ থাকবে—'

'যা ভালো বুঝিস কর—'

বলে মা রান্নাঘরে গেলেন।

ফর্সা ধুতি পরে বাবা বাথরুম থেকে বেরলেন। চুল-দাড়ির জটা বেয়ে টপটপ করে জল পড়ছে। বাঁহাতে সেই ছাড়া ফতুয়াটা।

আমাকে দেখে বললেন, 'নীলু তাহলে সন্ন্যাস নিল?'

আমি হ্যাঁ-না কিছুই বললাম না।

বাবা ঠায় দাঁড়িয়ে। খানিকটা উদ্বেগ, কিছুটা অন্যমনস্ক। মনে হয় নিজের সঙ্গে কিছু একটা বোঝাপড়া করছেন।

হঠাৎ মুখ তুলে বললেন, 'কতদিন বাড়িছাড়া?'

'সাত বছর!'

'তখন ওর বয়েস কত?'

'সে তো আপনারই জানার কথা!'

বাবা দুয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে খুব শান্ত গলায় বললেন, 'তোমার কণ্ঠস্বর শুনে মনে হচ্ছে, তোমার মনে শান্তি নেই, শুধু বাইরের দিকে সুখ-শান্তির আয়োজন করেছ।'

এক হাতে ফ্রাই প্যানে ওমলেট, আরেক হাতে টোস্ট নিয়ে মা সোজা টেবিলের কাছে এসে বললেন, 'প্লেটটা টেনে নে।' আমার প্লেটে টোস্ট ওমলেট দিয়ে বাবাকে বললেন, 'তুমি কি এই আমিষ টেবিলে বসবে, না চা ঘরে দিয়ে আসব?'

বাবা কথার উত্তর না দিয়ে অন্যমনস্কভাবে খাবার টেবিলের একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন।

মা রান্নাঘরের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন, বাবা বললেন, 'শোনো, একটা কথা বলো দেখি। নীলু কি তবে সংসারে—'

বাবা কথা শেষ করলেন না। চুপ করে আছেন দেখে মা আবার চলে যাচ্ছিলেন, বাবা বললেন, 'নীলু কি সংসারে কোনও ব্যথা পেয়েছিল?'

মা স্পষ্ট চোখে বাবার দিকে তাকালেন, মায়ের ঠিক এরকম চোখ তুলে তাকানো আমার মনে পড়ে না। ওইভাবে চেয়ে থেকেই বললেন, 'এই মলুর সামনেই বলছি, নীলু তোমার কাছে কী পেয়েছে একটু ভেবো তো!'

বাবা কিছুক্ষণ বসে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে এতক্ষণে হাতের ফতুয়াটা টেবিলের কোনায় রাখলেন। ঠক করে শব্দ হল।

মা আমার জন্য চা নিয়ে এসেছিলেন, শব্দটা তাঁরও কানে গেছে— ফতুয়ার পকেটে ওটা কি গাঁজার কলকে না? যে কদিন থাকবেন, বাড়িতেও খাবেন নাকি? মা কি আগেই এটা দেখেছিলেন, তাই ঋতুকে আসতে বারণ করছিলেন?

মা গলা তুলে বললেন, 'লক্ষ্মী! এদিকে একবার আয় তো। ফতুয়াটা নিয়ে একেবারে রাস্তায় ফেলে দিয়ে আয়!'

বাবা ব্যস্ত হয়ে ফতুয়াটা তুলে ধরে পকেট থেকে একটা বড় রঙিন পাথর বার করে নিলেন, একবার মায়ের দিকে, একবার আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'এটা নিয়ে আমি খেলি!'

মা বললেন, 'তোমার তো এখন খেলারই বয়েস!'

'না না, মন যখন বিক্ষিপ্ত হয়, ওই পাথরটা নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাই, মন শান্ত হয়ে যায়। ওতে আমার ভারি মনসংযোগ হয়।' একটু থেমে বললেন, 'তোমাকেও শেখাব।'

মা হঠাৎ রেগে উঠলেন মনে হয়। গলার স্বরে ঝাঁঝ নিয়েই বললেন, 'আগে সংসার-ধর্ম শেখো, তারপর তোমার সন্ন্যাস শিখিয়ো! তোমার সকালবেলায় সেবায় কী কী লাগে বললে না তো?'

বাবা মনে হয় আঘাত পেয়েছেন। স্বরে আঘাত চাপবার চেষ্টা। বললেন, 'সকালে আমি কিছু খাই না। চা যখন করেছ, এক কাপ দিতে পারো। এক গেলাস জলও দিও।'

মা চায়ের সরঞ্জাম আজ টেবিলে আনেননি। রান্নাঘর থেকে এক কাপ চা এনে বললেন, 'এখানেই খাবে?'

'একটা টেবিল আর কী দোষ করল?'

'দোষগুণ তুমিই জানো! সেবার তো পিঁড়িও ছোঁওনি।'

মা ফ্রিজ খুলে একটা জলের বোতল বার করে এদিক ওদিক গেলাস খুঁজলেন, না পেয়ে বোতলটা বাবার হাতে দিয়ে বললেন, 'তোমার তো কমণ্ডলু থেকে খাওয়ার অভ্যেস— খুব ঠান্ডা কিন্তু—'

আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, 'হিমালয়ের বরফের চেয়ে তো বেশি ঠান্ডা না।'

কথাটা আমি হালকাভাবে, নির্দোষ মজা হিসেবেই বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু কেমন ব্যঙ্গের সুর এসে গেল! বাবা দেখলাম, হাতের পাথরে চোখ নামালেন।

আগের বার বাবা যখন এসেছিলেন, বছর নয়েক আগের কথা, আমি ম্যানেজমেন্ট কোর্সের অ্যাডমিশন টেস্টে সিলেকটেড হয়ে টাকার ধান্দায় না ধরছি এমন আত্মীয় নেই, তখন আমাদের খাবার টেবিল ছিল না, মেঝেয় পিঁড়ি পেতে বসে খেতাম, আমার মনে আছে, বাবা সেবার মায়ের পীড়াপীড়িতেও পিঁড়িতে বসতে রাজি হননি। মা কেঁদে ফেলেছিলেন। এখন বুঝি, কত সামান্য কারণে মা তখন কাঁদতেন। সারা সন্ধে মায়ের ফোঁপানো কান্না শুনতে শুনতে সেদিন বাবার ওপর আমার খুব রাগ হয়েছিল।

মা চান করে শাড়ি বদলে এসেছেন। আমি খাবার টেবিলেই ছোট আয়না বসিয়ে দাড়ি কামাচ্ছি। আমাকে দেখে বললেন, 'আ! আজ আবার এখানে বসলি কেন?'

আমি মুখ না ফিরিয়েই বললাম, 'তুমি বাথরুমে ছিলে।'

মা আমাকে কিছু না বলে বাবাকে বললেন, 'দুপুরে খাবে তো? নাকি এখনও একাহারী?'

আমি টের পাচ্ছি, বাবা আমাকে দেখছেন। মাকে বললেন, 'না! আর কোনও নিয়ম নেই।'

'আজ আমাদের মুরগি হবে। তুমি খাবে?'

বাবার উত্তর নেই। একটু পরে বললেন, 'আমার জন্যে ভাতের মধ্যে কিছু সেদ্ধটেদ্ধ করে দিও। আর সজনে ডাঁটা।'

'তবে যে বললে, নিয়মটিয়ম আর মানো না?'

বাবা খুব শান্ত স্বরে বললেন, 'প্রাণী হত্যার দায়ভাগী হতে পারব না।'

বলে খুব বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

বাবার কথাটাতেই আমার জ্বালা ধরেছিল, মনে হল যেন ব্রণয় হঠাৎ ব্লেড বসে গেছে, তার ওপর ওই দীর্ঘশ্বাস আর সহ্য করতে পারলাম না। বাবার দিকে তাকিয়েই বললাম, 'তবে তো আপনার ভাতও খাওয়া চলে না! গাছও তো প্রাণীই। সজনে ডাঁটা খাওয়ার যুক্তিটাই বা কী?'

বাবা পাথরটা হাতে নিয়ে দু-হাত জোড় করে বসেছিলেন, এবারও খুব শান্ত গলায় বললেন, 'জীবন তর্কের বিষয় নয়। তর্ক খুব বাইরের জিনিস, মলয়।'

মলু না বলে মলয়! এরকম বাবা আগেও বলতেন, আমাকে মলয়, নীলুকে নীলয়, সে আমাদের ছেলেবেলায় দেশি-বিদেশি গল্প শুনিয়ে গল্পের উপদেশ যখন বোঝাতেন, তখন। আমার কথাটা একটু রূঢ় হয়ে গেছে সন্দেহ নেই, তা কী করা যাবে, আমিও তো মানুষ। একে তো শেষরাতে আচমকা ঘুম ভেঙে মাথাটা ভার হয়ে আছে, তার ওপর এত আগে উঠেও লাভ কী হল? সেই দেরিই হয়ে গেল। বাজারে যাও, মুরগি কিনে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দাও, তারপর নীলুর জন্য আজ একটা মাখন আর কেজি খানেক ছোলা-বাদাম কিনব ভেবেছি, একটা পাজামা আর এক জোড়া চপ্পল চেয়েছিল, কাল কিনে রাখতে ভুলে গেছি, আজ রবিবার দোকান-টোকান কোথায় খোলা আছে কে জানে— সব তো আমাকেই সামলাতে হবে! এদিকে দেখতে দেখতে প্রায় সাড়ে আটটা। তার মানে ঋতুরও আসার সময় হয়ে এল।

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে বাথরুমের দিকে যেতে যেতে মাকে বললাম, 'আমি মুরগি এনে দিয়ে যাচ্ছি। ঋতু এলে আমার ঘরে বসিয়ো। আর কিছু কি আনতে হবে?'

মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। হাতে এক পেয়ালা দুধ। আমার সামনে ধরে বললেন, 'এক চুমুকে খেয়ে নে। কখন ফিরবি, কখন খাবি তার তো কোনও ঠিক নেই। ছোট বাঁধাকপি একটা পাস তো আনিস।'

দুধে চুমুক দিচ্ছি, বাবা বললেন, 'আজ যে বড় রান্নার ঘটা! নেমন্তন্ন নাকি?'

'নেমন্তন্ন আবার কী! একটা মেয়ে আসবে, আমাদের সঙ্গে খেতে বলেছি—'

'কার মেয়ে?'

'তুমি চিনবে না।'

'তোমাদের সঙ্গে কী ধরনের সম্বন্ধ?'

মা এবার একটু হেসে বললেন, 'সম্বন্ধ হয়নি, হচ্ছে। মলুর অফিসের বন্ধু। বুঝলে?'

দুধ শেষ করে বেরবার মুখে অভ্যেসবশত সিগারেট ধরাতে গিয়ে সামলে নিলাম। হাতের তালুতে সিগারেটটা লুকিয়ে ফেলা বাবার চোখে পড়েছে। আরেকবার বাবার চোখের দিকে এক পলক তাকিয়ে নিয়ে বললাম, 'আমি বাজারে যাচ্ছি। ফিরে এসেই আবার বেরতে হবে। আপনি বরং পিছনের বাগানে ঘুরে বেড়ান, আপনার ভালো লাগতে পারে।'

বাবা চেয়ারে বসে থেকেই বললেন, 'আমি ভাবছি, তোমাকে এত চঞ্চল দেখাচ্ছে কেন!'

'চাঞ্চল্যের কারণ আছে বলেই দেখাচ্ছে'।

'না না, সে কথা বলছি না। তুমি বড় অশান্তিতে আছো।'

ভাবলাম কথা না বাড়িয়ে চলে যাই, সত্যিই দেরি হয়ে গেছে, কিন্তু হঠাৎই কী রকম জেদ ধরে গেল, বললাম, 'অশান্তির কারণ থাকলেই অশান্তি থাকবে। পাগল বা সাধু-সন্ন্যাসী হলে আলাদা কথা।'

'তুমি বোধহয় আমার কথা ঠিক বুঝতে পারছ না। একটা কথা বলো তো, আজ যার আসার কথা তার সঙ্গে কি তোমার বিবাহ হবার সম্ভাবনা আছে?'

মা বোধহয় সবই শুনছিলেন, আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বেরিয়ে এসে বাবাকে বললেন, 'তুমি ওকে অমন জেরা করছ কেন? শুনছ ওর খুব দরকারি কাজ আছে, দেরি হয়ে গেছে—'

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, 'তুই বরং আগে ওখানে যা। ফেরার সময় মুরগি নিয়ে আসিস। পাওয়া যাবে না?'

তাছাড়া আর বোধহয় উপায়ও নেই। বাজার করে ফিরে এসে নীলুর কেনাকাটা সেরে আলিপুর যাবার আর সময়ও থাকবে না। বাদ দেওয়াও আর যায় না। গত রবিবার যাওয়া হয়নি, ও খুব আশা করে থাকবে।

বাবা দাড়ির জটে হাত বোলাচ্ছেন। জট ছাড়াচ্ছেন না, হাত দিয়ে জটগুলো যেন অনুভব করছেন। আমি চলে যাচ্ছি দেখেও বললেন, 'মলুর জীবনে অনেক জট পড়েছে। সেসব না ছাড়িয়ে অন্যের জীবনে এখনই ওর জড়িয়ে পড়া ঠিক হবে না।'

ঘরে বসে জেল সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাছে নীলুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য অ্যাপ্লিকেশন লিখতে লিখতে মায়ের গলা শুনলাম, ঝাঁঝ চাপতে পারেননি, 'বত্রিশ বছর বয়েস হল, ওকেও কি সন্ন্যাসী বানাতে চাও নাকি?'

বাবার গলা এবারে বেশ মৃদু। বললেন, 'অনুপযুক্ত হাতে সংসার করতে গেলে সংসার নরক হয়ে ওঠে।'

বাবার কথায় মা একেবারে জ্বলে উঠলেন, বোধহয় রান্নাঘর থেকে চ্যাঁচাচ্ছেন— 'সারা জীবন সন্ন্যেসীগিরি করে কাটালে, সংসারের কতটুকু বোঝ? ইচ্ছে হল আর বেরিয়ে পড়লে। মলু কত দিকে কত লড়াই করে আজ দাঁড়িয়েছে। ওর জন্যই যা হোক একটু সুখের মুখ দেখছি। কথায় কথায় ওকে অপমান করলে সইবে কেন!'

রান্নাঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'আ! মা! তোমরা কী শুরু করলে? ঋতু আজ না এলেই ভালো হয়!'

মা আবার বেরিয়ে এসে বাবার একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তুমি দু-দিনের জন্যে এসেছ, সংসারের সব ব্যাপারে মাথা ঘামাবার তোমার দরকার কী? যাও না, দু-দণ্ড বাগানে গিয়ে বসো না।'

বাবা এমন একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন যে, ওরকম উত্তেজনাময় পরিবেশেও আমার বুকের মধ্যে একবার ধ্বক করে উঠল।

রাস্তায় বেরিয়ে প্রথমেই ঋতুকে ফোন করলাম।

'ঋতু, শোনো, আয়াম ফিলিং সো ব্যাড—'

'কী ব্যাপার?'

'না, মানে, বলতে খুবই খারাপ লাগছে—'

'দেরি করছো কেন, বলো, বলে ফেলো, আমি কিন্তু টেন্স হয়ে যাচ্ছি—'

'মানে আমার এক আত্মীয় মারা গেছেন।

'প্রায় সব কোর্টেই কেস দিয়েছে। প্রতি সপ্তাহেই কোথাও না কোথাও যাচ্ছি। বিনা পয়সায় দেশ ভ্রমণ আর কী!' নীলু অনায়াসে এসব কথা বলে যায়। আমিও সহজ থাকার ভান করি। সেই ভাবেই প্রশ্ন করলাম, 'তোরা শুনেছিলাম দেশ বদলে দিবি। তা দেশ তো যেখানে ছিল সেখানেই আছে। মাঝখান থেকে তোরা সরকারের অতিথি হয়ে গেলি। লাভ কী হল?'

আজই সকালে, এইমাত্র খবর পেলাম—'

'সো স্যাড—'

'নেমন্তন্নটা কিন্তু মুলতুবি রইল। সামনের রবিবারের পরের রবিবার। না না, আমি তোমাকে জানিয়ে দেব।'

নীলুকে বাবার কথা বলব বলব করেও শেষ পর্যন্ত বললাম না। কত বছর জেলে রয়েছে, আরও কত বছর থাকতে হবে, বাবার কথা ওকে জানিয়ে লাভ কী? আর বলবই বা কী?

দু পরত তারের জালের আড়ালে গোঁফ-দাড়িময় ওর মুখটা দেখে আজ হঠাৎ মনে হল, মা খুব মিথ্যে বলেননি, সন্ন্যাসীই তো, নীলুকে ক্রমশ তরুণ সন্ন্যাসীর মতো দেখাচ্ছে!

বললাম, 'আজ আর চপ্পল কেনার সময় পেলাম না। পাজামা জমা দিয়ে যাচ্ছি। তোর মাপটা মনে ছিল না, ৪০ নম্বর নিয়েছি, পরে দেখিস তো।'

'পাজামা একটু ছোট হলে এমন কী আর, বড় হলে গুটিয়ে নিলেই হবে।' তারপর লাজুক হেসে বলল, 'দুয়েক প্যাকেট সিগারেট দিয়ে যেও।'

'তোর কেসের কতদূর কী হল? কোর্টে নিয়ে যায়?'

'প্রায় সব কোর্টেই কেস দিয়েছে। প্রতি সপ্তাহেই কোথাও না কোথাও যাচ্ছি। বিনা পয়সায় দেশ ভ্রমণ আর কী!'

নীলু অনায়াসে এসব কথা বলে যায়। আমিও সহজ থাকার ভান করি। সেই ভাবেই প্রশ্ন করলাম, 'তোরা শুনেছিলাম দেশ বদলে দিবি। তা দেশ তো যেখানে ছিল সেখানেই আছে। মাঝখান থেকে তোরা সরকারের অতিথি হয়ে গেলি। লাভ কী হল?'

নীলু এবারও হেসে বলল, 'এসব কথা তোমার সঙ্গে আলোচনা করে লাভ নেই। দাদা, তুমি বিয়ে করছ কবে?'

আমি সাধারণত এখানে এসে নীলুর সামনে সিগারেট খাই না, আজ একটা ধরিয়ে ফেললাম।

'তুমি বিয়ের কথায় চুপ মেরে গেলে যে?' হাসলে নীলুকে ভারি সুন্দর দেখায়।

আমিও হেসে বললাম, 'তুই শ্বশুরবাড়িতে, আমিও শ্বশুরবাড়িতে, মা কাকে নিয়ে থাকবে?'

'তুমি কি ঘরজামাই হচ্ছ নাকি?'

'সে তো তোরই একচেটিয়া।'

বলে আমি অকারণে পাশের গোয়েন্দা অফিসারের দিকে তাকালাম। ভদ্রলোকও মৃদু হাসলেন, বললেন, 'নীলয়বাবুর মতো জ্ঞানী, ওরকম চার্মিং ইয়ংম্যান আমার ২৬ বছরের চাকরিজীবনে আমি আর দেখিনি। মাঝে মাঝে সত্যিই আশ্চর্য হয়ে ভাবি—'

নীলু জালের ঝাপসা আড়াল থেকে ভদ্রলোককে উদ্দেশ করে বলল, 'থাক থাক গোয়েন্দামশাই, আমার চরিতকথা আর নাই বা শোনালেন!'

'নীলু, বাবার কথা মনে পড়ে?'

'তুমি কোনও খবর পাও না?'

'তোর কীরকম মনে আছে শুনি?'

'সেই যে একবার গেরুয়া-টেরুয়া পরে এসেছিল। রোজ রাত থাকতে আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দিত। চলে যাবার সময় মা গেরুয়া ফেলে দিয়েছিল। আমি অবশ্য বাবাকে খুব ভালো করে জানি না।' একটু হেসে বলল, 'আজকাল বসে বসে ডায়রি লিখি, সময় কাটানো আর কী, বাবার কথা একদিন ভাবছিলাম। বাবা কি আমার কথা জানে?'

'বাবা জানে তুই সন্ন্যাসী হয়ে গেছিস।' শুনে নীলু হো-হো করে হেসে উঠল।

মা বোধহয় ঋতুর আশায় রয়েছেন। মুরগির অপেক্ষা করছেন। জেল থেকে বেরিয়ে আমার সমস্ত মন যেন এলিয়ে পড়ল। কী রকম মনে হল আমার আর কোথাও যাবার নেই, আমার পথ শেষ হয়ে এসেছে, এবার বসে পড়লেই হয়। অদ্ভুত একটা ক্লান্তি না বিষাদ না বিরক্তি না বৈরাগ্য— কে জানে কী আমাকে পেয়ে বসেছে।

একটা খালি ট্যাক্সি দেখে উঠে পড়লাম। পার্ক স্ট্রিটের ঠান্ডা বারে ঢুকে বিয়ার নিয়ে বসে বসে সময় কাটাতে লাগলাম, যেন সময় কাটানোই এখন আমার সবচেয়ে বড় কাজ।

সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরতেই বাবার ভজন কানে এল। ভরাট, সুরেলা গলা। হিন্দি উচ্চারণও পরিষ্কার।

গান আসছে বাগানের দিক থেকে। এগোতেই চোখে পড়ল বাবা চোখ বুজে দুলে দুলে গাইছেন। মা পাশে বসে আছেন। ঠিক একটা মূর্তি। জ্যোৎস্নায় আমগাছের বউল চকচক করছে।

'আপনাকে চা দিই দাদাবাবু?' পিছনে লক্ষ্মী এসে দাঁড়িয়েছে।

বললাম, 'থাক, এখন আর চা খাব না।'

বাবার চোখ খুলে গেল। ভজন সমে এসে পৌঁছেছে, আমার দিকে চেয়ে থেকেই শেষ করলেন।

গান শেষ হতেই মা মুখ তুলে আমাকে দেখলেন। যেন ঘোর থেকে উঠে এলেন।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে এদিকে আসতে আসতে বললেন, 'ভাবাতেও পারিস বটে! গেলি তো গেলিই। সারাদিন একটা খবর পর্যন্ত নেই। ঋতুও এল না। খেলি কোথায়? ওর ওখানেই গিয়েছিলি বুঝি?'

কিছু না বলে আমি হাসলাম।

বাবা বললেন, 'অত ব্যস্ত হও কেন? সংসার তো মায়ের আঁচল নয়!'

আমি বললাম, 'আপনি এবার কতদিন থাকবেন?'

বলতে চেয়েছিলাম, এবার কিছুদিন থেকে যেতে পারেন না?

প্রথম প্রকাশ : শারদীয় যুগান্তর, ১৯৮৪

২ /// ধুলো

প্রণব নিজের স্টপে নামতে যাচ্ছে, মোটা মতো এক মহিলা তার পা মাড়িয়ে বাসে উঠতে উঠতে তাকেই শুনিয়ে দিলেন, যত ভিড়— সব গেটে, আশ্চর্য।

প্রণবের মাথায় রক্ত চড়ে গিয়েছিল, কিন্তু বাস থেকে নেমেই তার প্রধান কাজ মাটিতে পা ঠোকা। ফুটপাতের শানে সে ছ-সাতবার ঠপ-ঠপ করে পা ঠুকে-ঠুকে চটির ধুলো ঝাড়ল। তারপর তিন আঙুলে পাঞ্জাবির বুকের কাছটা ধরে খুব করে নেড়ে দিল। তারপর ধুতির কোচা ঝাড়ল। তারপর পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ ঘাড় গলা ঘষে ঘষে মুছে রুমালটা গুনে গুনে ঠিক পাঁচবার ঝেড়ে পকেটে রেখে সে ভাবল, এই সব অবিচারের প্রতিকার কী? গেটে দাঁড়িয়ে হাওয়া খাচ্ছিলাম নাকি!

বাজার পেরিয়ে তার বাড়ির গলি। বাজার মানে রাস্তার দুপাশে দাঁড়িপাল্লা আর আলু-কুমড়ো নিয়ে বসে যাওয়া। একটা লরি আসছে দেখে প্রণব পিছন ফিরে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে পড়ল। যা ধুলো ওড়ায়!

গলির মুখে পৌঁছেই বছরের প্রথম কালবৈশাখী। কাঁকর মুখে এসে বিঁধছে। দুহাতে চোখ ঢেকে প্রণব সিঁটিয়ে রইল। বাড়ি গিয়ে প্রথমেই ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে ধুতি পাঞ্জাবি ঝাড়া তার রোজকার অভ্যেস। আজ প্রায় পাঁচ

মিনিট সে জামা-কাপড় ঝাড়ল। তারপর সোজা বাথরুমে। কানে আঙুল ঢুকিয়ে চোখের সামনে নিয়ে দেখল, আঙুলে ধুলো। চৌবাচ্চায় জল নিচে গিয়ে ঠেকেছে। ঝুঁকে আঙুল ভিজিয়ে ভিজিয়ে নাক পরিষ্কার করল। চুলে মাথায় ভিজে হাত চালিয়ে সে প্রাণপণে নিজেকে ধুলোমুক্ত করে ঘরে ঢুকে দেখল, রমা নেই। পাশের বাড়িতে জোরে রেডিও চালিয়েছে, প্রণব গলা তুলে ডাকল, নির্মলা!

সেই যে দরজা খুলে দিয়ে কোথায় সেঁধিয়েছে, সাড়া নেই। আবার চেঁচায় নির্মলা! তুই কি বাড়ি আছিস না নেই?

নির্মলা হালুয়া আর চা নিয়ে ঘরে ঢোকে, চা এখানে দেব, না বারান্দায় খাবে?

—সেই কখন থেকে ডাকছি, শুনতে পাস না? তোর বউদি কোথায় গেছে জানিস?

—বিকেলে বেরিয়েছে। আমি বাথরুমে কাপড় কাচ্ছিলাম। বলে গেল, ফিরতে দেরি হলে তোমাকে হালুয়া করে দিতে।

—নর্দমায় ফেলে দে!

নির্মলা জানে, এসব রাগ গায়ে মাখতে নেই। টেবিলের ওপর বউদির ছাড়া জামা-কাপড়, কালকুট্টি ব্রেসিয়ার। চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে একহাতে ওগুলো সরিয়ে দিল। তারপর প্লেটটা রেখে বেরিয়ে গেল।

—শোন! ঝড়ের সময় রান্নাঘরের জানলা বন্ধ করেছিলি?

—না তো।

—ও, তবে তো ভালোই! একেবারে ধুলোর হালুয়া বানালেই পারতে! সুজি বেঁচে যেত।

রাগের মধ্যেই এক চামচ মুখে দিয়ে থু-থু করে ফেলে দেয়, ইশ! ধুলো কিচকিচ করছে।

—ও চিনির বালি। র‍্যাশনে এবার যা ময়লা চিনি দিয়েছে।

পাঁচ মিনিটের ঝড় কখন থেমে গেছে, চারদিকে শুধু ধুলোর গন্ধ। একা ঘরে চা খেয়ে সিগারেট ধরিয়ে প্রণব নিরুপায় পায়চারি করে। জানলা দিয়ে ধুলোর গন্ধ নাকে লাগছে। বাসের ভিড়, ঝড়ে পড়ে দুপুরের অপমান সে এতক্ষণ ভুলে ছিল, ধুলোর গন্ধে পারচেজের দিলীপ কুণ্ডুকে মনে পড়ে গিয়ে তার চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। শীত গ্রীষ্ম বারো মাস চওড়া টাই পরা কুণ্ডুসাহেবের সামনে নিজেকে সে এখন দারুণ শক্তিশালী কল্পনা করল। নেতাজি বা ওই রকম কারও মতো। অপমানে তার বুকের মধ্যেটা জ্বলছে। পায়চারি করতে করতে প্রণব দাঁত চেপে উচ্চারণ করল, শুয়োরের বাচ্চা!

রমা ফিরল ঠিক নটায়। ঘরে ঢুকেই ধপ করে বসে পড়ল। পা মাটিতে, কোমর থেকে শরীরটা ভেঙে সাবধানে বিছানায় উপুড় হয়ে হাত দিয়ে কপাল টিপে রেখেছে। মুখ না তুলেই বলল, কখন ফিরেছ?

ধুলোর খোঁটায় তার মাথায় রক্ত চড়ে গেছে। ছিয়াশি লক্ষ সত্তর হাজার তিনশো এগারো টাকা উনিশ পয়সার হিসেব মেলাতে আটত্রিশ পয়সার গোলমাল কার না হতে পারে তাও যদি অ্যাডিং মেশিন থাকত! এই সামান্য ভুলের জন্য ব্যাটা কুণ্ডু তাকে এক ঘর লোকের সামনে বলতে পারল, অ্যাকাউন্টস ছেড়ে সুইপারের কাজ করলেই আপনাকে ঠিকমতো মানায়। সারাদিন তো দেখি শুধু ধুলোই ঝাড়ছেন।

প্রণব সিগারেট ধরিয়ে টানতে থাকে। সাড়া না পেয়ে রমা মাথা তুলে ভুরু কোঁচকায়, তার চোখ হালুয়ার প্লেটে, একি, খাওনি?

— তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

— ডাক্তারের কাছে।

— আজ যাবার কথা ছিল?

— না, বাথরুমে পড়ে গিয়েছিলুম, খুব একটা লাগেনি, কিন্তু খুব ভয় হল, পেটে একটা চিনচিনে ব্যথাও হচ্ছিল—

— একা গিয়েছিলে?

— আর কে আছে, কাকে নিয়ে যাব?

একেকবার রাগের সময় নিজের বোনের নাম প্রণবের কিছুতেই মনে পড়ে না, একটু সেকেলে, সাধুভাষা-ঘেঁসা, শুধু এইটুকু তার মনে থাকে, ছোট কোনও ডাকনামও নেই, কখনও কল্যাণী, কখনও অপর্ণা, যখন যেটা মনে আসে নিঃসংশয়ে বলে দেয়। সিগারেটের ছাই ঝেড়ে বলল, শ্যামলীকে নিয়ে যেতে পারতে।

— তুমি ফিরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে?

— আমার জন্যই নাহয় অপেক্ষা করতে;

— কবে তুমি গেছ? একবারও তুমি নিজে আমাকে ভালো কোনও ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছ?

বিরক্তিতে উঃ বলে রমা মাথা নামায়। দু দিকের রগ টিপে ধরেছে।

— ওপর-ওপর দেখল, না শাড়িটাড়ি...

রমা মুখ তুলল না। তাতে প্রণবের রাগ আরও বেড়ে গেল। চেয়ার ঠেলে উঠে পড়ে সে আবার পায়চারি করতে লাগল। তার গলা প্রায় গর-গর করে উঠল, তোমরা মেয়েরা পারোও বটে।

দশ মিনিট পরে রমা উঠল। রান্নাঘর থেকে ঘুরে এসে হালুয়ার প্লেটটা অল্প একটু ঠেলে দিয়ে খুব আস্তে বলল, খাবার দেরি আছে, এটা খেয়ে নাও।

প্রণব তার পিঠের কাছেই দাঁড়িয়ে পড়ে, ওই ধুলোর পিণ্ডি আমি খাব না।

রমা হঠাৎ ঝেঁঝে ওঠে, সারাজীবন ধুলো-ধুলো করেই গেলে!

প্রণব প্রায় ভেংচায়, না— ধুলো জিব দিয়ে চাটব, ধুলোয় চিতিয়ে থাকব! শুধু মুখে সাবান মাখলেই হল, না?

ধুলোর খোঁটায় তার মাথায় রক্ত চড়ে গেছে। ছিয়াশি লক্ষ সত্তর হাজার তিনশো এগারো টাকা উনিশ পয়সার হিসেব মেলাতে আটত্রিশ পয়সার গোলমাল কার না হতে পারে তাও যদি অ্যাডিং মেশিন থাকত! এই সামান্য ভুলের জন্য ব্যাটা কুণ্ডু তাকে এক ঘর লোকের সামনে বলতে পারল, অ্যাকাউন্টস ছেড়ে সুইপারের কাজ করলেই আপনাকে ঠিকমতো মানায়। সারাদিন তো দেখি শুধু ধুলোই ঝাড়ছেন।

তার টেবিল সে দুবার ছেড়ে দুশো বার পরিষ্কার করবে, তোর বাপের কীরে শালা! মানুষের নাকে-মুখে ধুলো উড়িয়ে গাড়ি চড়ে বেড়ালেই তুমি কিছু মানুষের বাচ্চা হয়ে যাও না। কর্তাদের জুতোর ধুলো চেটে ওরকম অফিসার সবাই হতে পারে।

প্রণব ঘর ছেড়ে অন্ধকার বারান্দায় পায়চারি করছিল, রমাকে বাথরুম থেকে বেরিয়ে ঘরের দিকে যেতে দেখে বলল, ঘরে নার্স-টার্স কেউ ছিল, না ডাক্তার একাই সব দেখল?

রমা রাগে ছটফট করে ঘরে ঢুকে গেল। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে কুঁজো থেকে গেলাশে জল ঢালতে ঢালতে নির্মলাকে বলল, আমি খাব না। রান্না হলে তোর দাদাকে খেতে দিয়ে তুই খেয়ে নিস।

ঢকঢক করে জল খেয়ে ঘরে ফিরে আলো নিবিয়ে দিল।

প্রণবের তখন আরও রেগে উঠতে ইচ্ছে করছে। রাগে ফেটে পড়তে পারলে বাঁচা যায়। রেডিওয় রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুরোধের আসর হচ্ছে। তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে। মাথায়

রমার জন্য ছোটখাটো একটা নার্সিং হোমের ব্যবস্থা করা যায় না? কত টাকা লাগে? অফিসে লোন পাওয়া যাবে না? হাতে চার মাস সময়।
রেডিওয় তোমার চরণ ধূলায় ধূলায় শুনে প্রণব খুব শান্ত হয়ে ভাবল, সে অন্য ধুলো। কলকাতার ধুলোয় রবীন্দ্রনাথ একেবারে বেমানান। এই শহরে এখনও যে মানুষ জন্মায় সেটাই আশ্চর্যের।

রাগ নিয়েই সে গানটার দুয়েক কলি শুনল। এইসব গান এখানে মানায় না। কলকাতা একটা বিষাক্ত শহর। এর হাওয়ায় রাশি রাশি ধুলো। সেঁকো বিষ!

খুট করে আলো জ্বলে উঠল। নির্মলা টান-টান করে চুল বেঁধেছে, মুখে ঘাম। শাড়িতে হাত মুছতে মুছতে বলল, তোমার খাবার দিই?

— ফের শাড়িতে হাত মুছছিস? যা, আগে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে আয়।

আরও ছ-সাত বার বারান্দার এমাথা-ওমাথা করে প্রণব ক্লান্ত হয়ে ভাবল এতো রাগ নিয়ে মানুষ বাঁচে! রোজ সেই রাগ আর জ্বালা আর ক্লান্তি। সেই ধুলো আর অপমান। বারো মাস তিরিশ দিন ঠিক এক ছকে জীবন বয়ে চলেছে।

বারান্দার ওমাথায় পৌঁছে এই প্রথম তার তারা ভরা আকাশ চোখে পড়ল।

অন্যমনস্কভাবে এক পলক তাকিয়ে প্রণব গা-ঝাড়া দেবার চেষ্টা করল, না, আর এই তিতিবিরক্ত দিন কাটানো নয়, কালই একটা হিন্দি ফিল্ম দেখতে হবে। বন্ধুদের সঙ্গে এবার থেকে রোজ সে ব্রিজ খেলবে। ফ্ল্যাশ খেলে পয়সা করতে পারলে আরও ভালো। রমার জন্য ছোটখাটো একটা নার্সিং হোমের ব্যবস্থা করা যায় না? কত টাকা লাগে? অফিসে লোন পাওয়া যাবে না? হাতে চার মাস সময়।

রেডিওয় তোমার চরণ ধূলায় ধূলায় শুনে প্রণব খুব শান্ত হয়ে ভাবল, সে অন্য ধুলো। কলকাতার ধুলোয় রবীন্দ্রনাথ একেবারে বেমানান। এই শহরে এখনও যে মানুষ জন্মায় সেটাই আশ্চর্যের।

ভেজানো দরজা ঠেলে প্রণব ঘরে ঢুকল। অন্ধকার। চোখ সয়ে আসতে দেখল, রমা নিজের জায়গায় শুয়ে আছে। অন্ধকারেই সে রমার কপালে হাত রেখে আস্তে করে ডাকল, রমা।

সাড়া নেই।

— রমা! ওঠো! খাবে না? রমা, ও রমা—

রমা ঘুম ভেঙে উঃ করে উঠল, জড়ানো গলায় বলল, আমাকে একটু ঘুমোতে দাও।

— দেব, দেব। বলে হঠাৎ সে রমার কপালে চুমু দিল। তারপর দুহাতে তার মাথাটা ধরে কপালে গালে নাকে গলায় পাগলের মতো চুমু খেতে লাগল।

— আঃ! কী কর, ছাড়ো!

গলার স্বরে প্রণব মাথা ছেড়ে দিয়ে স্থির হয়ে গেল। খানিক ওই রকম বসে থেকে বলল, ডাক্তার কী বলল? কোনও ড্যামেজ হয়নি তো?

রমা বাহুতে চোখ ঢেকে ছিল, হাত না সরিয়েই বলল, হলে তো বেঁচে যেতাম।

— সে কি! তুমি ছেলে চাও না?

রমা চুপ করে রইল। প্রণব পুরোপুরি বিষণ্ণ গলায় বলল, রমা, রাগ করে থেকো না। সারাদিন আমি একটা খ্যাপা কুকুর হয়ে ঘুরে বেড়াই। তারপর তুমিও যদি—

ছেলেবেলা থেকেই প্রণবের অভ্যেস, বাক্য শুরু করলে শেষ করবেই। বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে তার সেই ক্ষমতা কমে আসছে জেনেও সে এখনও খুব চেষ্টা করে। আজ কথা শেষ না করে আস্তে উঠে গিয়ে চেয়ারে বসল। হাত বাড়িয়ে আলো জ্বালিয়ে সে একটা সিগারেট ধরাল।

চোখে আলো লাগতে রমা দেওয়ালের দিকে ফিরে শুলো।

পিছন ফিরে তার শুয়ে থাকার ভঙ্গিটি ভারি সুন্দর। ঢেউয়ের মতো গড়ন। হাঁটু মুড়ে শুয়েছে। প্রণব সিগারেট খেতে খেতে আলগাভাবে চেয়ে থাকে। পায়ের কাছে শাড়ি উঠে গেছে, এক পায়ের গোছ দেখা যায়। হঠাৎ তার চোখ জ্বলে ওঠে। বাইরের শাড়ি বদলেছে, শায়া পালটায়নি। লেসের কাছটা ধুলোয় কালো হয়ে আছে।

প্রণব রাগ চাপবার চেষ্টা করে, একি, রাস্তার শায়া নিয়ে বিছানায় উঠেছো!

রমা হয়তো ঘুমিয়ে গেছে, কিংবা ইচ্ছে করেই সাড়া দিল না।

প্রণব প্রাণপণে রাগ চাপে, রমা, ওঠো শায়াটা ছেড়ে ফ্যালো। রাস্তার ধুলো একেবারে কামড়ে বসেছে।

রমা নড়ল না। প্রণব একলাফে বিছানার কাছে এসে গর্জন করে উঠল, ওঠো, ওঠো বলছি! বিছানায় রাস্তার কাঁচা ধুলো লেপে না দিলে মন ভরে না, না? প্রণব মারবে বলে হাত তোলে।

রমা ঝটকা দিয়ে উঠে বসে বিছানা ছেড়ে ঘরের কোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অল্প অল্প হাঁফাচ্ছে।

শাদা চাদরে চোখ রেখে প্রণব গজগজ করে, আর কদিন পর এখানে একটা বাচ্চা শোবে, সেটা পর্যন্ত খেয়াল থাকে না। এমনিতেই ধুলো বাঁচিয়ে চলা প্রায় অসম্ভব, শহরময় শুধু ধুলো আর ধুলো, একেবারে সেঁকো বিষ!

রমা ঘরের কোণ থেকে ফুঁসে ওঠে, ওই ধুলো ধুলো করেই মরো! বাচ্চা শোবে! কী খাওয়াবে তার ঠিক নেই, একটা ডাক্তার দেখাবার মুরোদ নেই, শুধু ধুলো ধুলো করে নাচলেই হল! বোনটাকে তো ঝি বানিয়ে ছেড়েছো!

প্রণব এত উসকানিও উপেক্ষা করল। আগে বিছানাটা ঝাড়তে হবে। সে ঘরে পরার ধুতি নিয়েও কখনও বিছানায় ওঠে না। খালি গায়ে, শুধু আন্ডারওয়্যার পরে শোয়াই তার অভ্যাস। দুটো হ্যাঁচকায় ধুতি খুলে ফেলে সে বিছানায় উঠল। হাঁটু মুড়ে ঘুরে ঘুরে দু-হাত দিয়ে বিছানার চাদর পরিষ্কার করতে করতে অনেকটা আপনমনে বলল, ঘুষখোর কুত্তাটা না মরলে আমার আর প্রমোশনের আশা নেই।

দু-হাতের পাতা ধুলোয় কিচকিচ করছে। গা শিরশির করে ওঠে। পাছে গায়ে লেগে যায়, হাত-দুটোকে সাবধানে তুলে ধরে বাথরুমের দিকে যেতে যেতে প্রণব ফিরে দাঁড়াল, ডাক্তার দেখাচ্ছি না তো কী! ডাক্তারের কাছে আজ যাওনি তুমি?

— তুমি টাকা দিয়েছ? এই তিনবারের একবারও তুমি টাকা দিয়ে গিয়েছিলে আমায়?

রমা উল্টোদিকে মাথা দিয়ে বিছানায় ধপ করে শুয়ে পড়ে থরথর করে কেঁদে উঠল, বিনা পয়সায় দ্যাখে, পরীক্ষার ছুতো করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা—

কান্নায় খাটসুদ্ধু নড়তে থাকে।

প্রণব হাতের ধুলো ভুলে দৌড়ে এসে রমার পিঠে হাত রেখে একদম বোবা হয়ে থাকে। তার হাত রমার পিঠে ঝাঁকুনি খায়। ওই রকম বসে থেকে একসময় প্রণব তার ধুলোমাখা হাতের পাতায় মুখ ঢেকে ফস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

প্রথম প্রকাশ : আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯

কবিতা-পরিচয়

একাদশী: বিষ্ণু দে

অরুণ সেন

তোকে দেখি, মেয়ে, মনে মনে হয় ভয়
শৈশবের শেষে যেন আসন্ন জীবন
ছেয়ে না ফেলে রে তোর আনন্দতন্ময়
অঙ্গের লাবণি আর বিহঙ্গম মন।

দুই চোখে টলোমলো আকাশের ছুটি,
কখনো সফরী ছোটে, কখনো খঞ্জনা,
কুঞ্চিত কুন্তল দেখে ভ্রমর ভ্রূকুটি,
হৈমবতী সারা গায়ে মেজে দেয় সোনা।

তোকে দেখি; হাত রাখি মাথায় আদরে
আর হয় অনায়ত্ত জীবনের ভয়।
একাদশী! রৌদ্রে জলে বালিতে পাথরে
আজীবন সদ্যশুচি থাকিস্ তন্ময়।।

বারো লাইনের ছোট কবিতাটিতে 'তোকে দেখি', 'ভয়', 'জীবন', এবং 'তন্ময়' এই শব্দগুলি দুবার করে ব্যবহৃত হয়েছে (প্রকৃতপক্ষে প্রথম লাইনেই এই ভয়ের কথা উচ্চারিত হয়েছে)। সমস্ত কবিতাটিরই বক্তব্য বা অভিজ্ঞতা এই চারটি শব্দ বা শব্দগুচ্ছকে আবর্তন করেই গড়ে উঠেছে। এমনকি এও বলা যায় যে কবিতাটির পিছনে যেন একটা 'ভয়' সব সময় কাজ করেছে, কন্যার জন্য পিতার ভয়— কবিতাটির শব্দগুলি কিংবা বাক্যরীতিও যেন এই আশঙ্কার তাড়নায় অতি সতর্ক ভাবে, থেমে থেমে, খুব গাঢ়ভাবে উচ্চারিত হয়েছে।'ছেয়ে না ফেলে রে তোর', 'হাত রাখি মাথায় আদরে', 'শৈশবের শেষে যেন', ইত্যাদি বাক্যাংশের সন্তর্পণ উচ্চারণেও এই ভয় বা আশঙ্কা বিস্তারিত হয়েছে, সঞ্চারিত হয়েছে পাঠকের মনে।

'আলেখ্য' কাব্যগ্রন্থের এই ছোট কবিতায় প্রার্থনার আকারে যা প্রকাশ করা হয়েছে, তা-ই বলা হয়েছে অন্য একটি কবিতায় অন্যভাবে: 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখে'র 'বামী' নামক কবিতাটিতে। 'একাদশী' কবিতার আঁটোসাঁটো ভাবটির বদলে 'বামী' কবিতাটি গল্পের চালে বলা, অনেক শিথিলবিন্যস্ত— কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্য থেকে গৃহীত এবং রূপান্তরিত বিষ্ণু দে-র বামী এবং একাদশী আসলে একই মেয়ে। কবিতার নীচে রচনাকাল দেওয়া নেই, তবু কবিতা দুটি নিশ্চয়ই কাছাকাছি সময়ে লেখা— যেহেতু 'আলেখ্য' ১৯৫২-৫৮ সালে এবং 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ' ১৯৫৫-৬০ সালে রচিত এরকম উল্লেখ 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় আছে। শুধু কাছাকাছি সময়ে রচিত বলেই নয়, কবিতা দুটির মধ্যে যাকে বলা হয় বিষয়বস্তু, তার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। অথচ এক বিষয়বস্তু, অথবা বলা ভালো এক অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ দুই জাতের কবিতার জন্ম দিয়েছে। কিন্তু কবিতা দুটি মিলিয়ে পড়ার প্রস্তাব আমি করছি এবং বিষ্ণু দে-র নানা সুরের বা মেজাজের একটি দিক এখানে পাওয়া যাবে বলে মনে করছি। ওই 'বামী' কবিতাতেও 'ভয়ে'র কথা, 'অনায়ত্ত জীবনে'র কথা, তার তন্ময় ও ভাস্বর 'সত্তা'র কথা আছে ('সত্তা' শব্দটি বিষ্ণু দে-র কবিতায় বহুল ব্যবহৃত ও বিশেষ অর্থবহ, আপাতত তার আলোচনার প্রয়োজন নেই)— অর্থাৎ আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, আমাদের সচেতন প্রতিক্রিয়ার কথা আছে, কিন্তু সেখানেও মূল যে অভিজ্ঞতার তাড়না সর্বাধিক, সে হচ্ছে এই 'ভয়'। কবিতাটির কিছু অংশ উদ্ধৃত করলাম:

> জীবনের অন্ধকারে কাটাবে জীবন
> উপরে সিঁড়িতে নিচে কণ্টকিত ভয়ে,
> যেখানে আরশোলা চাটে বই ছবি,
> মাকড়শা ছড়ায় জাল,
> আর টিকটিকি আরশোলা খায়,
> যেখানে নির্মাতা, স্রষ্টা, শিল্পী, কবি,
> প্রেমী অবজ্ঞেয়;
> ভয়াবহ হেয় জীবনের ঘেঁষাঘেঁষি
> সেই অন্ধকারে ভাবি আমি
> ছোট্ট মেয়ে বামী কি করে যে বড়ো হবে...

কবিতাটি শুধু এই 'ভয়'কে আরও ব্যাখ্যা করেছে, বর্ণনা করেছে। এই ভয় 'জীবনের অন্ধকারে'র জন্য, যে 'ভয়াবহ হেয় জীবন'এর একটি রূপকচিত্র তিনি এখানে উপস্থিত করেছেন। 'একাদশী' কবিতাতেও সেই অভিজ্ঞতা বা কল্পনাই সংহত হয়েছে দুটি অতি সংক্ষিপ্ত শব্দযুগ্মে: 'আসন্ন জীবন' এবং 'অনায়ত্ত জীবন'— এই শব্দযুগ্ম দুটিতেই তাঁর আশঙ্কা ও ভয় যেন তীব্রতম হয়ে উঠেছে— সেই জীবনের কোনও বর্ণনা বা চিত্ররচনার প্রয়োজন হয়নি (সামগ্রিকভাবেই নিপুণ সংযম 'একাদশী' কবিতার বড় গুণ)। বিশেষ করে 'আসন্ন জীবন' এবং 'অনায়ত্ত জীবন' শব্দদুটির মাত্র উল্লেখে একটি অজানিত ভয় যেন নাটকীয় তীব্রতা লাভ করেছে, উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়েছে।

অবশ্য সমস্ত 'ভয়'ই যে কবির তীব্র মমতা ও জীবনানুরাগ থেকেই আসছে, তাও আমাদের বুঝতে একটুও দেরি হয় না, যখন 'তোকে দেখি; হাত রাখি মাথায় আদরে'র মতো বাক্য আসে, কিংবা সহজ সরল শব্দগুলির মধ্যে 'অঙ্গের লাবণি', 'বিহঙ্গম মন' ইত্যাদির মতো গৌরবজনক শব্দ আদৃত হয়। এবং সর্বোপরি আছে দ্বিতীয় স্তবকের চারটি লাইন।

অনাগত ভবিষ্যতের জন্য অর্থাৎ 'অনায়ত্ত জীবন'-এর জন্য কবির এই যে ভয়, তার মূলে আছে বর্তমান সম্পর্কে, কঠিন বাস্তব সম্পর্কে তাঁর

সচেতনতা— 'বামী' কবিতায় তার স্পষ্ট বিবৃতি আছে— কিন্তু 'একাদশী'তে চারটি শব্দের মধ্যে এই বর্তমানের ও প্রত্যক্ষ বাস্তবের কথা মূর্ত করা হয়েছে একাদশ লাইনে— 'রৌদ্রে জলে বালিতে পাথরে'। আমাদের দেশের প্রকৃত সত্তা বলতে তিনি এই 'রৌদ্রে জলে বালিতে পাথরে' যে-বর্তমানের জন্ম হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে, তাকেই বুঝিয়েছেন সমগ্র জীবন ধরে বহু কবিতায়। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত'এর কয়েকটি লাইন:

বর খুঁজে ফেরে সত্তা আত্মপরিচয়
মাঠে গঞ্জে শহরে বন্দরে খোঁজে সে আপন সত্তা, সনাক্তিকরণ
দশের দর্শনে, সমাজের আতশী ফলনে
পায় না আপন সত্তা, যা শুধু ফুলের মতো
ফুটে ওঠে রৌদ্রজলে, ছায়ায় মাটিতে
শিকড়ের শাখার পাতার প্রাকৃতিক অর্কেস্ট্রায়,
সত্তা যার নিহিত মাটিতে রৌদ্রে জলে শিকড়ে শাখায়,
এমনকি ফুলদানিতে সাজানো হ'লেও।...

('বর' হচ্ছে এখানে বরবধূমিলনের সুখী ভবিষ্যতের অনুপস্থিত সত্তা) এই ধরণের বহু লাইন অনুষঙ্গ হিসেবে মনে পড়ে, 'রৌদ্রে জলে বালিতে পাথরে' এই চারটি শব্দ যখন কবিতায় এসে যায়। কিন্তু এই জটিল এবং কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হওয়ার জন্য যাকে বিষ্ণু দে বারবার বলেছেন 'সত্তার সন্ধান', তা কি সম্ভব হবে একাদশীর পক্ষে, বামীর পক্ষে, আমাদের উত্তরপুরুষের পক্ষে? কবির এই তীব্র উৎকণ্ঠা এবং আশঙ্কাই কবিতাটিকে জন্ম দিয়েছে।

একদিকে বাস্তব, একদিকে 'ভয়াবহ হেয় জীবন'— অন্যদিকে 'আনন্দতন্ময় অঙ্গের লাবণি': কবি শুধু ভয়ই করতে পারেন, আদরে মাথায় হাত রাখতে পারেন, প্রার্থনা জানাতে পারেন, 'অন্ধকার দীপান্বিত' করার উপায় নির্দেশ করতে পারেন। শেষ লাইনটি তারই নির্দেশ, কবির সিদ্ধান্ত— 'আজীবন সদ্যশুচি থাকিস তন্ময়'। শেষ লাইন দুটিই হচ্ছে সমগ্র কবিতার অন্য একটি পরিপ্রেক্ষিত— বাস্তবের ভয়াবহ পটভূমিতে মানুষের জয়ী হওয়ার সাধনার উপায়। এই 'তন্ময়' শব্দটি তিনি আরও আগে একবার ব্যবহার করেছেন— প্রথম স্তবকের তৃতীয় লাইনে। যে আনন্দতন্ময়তা একাদশীর আজ আছে, সে তন্ময়তাই যেন সে রক্ষা করে চলে। 'আসন্ন জীবন', 'ভয়াবহ হেয় জীবন' এই তন্ময়তাকে নষ্ট করে দিতে চায়। তাই সেই জীবনের পরাজয় এড়াতে হলে, বাস্তবকে, আপন সত্তাকে খুঁজে পেতে হলে 'আজীবন সদ্যশুচি' এবং 'তন্ময়' থাকতে হবে। এই সজীবতা ও শুচিতারক্ষাই হচ্ছে মানুষের সামনে চ্যালেঞ্জ। এই শুচিতার অভাবই বর্তমানের হেয় জীবনে, একাদশীর আসন্ন জীবনে ওঁত পেতে আছে— তার বিরুদ্ধে নিজের মৌলিক শুচিতাকে রক্ষা করাই উত্তরপুরুষের সংগ্রাম। তন্ময়তার অভাবে এই শুচিতার বিকারকে, দ্বন্দ্বদীর্ণ ক্ষতকে কোনওমতেই এড়ানো যাবে না।

'একাদশী' কবিতাটিকে একটি 'প্রার্থনা' বলা যায়— কন্যার জন্য পিতার, উত্তরসূরির জন্য অভিজ্ঞ প্রাচীনের প্রার্থনা। কারও মনে পড়ে যেতে পারে ইয়েটসের 'A prayer for my daughter' কবিতাটি— শুধু নামের জন্য নয়, মেজাজের দিক থেকেও। প্রার্থনার মন্ত্রের মতোই কবিতাটি সংক্ষিপ্ত, শান্ত, উজ্জ্বল এবং মাঝে মাঝেই স্বচ্ছ ও প্রত্যক্ষ প্রকাশভঙ্গির মধ্যে 'অঙ্গের লাবণি', 'বিহঙ্গম মন', 'কুঞ্চিত কুন্তল'এর মতো শব্দগুলি কবিতাটির মধ্যে গাম্ভীর্যের আমদানি করেছে। এই জিনিসটাই প্রথমত চোখে পড়ে; সমস্ত বক্তব্যের মধ্যে সহজ ও আপাতভাবে হালকা চাল— অথচ কয়েকটি শব্দের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পরিস্থিতির অতিশয় গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করানো হয়েছে। এই প্রার্থনার ভঙ্গিই হচ্ছে কবিতাটির মূল লক্ষণীয় বিষয়। বলা বাহুল্য, যুগ সম্পর্কে সচেতনতা ও আগ্রহই এই প্রার্থনার প্রেরণা।

এই সহজ প্রার্থনার মধ্যে দুর্বোধ্যতার এক 'অস্বস্তিকর' অভাব রয়েছে, যা হয়তো এই ধরণের কবিতাকেন্দ্রিক আলোচনার পক্ষে নিরুৎসাহজনক। কিন্তু এই পরিমিত আয়তনের কবিতার মধ্যে এমন একটি আগ্রহ বা টান বর্তমান রয়েছে, যা কবিতার বাহ্য অর্থকে অতিক্রম করে পাঠককে বিশেষ অনুপ্রাণিত করে। পিতার এই প্রার্থনার মধ্যে যুগ সম্পর্কে বোধ ও মগ্নতা এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ এমন গভীরভাবে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে যে, কবিতার মধ্যে একটি অতিরিক্ত গতি বা চাপের সঞ্চার হয়েছে। সেখানেই কবিতাটির সততা, অর্থাৎ অভিজ্ঞতার সততা।

কোনও একজন কবির একটি কবিতা নির্বাচন করা বড়ই মুশকিল, তা সে কবি যতই প্রিয় হোন কিংবা সময়বিশেষে তাঁর কোনও একটি কবিতা পাঠককে যতই আন্দোলিত করে থাকুক। বিষ্ণু দে-র সর্ব সময়ের পাঠকমাত্রই জানেন, তাঁর কোনও কোনও কবিতা যেমন দীর্ঘ, তার অন্বয় বিশ্লিষ্ট ও বিক্ষিপ্ত, তার আবেগ প্রগলভ ও বিস্তারিত— তেমনি অন্য এক জাতের কবিতা ছোট মাপের, প্রত্যেক লাইনের শেষে ছেদ ও যতি সুষমভাবে বিন্যস্ত। প্রথম জাতের কবিতা যেন ফ্রেম থেকে বেরিয়ে আসতে চায়, দ্বিতীয় জাতের কবিতা ফ্রেমের অভ্যন্তরে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুস্থির। দ্বিতীয় ধরণের কবিতাই তিনি বেশি করে লিখতে শুরু করেছেন 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' থেকে। অবশ্য 'একাদশী' কবিতাটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতা হলেও এবং বাহ্যত কবিতাটি বেশ শীতল ও প্রশান্ত মনে হলেও, এর মধ্যে যে একটা উত্তাপ প্রচ্ছন্ন রয়েছে, সে কথা আগেই বলা হয়েছে।

প্রথম স্তবকে শৈশবের কথা চকিতে বলা হয়েছে, কিন্তু প্রধান হয়ে উঠেছে 'আসন্ন জীবন'এর ভয়। দ্বিতীয় স্তবকে সেই শৈশবের কথাই চার লাইনের কয়েকটি ছোট ছোট, শান্ত, প্রায় মার্কিন কবিতার ধরণের পরিচ্ছন্ন ছবির সাহায্যে বিস্তারিত করা হয়েছে, যদিও এই বিশেষ অলঙ্কারগুলি অনেকাংশেই প্রথাসিদ্ধ। একাদশী বালিকার প্রতি কবির মমতা ও 'আদর' ছড়িয়ে আছে কবিতায় 'অঙ্গের লাবণি'র মতো ব্রজবুলি শব্দ কিংবা 'বিহঙ্গম মন'এর মতো প্রগাঢ় শব্দের শুশ্রূষায়। প্রথম স্তবকের শেষ দুটি লাইনে শৈশবের আনন্দতন্ময়তা ও স্ফূর্তি এবং দ্বিতীয় লাইনে 'আসন্ন জীবন' এমনভাবে রাখা হয়েছে যে, মাঝখানের 'ছেয়ে না ফেলে রে তোর' বাক্যাংশ যেন সত্যি ছেয়ে ফেলার জন্যই দুই লাইনের বিপরীত জগতের সীমা নির্দেশ করছে এবং 'আসন্ন জীবন' শব্দ দুটিই সাক্ষাৎ ভয়ের মতো উপস্থিত রয়েছে। আমি তো অন্তত কবিতাটি যখনই পড়ি, তখন 'আসন্ন জীবন' শব্দযুগ্মটি আমার মধ্যে অস্বস্তি তৈরি করে এবং শেষ স্তবকের 'অনায়ত্ত জীবন' আমাকে আরও ভীত করে তোলে।

দ্বিতীয় স্তবকের ছবিটি নিটোল এবং প্রসন্ন। এখানে শব্দব্যবহার এতই চিত্ররচনার সহায়ক যে, প্রথম লাইনে 'টলোমলো', 'আকাশের ছুটি' একটা বিস্তার এনে দেয়; দ্বিতীয় লাইনে 'সফরী' ও 'খঞ্জনা'র গতিচাঞ্চল্য মাঝখানের ছেদচিহ্নে স্পষ্ট; তৃতীয় লাইনে 'কুঞ্চিত কুন্তল' ও 'ভ্রমর ভ্রূকুটি'র অনুপ্রাস এবং উ-কারের পুনরাবৃত্তিতে সত্যি সত্যিই একটি বিবাদের সম্ভাবনা এবং চতুর্থ লাইনে আবার প্রথম লাইনের সেই ছড়ানো উচ্চারণ ছবিটাকে সম্পূর্ণ করে। 'হৈমবতী', 'মেজে দেয়', 'সোনা' শব্দগুলি একটি ঘরোয়া ভঙ্গি আনে, যা সমস্ত চিত্রেরই ফলশ্রুতি।

দ্বিতীয় স্তবকের এই অবসর বিনোদনের পর তৃতীয় স্তবকে আবার সেই পুরনো 'ভয়'। এখানে প্রথম লাইনের মাঝখানের বিরতি স্পষ্ট অনুভব করায় বৃদ্ধের আশীর্বচন ও শুভকামনা এবং দ্বিতীয় লাইনের 'আর হয়...' এই

প্রবহমানতায় অনিবার্যভাবে চলে আসে 'অনায়ত্ত জীবনের ভয়'— এই মমতা এবং ভয় সন্নিবেশিত হয়েছে পরপর দুলাইনে— এ দুটোই কবিতার মূল সুর, সম্ভবত একই অভিজ্ঞতা থেকে জাত, কিংবা পরস্পরের কারণ ও পরিণাম।

বিষ্ণু দে-র 'একাদশী' কবিতার আলোচনাটিতে একটি তথ্যের অভাব 'কবিতা-পরিচয়ে'র দুজন শ্রদ্ধেয় পাঠক, শ্রীবুদ্ধদেব বসু ও শ্রীঅম্লান দত্ত আমাদের জানিয়েছেন; যদিও এঁরা দুজনেই 'একাদশী' ও তার আলোচনাটির প্রশংসায় অকৃপণ। 'একাদশী'র আলোচক শ্রীঅরুণ সেনকে আমি বিষয়টি জানালে তিনি একটি চিঠিতে তাঁর বক্তব্য জানান। সেটি এখানে প্রকাশ করা হল।— সম্পাদক

গত সংখ্যায় আমার আলোচিত বিষ্ণু দে-র 'একাদশী' কবিতাটির পিছনে জার্মান কবি হাইনের একটি কবিতার প্রেরণা আছে, আপনি এরকম জানিয়েছেন। উল্লিখিত কবিতাটি ('Du bist wil line Blume') বিষ্ণু দে স্বয়ং অনুবাদ করেছেন (দ্রষ্টব্য: হে বিদেশী ফুল, পৃ ১২) এবং আরও আগে করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সুতরাং 'একাদশী' কবিতাটি রচনাকালে হাইনের কবিতার অনুষঙ্গ থাকা মোটেই অসম্ভব নয়। কিন্তু এ-ঘটনার ওপর অধিক জোর দেওয়া যে অসংগত, তা কবিতা দুটি মিলিয়ে পড়লেই বোঝা যায়। *বড় জোর বলা যায়— 'তোকে দেখি; হাত রাখি মাথায় আদরে' লাইনটিতে প্রায় আক্ষরিক মিল সত্ত্বেও— বলা যায়, হাইনের কবিতার অনুষঙ্গ নির্ভর করে একটি সম্পূর্ণ মৌলিক (এবং আমার মতে সার্থকতর) কবিতা বিষ্ণু দে কী করে লিখেছিলেন, তার দৃষ্টান্তস্থল হয়ে রইল এটা। অবশ্য সমালোচনার সম্পূর্ণতার দিক থেকে হাইনের কবিতাটির উল্লেখ আমার করা উচিত ছিল। আগে পড়া থাকলে নিশ্চয় করতাম। ইতি— অরুণ সেন

*পাঠকের প্রয়োজনের কথা ভেবে বিষ্ণু দে কৃত অনুবাদটি পুনর্মুদ্রিত করা হল:

তুমি যেন এক ফুল
নম্র শুচি ও সুন্দর।
আমি চেয়ে থাকি আর
বিবাদে বিধুর অন্তর!
মনে হয় হাত রাখি
তোমার মাথায় কম্প্র,
বিধাতাকে বলি থাকো
সুন্দর শুচি নম্র।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
কবিতা-পরিচয়, পঞ্চম-ষষ্ঠ যুক্তসংকলন
(মাস-সাল অনুল্লিখিত)

কবিতা-পরিচয় প্রশ্নমালা

নীচের প্রশ্ন-ক'টি পাঠিয়ে বাংলা ভাষার বিভিন্ন কবিকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল, তাঁরা যেন পৃথক-পৃথকভাবে অথবা একসঙ্গে জড়িয়ে প্রশ্নগুলির উত্তর লেখেন।
—সম্পাদক

১। আমাদের দেশে এখনকার তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক সচেতনতা ও তীব্র সামাজিক অস্থিরতা কবিতা লেখার সময় আপনাকে প্রভাবিত করছে বলে আপনার মনে হয়? যদি করে, কীভাবে?

২। অত্যধিক রাজনৈতিক সচেতনতার ফলে সম্প্রতি বাংলাদেশে কবিতা সম্পর্কে উদাসীনতা এসেছে বলে আপনার মনে হয়? অথবা কবিতাই ক্রমে সমাজবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বলে আপনি মনে করেন? বাংলার সমাজমানসে বাংলা কবিতার প্রভাব কী রকম বলে আপনি মনে করেন?

৩। কবিতায় আপনি যে-ভাষায় কথা বলেন তার সঙ্গে মুখের ভাষার কোনও বিরোধ আপনি কি কখনও অনুভব করেছেন? কবিতার ভাষাকে আপনি কি মুখের ভাষার কাছাকাছি রাখবার পক্ষপাতী? অথবা কবিতার এক নিজস্ব ভাষা-নির্মাণই আপনার লক্ষ্য? কবিতার ভাষা জনসাধারণের ভাষা নয় বলে সাধারণ মানুষের যে-অভিযোগ তাকে আপনি কীভাবে দেখেন?

৪। জনসাধারণের জীবনযাপনের সমস্যা বা সমসাময়িক প্রসঙ্গ কবিতায় সঞ্চারিত হলে, বা তা নিয়েই লিখলে, কবিতা কি আরও বেশি লোককে আরও গভীরভাবে আকৃষ্ট করবে বলে আপনি মনে করেন?

৫। এখনকার এই সময় কবিতা লেখার পক্ষে অনুকূল বা প্রতিকূল মনে হয় আপনার?

উত্তর লিখেছেন: শঙ্খ ঘোষ

১। সামাজিক অস্থিরতার বোধ থাকে কবিতার মজ্জায়, আজ দেখছি কখনও কখনও তা ভেসে উঠতে চায় শরীরে। জানি না, হয়তো এইটেকেই বলা যায় সময়ের প্রভাব, কেননা এতো শারীরিক চিহ্নের বাহুল্য আমি চাইনি।

২। সমাজমানস? কিন্তু কাকে বলে বাংলার সমাজ? বাংলার কি একটাই সমাজ? একটাই মন?

হালকা একটি ইংরিজি কোষগ্রন্থে লেখা আছে, এ-দেশের কৃষকেরা নাকি রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে গাইতে খোলা মাঠে ধান কাটে। ইয়েট্‌সও একদিন ঐক্যময় এক বঙ্গসংস্কৃতির কল্পনা করেছিলেন গীতাঞ্জলির ভূমিকায়। অলীক কল্পনা, অলীক কৃষক। সত্যের ছবি হল আরেকরকম। সেদিন এক সেলুনে কাঁচি চালাতে চালাতে রেডিয়োর রামপ্রসাদী শুনছিলেন তদগত কয়েকজন। কিন্তু ঘোষক যখনই বললেন 'এবার রবীন্দ্রসংগীত'— অমনি তাঁরা বিরক্ত হাতে ঘুরিয়ে দিলেন চাবি। এইরকমই আজ হওয়ার কথা।

ছিন্ন এই সমাজকে এক-মুঠোয় ধরবার মতো আয়োজন কবিতা থেকে স্খলিত হয়ে গিয়েছে অনেকদিন। অনেকদিন ধরেই কবিতা একটা ছোট সমাজের কাণ্ড, অল্পলোকেই তা পড়ে। আজ যে তারও চেয়ে নতুন কোনও উদাসীনতা দেখা দিয়েছে, আমি তো অন্তত সেটা ধরতে পারছি না।

৩। নদীর জল ঘড়ায় নিলে সে কি একই জল থাকে? নদী কি তাকে নিজের বলে চিনতে পারে আর? আধারের বদল হলে বিন্যাসও বদলে যায়।

মুখের ভাষা আর কবিতার ভাষায় যদি কোনও ভিন্নতা না থাকে তো কবিতা লিখবার দরকার কী? মুখের ভাষা আর কবিতার ভাষা যদি একেবারে ভিন্ন হয় তো কবিতা লিখবার মানে কী? দুয়ের মধ্যে এই মিল-অমিলের দ্বন্দ্বে তৈরি ভাষা, তাকেই বলি কবিতার ভাষা। নদীর মতো, সাধারণ মানুষও তখন তাকে আর নিজের বলে চিনতে পারে না, হয়তো-বা অভিযোগ করে।

৪। জীবনযাপনের সমস্যা নিয়েই তো লেখা হয় কবিতা। বলবার ভঙ্গিতে সেটা আর ঠিক সে-রকম শোনায় না হয়তো। না, বিষয় পাল্টে নিলেই যে বেশি পাঠক তৈরি হবে এমন আশা কম।

৫। কোনও সময়ই কবিতা লিখবার পক্ষে প্রতিকূল নয়। আর চারদিকটা যদি এমন হয়ে ওঠে যে আপাত চোখে তাকে মনে হয় বাধা, কবিতার পক্ষে সে তো আরোই ভালো। সময়ের সঙ্গে এই সংঘর্ষ থেকেই কবিতা তার স্ফুলিঙ্গ পেয়ে যায়, সমস্ত শরীর নিয়ে জেগে ওঠে কবি।

কিন্তু আমি যদি না পারি সে হল আমারই অক্ষমতা, সময়ের কোনও অপরাধ নয়।

কবিতা-পরিচয়, দ্বাদশ সংকলন, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৭

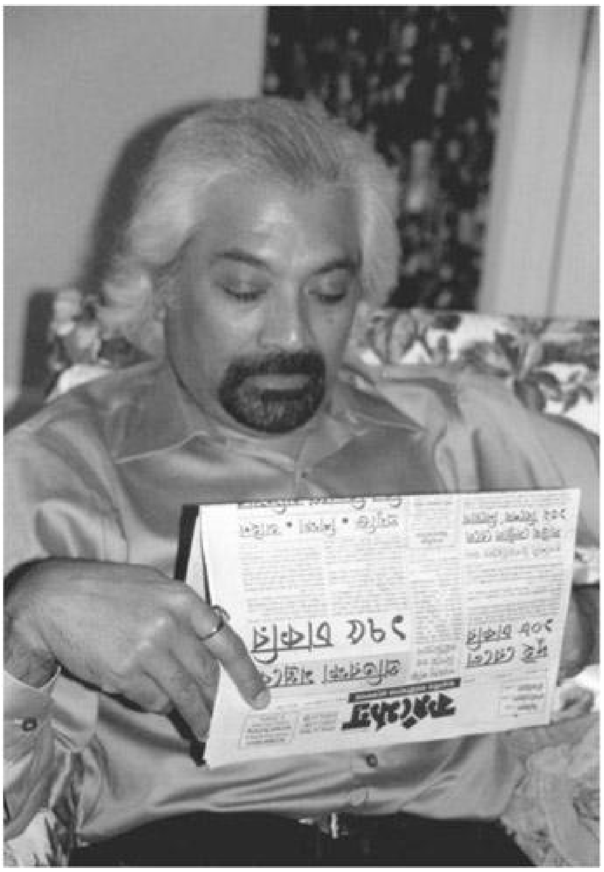

সাম পিত্রোদা: আমেরিকার ওয়ার্ল্ড টেল লিমিটেডের কর্ণধার, আঁত্রেপ্রেনারশিপ ও টেলি-কমিউনিকেশনস্‌-এ বিশ্ববন্দিত ব্যক্তিত্ব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বিভিন্ন কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা। ভারত সরকারের টেলিকম কমিশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। 'রিসার্জেন্স অব বেঙ্গল' কর্মসূচির উপদেষ্টা।

‘একবার ভেবে দেখুন গোটা ভারতকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতেই কত রকম যোগ্যতার কত লোকের দরকার। এরকম আরও নানা ক্ষেত্রে, ধরুন কৃষিনির্ভর শিল্প ফুড প্রসেসিংয়ে, লক্ষ লক্ষ কাজ আছে। আপনি 'কর্মক্ষেত্র'-য় প্রকাশিত যেসব কর্মপরিকল্পনার কথা বললেন, যেমন পাকা তেঁতুল প্যাকেট করা, বা তরমুজের রস বোতলবন্দী করা, কিংবা পাটের জিনিসপত্র বানানো— এগুলো তো গ্রামে গ্রামে শুরু হওয়া দরকার। উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইনফরমেশন টেকনোলজির সুফল এইসব কাজেও প্রয়োগ করা উচিত। সরকারের ভূমিকা এইখানেই। আর পরিকাঠামো জোগানোয়। বাকি সব নিজেদেরই করতে হবে। কাজের জাত বিচার করে যাঁরা বসে থাকবেন তাঁদের জীবন নিয়ে ভাবনায় কোনও ভুল হচ্ছে কি না সেটাই আগে ভাবা দরকার।’

৫ জুলাই, ২০০১-এ বস্টনে একান্ত সাক্ষাৎকারে 'কর্মক্ষেত্র'-র প্রধান সম্পাদককে সাম পিত্রোদা

কর্মক্ষেত্র
বাঙালির কর্মজীবনের প্রবেশপথ

ইন্টারনেটে কর্মক্ষেত্র: www.ekarmakshetra.com

কালান্তর

সম্পাদকীয়

যাদের বয়স বেশী নয়, প্রথম পরিচয়ে তাদের প্রতি যে প্রশ্নটি আমরা করে থাকি, সেটা হল: কী পড়? এ প্রশ্ন তারা গ্রহণ করে সহজভাবে, উত্তর দেয় সরল মনে।

পড়ার অবশ্য রকম ফের থাকে। সে পড়া কোথাও প্যারী সরকারের ফার্স্টবুকের ঘোড়ার পাতা, কোথাও বা যাদব চক্রবর্তী পাটীগণিতের ঐকিক নিয়ম। কখনও সুইনবার্ণের এ্যাটালান্টা ইন ক্যালিডন, কখনও হাসের ভেক্টর এ্যানালিসিস। সে পড়ার সীমানা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমিনরা স্থুল দাগ দিয়ে ক্যারিকুলামের আয়ত্তের মধ্যে রেখেছেন। বয়স যাদের বেশী নয় তারা জেনেছে এর বাইরে আর অধীতব্য কিছু নেই। জেনেছে, এই সীমানার এক প্রান্তে যদি থাকেন জাথার বেরী, তাহলে অন্য প্রান্তে জেরম (রসায়নের জেরম; জেরম কে জেরমের নামোল্লেখ নেই আমাদের পাঠ্য তালিকায়)। উত্তরে যদি ধরা যায় এম সেনের নোট, তাহলে দক্ষিণে অধিকারীর ডাইজেস্ট।

এর নাম হল পাঠ্য। এবং এর বাইরে যা কিছু, তা অবশ্যই অপাঠ্য।

অপ্রাপ্তবয়স্ক যে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে অবহেলায়, প্রাপ্তবয়স্কের কাছে প্রথম পরিচয়ের প্রথম সোপান হিসাবে যে প্রশ্নটির স্থান ভেবে দেখেছেন কখনও? কী পড়? —প্রশ্নটি বয়স্কের কাছে পরিচয়ের দ্বার নয়, ঘরের অর্গল। যে অর্বাচীন এমন প্রশ্ন করবে তার ভাগ্যে দুঃখ আছে সন্দেহ নেই। পঠদ্দশার পর আবার পাঠ কী? স্কুলের পরেও আবার বই?

সুতরাং স্কুল কলেজের গণ্ডী পার হওয়ার পর প্রশ্নের পরিবর্তন হয়। তখন— 'কী পড়' বদ্‌লে বলতে হয় কী কর?' এবং যেহেতু আমাদের 'করার' মধ্যে 'পড়া' অন্তর্ভুক্ত নয়, সেহেতু এ প্রশ্ন আমাদের বিহ্বল করে না, পরন্তু পরিচিত হবার সুযোগ দেয়।

পড়া সম্বন্ধে যে দেশের সাধারণ ধারণা এই, সেখানে বই-এর চাহিদা সহজেই অনুমেয়।

আমরা যে একেবারে পড়ি না, তা নয়। পড়ি বৈকি। বাল্যে ধারাপাত, কৈশোরে স্কুল-পাঠ্য পুস্তক, যৌবনে সংবাদপত্র, প্রৌঢ়ত্বে পঞ্জিকা এবং বার্দ্ধক্যে পুরাণ। এই বইগুলি ছাড়াও আরও অনেক অনেক বই রয়েছে— তা যে আমরা জানিনে তা নয়। আমরা শুধু জানিনা যে সে বই-এর রাজ্যে এমন অনেক বই আছে যা শুধু শুষ্ক পাঠ্যই নয়, পাঠকালীন আনন্দদায়কও। কথাটা বোধ করি ঠিক হ'ল না। কারণ পড়ার মর্যাদা সম্বন্ধে আমরা একেবারেই ওয়াকিবহাল নই তা নয়। তাই 'কী পড়' বললে আমরা যে রাগ করি, সেটা বিশুদ্ধ ক্রোধ নয়, তাতে আমাদের অজ্ঞতার, কূপমণ্ডুকতার লজ্জার খাদ মেশানো থাকে।

আসলে আমাদের অভ্যেস হয় নি এই পড়ার। অপরের ধন যাঞ্চা করবার, হরণ করবার প্রবৃত্তি আছে হয়তো আমাদের, নেই অপরের শিক্ষার, চিন্তার, জ্ঞানের আনন্দের অংশ নেবার ইচ্ছা। ইচ্ছাও অনেক ক্ষেত্রে থাকে, থাকে না অভ্যাস।

তাই বাংলা বই-এর বাজারে এত মন্দা। সেখানে মুষ্টিমাত্র ক্রেতা এবং অসংখ্য উৎপাদক।

উন্নাসিক বলতে পারেন, বাংলা সাহিত্য মানে তো কথা-সাহিত্য। বিজ্ঞের কাছে অনুসন্ধিৎসুর কাছে এর মূল্য তো কম হবেই। অনস্বীকার্য কথা। বাংলা প্রবন্ধ-পুস্তকের সংখ্যা নগণ্য। কিন্তু যে দেশে গল্প উপন্যাসের হালকা আবহাওয়ায় পাঠকের মন কল্পনার পাখা মেলতে চায় না, গুরু গম্ভীর প্রবন্ধ লিখবেন তার জন্য কোন লেখক? কী সাহসে লিখবেন? শুধু প্রণেতার নামের বিশেষণ বাড়াবার জন্য, শুধু বই-এর দোকানের তাকে স্তুপাকার হয়ে জমে থেকে অবশেষে মুদীর দোকানের ঠোঙা তৈরীর জন্য যদি প্রবন্ধ পুস্তক রচিত না হয় বাংলা দেশে, তাহলে দোষ দেব কাকে? লেখককে, না মনের দিক থেকে মৃতপ্রায় পাঠককে?

বই-এর বাজার বিস্তৃত করবার জন্য শুধু সাহিত্যবুদ্ধি, মার্জিত রুচি এবং অর্থস্বাচ্ছল্যই যথেষ্ট নয়। মনের ক্ষুধা অনুভব করবার মতো শিক্ষা থাকা চাই। সে শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় দেন না। লেখক এবং প্রকাশক একযোগে সে শিক্ষা দিতে পারেন পাঠককে।

সেই শিক্ষার প্রথম সোপান হবে 'কী পড়' এই প্রশ্নটি চালু করা— বয়স নির্বিশেষে।

আজ হয়তো রূঢ়, অশোভন মনে হবে এমন প্রশ্ন। মনে হবে যেন ব্যক্তিগত রুচির উপর অনাবশ্যক জুলুম করা হচ্ছে, অভদ্র কৌতূহল প্রকাশ করা হচ্ছে।

তবু কিছু পড়ি না, একথা বলবার আগে কিছু পড়বার বাধ্যতামূলক আগ্রহ সঞ্চার করবার একমত নিদান: 'কী পড়'?

প্রতাপকুমার রায় সম্পাদিত, প্রকাশিত ও মুদ্রিত 'কালান্তর' জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৬ থেকে পুনর্মুদ্রিত।
বানান অপরিবর্তিত। সৌজন্য: রুবি রায়।

জীবনে আমি চাকরি পাইনি ব'লে দুঃখ ছিল। ফলে, 'কর্মক্ষেত্র' আমি গোগ্রাসে গিলি। প'ড়ে বুঝেছি, চাকরি পেতে যে এলেম দরকার আমার তা নেই। প্রশ্নোত্তরগুলো রপ্ত করার চেষ্টা করি। পরে বুঝি, খুব দেরি ক'রে ফেলেছি। কী করব, আমাদের বয়সকালে তো 'কর্মক্ষেত্র' জন্মায়নি। স্বনিযুক্তি প্রকল্পগুলো আত্মস্থ ক'রে তবু লাখপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখি। এ বয়সেও হয়তো একবার কপাল ঠুকে দেখা যেতে পারে। তার চেয়েও বড় কথা হল, 'কর্মক্ষেত্র' আমাকে কাজ না দিলেও অনেক কিছু শেখায় পড়ায়।

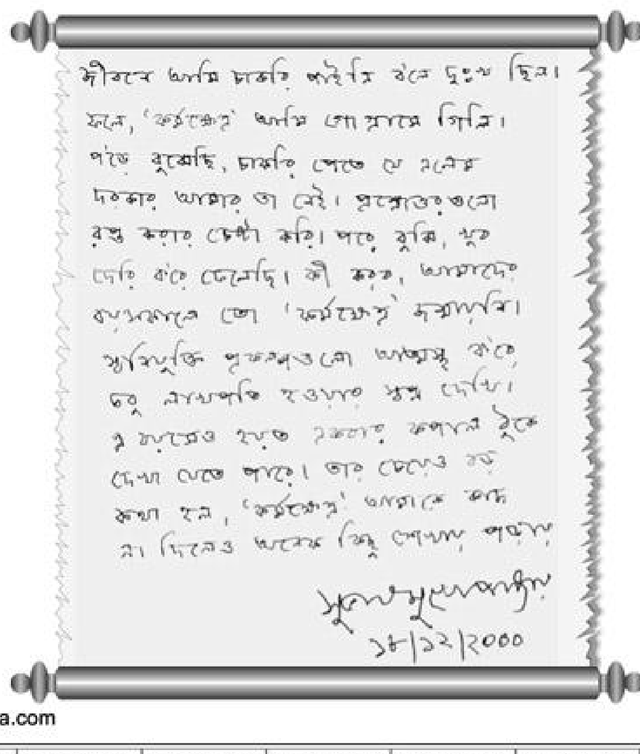

কর্মক্ষেত্র

বাঙালির কর্মজীবনের প্রবেশপথ

ইন্টারনেটে কর্মক্ষেত্র : www.ekarmakshetra.com

বরণীয় লেখকের স্মরণীয় সঙ্গ

সবিতেন্দ্রনাথ রায়

। পর্ব ১২।

সাহিত্যিকদের জ্যোতিষানুরাগ

প্রমথনাথ বিশী

কল্পনার জাল বুনে সাহিত্যিকরা গল্প-উপন্যাস লেখেন। নানা চরিত্র ও ঘটনার সৃষ্টি করেন। অথচ এঁরাই আবার নিজের নিজের জীবনের ভবিষ্যৎ কেমন কাটবে তা নিয়ে অপার কৌতূহল পোষণ করেন। জ্যোতিষী এলে হাত দেখান। আমাদের আড্ডায় ভৃগুজাতক দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য মাঝেমধ্যে এসে উপস্থিত হতেন। দ্বারেশবাবু ভালো ছক বা ঠিকুজি বিচার করতে পারতেন। কিন্তু মানুষ সবসময়ে তো আর ছক-ঠিকুজি নিয়ে চলে না। দ্বারেশবাবু এলে সেজন্য অনেকেই হাত বাড়িয়ে দিতেন। বলুন, সময় কেমন যাবে? প্রমথ বিশী বলতেন, দ্বারেশবাবু, হাত দেখে ভালো ভালো কথা বলুন।

দ্বারেশবাবু কাউকে নিরাশ করতেন না। আত্মীয়স্বজন, পুত্রকন্যা, পিতা-মাতার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মন্তব্য করতেন। দ্বারেশবাবু নিজে কৃতী ছাত্র ছিলেন, ভালো ফল করে এম এ পাশ করেন। কিন্তু শ্রীহট্টবাসীর উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য বা উচ্চারণ-দৌর্বল্য ত্যাগ করতে পারেননি, ফলে অধ্যাপক হিসেবে সফল হতে পারলেন না। প্রথমে প্রবাসী, পরে শনিবারের চিঠি কার্যালয়ে প্রুফরিডারের কাজ নিলেন। ছটি সন্তান নিয়ে বড় কষ্টের মধ্যে সংসার-যাত্রা। তবু তারই মধ্যে সাহিত্যচর্চা ও জ্যোতিষচর্চা চলত। 'ভৃগুজাতক' নামে একটা আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস লিখেছিলেন। সেটি বেশ খ্যাতি পায়। ছোটগল্প সংকলন ছিল, সেটিও সমাদৃত হয়। কিন্তু অর্থকৃচ্ছ্রতা তাঁর সৃজনীশক্তির বাধা হয়ে দাঁড়ায়। শেষে 'যুগান্তর' পত্রিকার রবিবাসরীয় বিভাগে একটা স্থায়ী চাকরি পেলে তাঁর অর্থকষ্টের কিছুটা নিরসন হয়।

দ্বারেশবাবু কখনও অপ্রিয় সত্য কথা বলতেন না। জন্মমাস, রাশি, লগ্ন শুনে, পিতা-মাতা বা অনুজদের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখতে বলতেন। আর একজন জ্যোতিষী আসতেন, তাঁর আসল নামটি মনে নেই, ন চ ভ নামে পত্রপত্রিকায় জ্যোতিষচর্চা-বিষয়ক নিবন্ধাদি লিখতেন।

প্রমথবাবু একদিন গজেন্দ্রকুমার মিত্রকে বললেন, চলুন গজেনবাবু, জমিটা বায়না করে আসি।

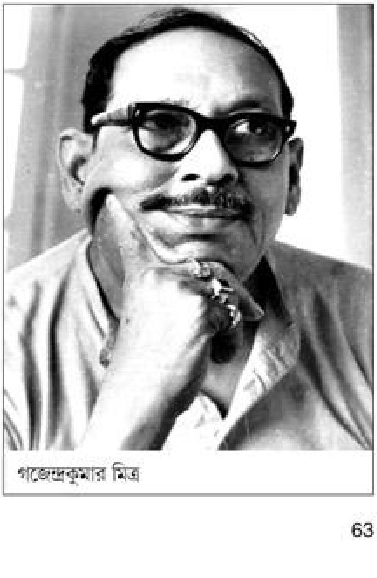

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

প্রমথবাবু একটু হতাশ হয়েই বললেন, গজেনবাবু, আমার ভাগ্যে বাড়ি নেই। ভাড়াবাড়িতেই জীবন কাটবে। প্রমথবাবু তখন ভাড়া থাকতেন অশ্বিনী দত্ত রোডে। শরৎচন্দ্রের বাড়ির কাছে।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

কারও ঠিকুজি নিয়ে চর্চায় বসে যেতেন। এটা ছিল তাঁর পাসটাইম। এমনকি তাঁর সৃষ্ট কোনও চরিত্রের জন্মতারিখ ধরে তার ঠিকুজি তৈরি করে নিয়ে চরিত্রটির বিন্যাস করতেন।

ন চ ভ উপস্থিত ছিলেন। বললেন, জমি কিনতে যাচ্ছেন নাকি?

প্রমথবাবু বললেন, কেনা নয়, আজ বায়নার দিন।

ন চ ভ জিজ্ঞেস করলেন, আপনার রাশি লগ্ন জন্মমাস কী কী?

প্রমথবাবু বললেন। সব শুনে ন চ ভ মাথা নাড়লেন, জমির ধারে পুকুর বা দিঘি আছে জানেন?

প্রমথবাবু বললেন, না সেরকম তো দেখিনি। রাস্তার ধারের জমি।

ন চ ভ আবারও মাথা নাড়লেন। বললেন, বিশীদা, এ জমি আপনার কেনা হবে না।

প্রমথবাবু বললেন, সে কি! যাঁদের জমি তাঁরা বিক্রি করতে রাজি, আমি বায়নার টাকা নিয়ে তৈরি। আপনি বলছেন জমি কেনা হবে না!

ন চ ভ বললেন, আপনার জমি হবে যেখানে কাছাকাছি বড় পুকুর বা দিঘি আছে।

প্রমথবাবু বললেন, দেখা যাক, আজ তো বায়না দেওয়ার দিন। ঘুরে আসি। চলুন গজেনবাবু।

কিন্তু প্রমথবাবুরা ফিরে এলেন বিফল-মনোরথ হয়ে। জমির মালিক ছিলেন পাঁচ শরিক। দুই শরিক জমি বেচতে রাজি হননি শেষপর্যন্ত।

ফিরে এসে প্রমথবাবু একটু হতাশ হয়েই বললেন, গজেনবাবু, আমার ভাগ্যে বাড়ি নেই। ভাড়াবাড়িতেই জীবন কাটবে।

প্রমথবাবু তখন ভাড়া থাকতেন অশ্বিনী দত্ত রোডে। শরৎচন্দ্রের বাড়ির কাছে।

পরে প্রমথবাবুর জমি কেনা হল। বাড়িও হল লেক গার্ডেনস-এ। ঢাকুরিয়া লেক-এর কাছে। প্রমথবাবু স্বীকার করেন, ন চ ভ ভালো জ্যোতিষ। কথাশিল্পী বিমল মিত্র, প্রাবন্ধিক-গ্রন্থাগারিক নকুল চট্টোপাধ্যায়, কথাশিল্পী প্রফুল্ল রায়— এঁরাও ঠিকুজি-চর্চা করতেন। প্রফুল্ল রায় এখনও আমাদের মধ্যে আছেন, তবে জ্যোতিষচর্চা এখনও করেন কিনা জানি না। আগে যখন কলেজ স্ট্রিট বইপাড়ায় আসতেন ঘন ঘন, তখন অনেকেরই ঠিকুজি দেখতেন প্রফুল্ল রায়। তাঁর এক বন্ধু আসতেন সঙ্গে, নাম বাসুদেব ভট্টাচার্য, তিনিও ভালো ঠিকুজি বিশ্লেষণ করতে পারতেন।

ঠিকুজিচর্চা বা ভবিষ্যৎ-গণনা সব সাহিত্যিক বিশ্বাস করতেন না। তবে বেশির ভাগ সাহিত্যিকই ভবিষ্যৎ-গণনায় উৎসুক ছিলেন। দ্বারেশবাবু অনেক সাহিত্যিকেরই ঠিকুজি বা ছক করেছিলেন, ভবিষ্যৎ-গণনা করেছিলেন। এঁদের মধ্যে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিরা আছেন।

নকুল চট্টোপাধ্যায় ও বিমল মিত্রের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব ছিল। বিমলবাবু নিজেও জ্যোতিষচর্চা করছেন। এঁরা হাত দেখা বা মুখমণ্ডল বা কপাল দেখে ভবিষ্যৎ-চর্চায় তত ভরসা করতেন না। তবে হাওড়ার শিয়াখালা অঞ্চলে এক জ্যোতিষী ছিলেন, নাম সম্ভবত বৈদ্যনাথ ভাদুড়ী, কথাশিল্পী বাণী রায় সেখানে গিয়ে বিস্মিত হন। বৈদ্যনাথবাবু অদ্ভুতভাবে সব যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন এমনভাবে বলে যেতেন।

বিমল মিত্র, নকুল চট্টোপাধ্যায়ের জ্যোতিষচর্চা ও আড্ডা জমে উঠত যখন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় পুণা থেকে কলকাতায় আসতেন।

শরদিন্দুবাবুর লেখার টেবিলে সামনে থাকত নানারকম শিশি। কোনওটায় লজেন্স, আখরোট বা কিশমিশ। লেখার সময় যখন যা ইচ্ছে হত খেতেন। অথবা কারও ঠিকুজি নিয়ে চর্চায় বসে যেতেন। এটা ছিল তাঁর পাসটাইম। এমনকি তাঁর সৃষ্ট কোনও চরিত্রের জন্মতারিখ ধরে তার

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

এর মধ্যে একদিন, ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের একটি নীলা পাথর পরে গাড়ি-অ্যাক্সিডেন্টের কথা উঠল। শরদিন্দুবাবু বললেন, নীলা পাথর পরতে হলে আগে শোধন করে নিতে হয়।

ঠিকুজি তৈরি করে নিয়ে চরিত্রটির বিন্যাস করতেন। এটা ছিল তাঁর কাছে একটা আনন্দ খুঁজে নেওয়ার পথ।

শরদিন্দুবাবু এলে সাধারণত দক্ষিণ কলকাতার কেয়াতলা অঞ্চলে থাকতেন। ওঁর সাহিত্যিক বন্ধুরা সেখানে যেতেন। তাঁদের মধ্যে থাকতেন প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, প্রমথনাথ বিশী, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সুমথনাথ ঘোষ, নকুল চট্টোপাধ্যায়, বিমল মিত্র প্রভৃতিরা। সঙ্গে আমি অবশ্য থাকতাম অনেকটা সহচর হিসেবে।

কখনও আমাকে একলা যেতে হত। এইসব সাহিত্যিকের ঠিকুজি বা ছক নিয়ে। আবার শরদিন্দুবাবু সেসব ছক দেখে যা বলতেন বা লিখে দিতেন সেগুলো যথাস্থানে পৌঁছে দিতে হত।

এর মধ্যে একদিন, ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের একটি নীলা ধারণ করে গাড়ি-অ্যাক্সিডেন্টের কথা উঠল। শরদিন্দুবাবু বললেন, নীলা পাথর পরতে হলে আগে শোধন করে নিতে হয়। তারপর এসব পাথর ধারণ করার পর প্রতিদিন

বিমল মিত্র

বিমলবাবু কিছুদিন ধরেই বলছিলেন, ভানুবাবু আমার জীবন শেষ হয়ে আসছে। ঠিকুজিতে তাই আছে। দুবার তিনবার ঘুমের ওষুধ খেয়েও ঘুম আসে না। প্লট খুঁজতে খুঁজতে ঘুম উধাও হয়।

খাদ্য দিতে হয়। দুধ বা মধু বা দইয়ে সকালবেলা কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখতে হয়।

নীলার আংটি ধারণের পর নীহাররঞ্জন গুপ্তের খ্যাতি অন্যদিকেও বিস্তৃত হয়। আগে তো 'কালোভ্রমর' গোয়েন্দা 'কিরীটী রায়'-এর স্রষ্টা হিসেবে ওঁকে জানতাম। তাঁর নীলার আংটি পরার পর 'উল্কা' নাটকটির অসামান্য সাফল্য তাঁকে নাট্যমঞ্চে, পরে চলচ্চিত্র শিল্পেও সাফল্য এনে দেয়।

এইসব ঘটনার পর শরদিন্দুবাবুর জ্যোতিষচর্চা বা ঠিকুজি-নির্ণয় ক্ষমতার খ্যাতি ব্যাপ্ত হয়।

অনেক লেখকই তাঁদের ঠিকুজি এনে দিতেন। আমি সে সব ঠিকুজি নিয়ে শরদিন্দুবাবুর কাছে কেয়াতলার আস্তানায় নিয়ে যেতাম। শরদিন্দুবাবুর উত্তর নিয়ে আসতাম। একদিন শরদিন্দুবাবু বললেন, ভানু তুমি সকলের ঠিকুজি নিয়ে আসো, তোমারটা তো কখনও দেখাওনি।

আমি বললাম, আমি সাধারণ মানুষ, আপনি নামজাদা মানুষদের ঠিকুজি দেখেন, সেজন্য দিইনি।

শরদিন্দুবাবু বললেন, আরে এটা তো আমার হবি। এখানে নামজাদা-অনামজাদা কিছু নেই। তুমি এরপর যখন আসবে, তোমার কোষ্ঠীপত্র আছে তো? নিয়ে আসবে।

পরের বার যাওয়ার সময়ে আমার কোষ্ঠীপত্র নিয়ে গেলাম। উনি কোষ্ঠীপত্রটি দেখে আমার দিকে চাইলেন, তারপর বললেন, ভানু এটা আজ রেখে দিচ্ছি, পরে যখন আসবে, তখন সব বলব। একটা কথা, তোমার জন্মসময়, সাল তারিখ এতে যা আছে সব ঠিক ঠিক আছে তো? জন্মেছিলে কোথায়?

আমি 'কলকাতা' বলাতে উনি যেন নিশ্চিন্ত হলেন। শরদিন্দুবাবু বললেন, ঠিক আছে ভানু, তোমারটা আমি এখনই দেখে রাখব। তোমার বয়সি এক লেখকের কোষ্ঠী দেখছি, অনেকদূর যাবে, তবে শো-ম্যানশিপই তার প্রধান প্রতিবন্ধক।

পরে আমি যখন গেলাম শরদিন্দুবাবুর কাছে, শরদিন্দু হেসে বললেন, ভানু, আমি এক দারুণ সমস্যার সমাধান করে ফেলেছি, প্রায় ব্যোমকেশের মতো।

আমি উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাতে উনি বললেন, তোমার এ কোষ্ঠীপত্র তৈরি হয়েছে কাশীতে।

আমি বললাম, হ্যাঁ আমার এক সম্পর্কিত কাকা কাশীতে থাকতেন, তিনি করিয়ে দেন।

শরদিন্দুবাবু বললেন, তাইতে উনি ধরে নিয়েছেন তোমার জন্ম কাশীতে। তোমার শুক্রলগ্ন ধরে কোষ্ঠী তৈরি করেছেন। তোমার হল কন্যালগ্ন, রাশি মীন ঠিকই আছে।

আমি হতাশ হয়েই বললাম, তাহলে ওই কোষ্ঠীপত্রটাই ভুল?

শরদিন্দুবাবু বললেন, অত হতাশ হওয়ার কারণ নেই। তোমার ছক তৈরি করে ভবিষ্যৎ গণনা একটা করে রেখেছি। আমি কৌতূহল চেপে চুপ করে শুনছি।

শরদিন্দু বলছেন, ১৯৬৫ সালে তোমার বাড়ি হবে, ১৯৭০ সালে বিবাহ, দুটি কন্যার জন্ম, অমুক অমুক সালে বিদেশযাত্রা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি বললাম, এসব তো গল্পকথা বা রূপকথা শোনাচ্ছে।

শরদিন্দু বললেন, মিলিয়ে নিও। তবে আমাকে জানাতে ভুলো না— যখন যা হবে।

সেটা ১৯৬২ সালের কথা। নিজের বাড়ি তখন কষ্টকল্পনা মাত্র। তবু ১৯৬৫ সালে যখন বাড়ি হল, গৃহপ্রবেশ হল, শরদিন্দুবাবুকে চিঠি দিয়ে আশীর্বাদ চেয়েছিলাম।

শরদিন্দুবাবু আশীর্বাদ দিয়ে উত্তর দিলেন, পরেরগুলোও ঠিক ঠিক হবে দেখবে, তবে আমাকে জানাতে ভুলো না। বিয়ের মিষ্টি তো খাবই।

দুঃখের বিষয়, সে মিষ্টি আর তাঁকে খাওয়ানো যায়নি। তার আগেই তিনি পরপারে যাত্রা করেছেন।

কথাসাহিত্যিক বিমল মিত্র তো ব্যবসা-বাণিজ্য-চিকিৎসার ব্যাপারেও ছক-বিচারে আগ্রহী ছিলেন। আমার সঙ্গে প্রকাশক সম্পর্ক স্থাপনের আগে আমার ছক দেখেছিলেন। তখন তো শরদিন্দুবাবু, নকুল চট্টোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায় এঁদের সঙ্গে আলাপের পর ছক-এর একটা নকল সব সময়ে কাছে থাকত। বিমলবাবু আমার ছক দেখে সন্তুষ্ট হয়ে আমাদের সঙ্গে লেখক-প্রকাশক সম্পর্ক তৈরি করেন।

আমার একবার ফাইলেরিয়া হয়। পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা, পা নামিয়ে বসতে পারি না। দৈনিক ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকার ওষুধ খেয়েও কিছু হয় না। এক স্মরণবাসরে গিয়ে পা ওঠানো-নামানো করছি। শোভাদির মেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া এসে বলল, ভানুবাবু, পায়ের কী অসুবিধা?

বললাম, ফাইলেরিয়া। ওষুধ খেয়ে কিছুতেই কমছে না।

বিষ্ণুপ্রিয়াই পরামর্শ দিল, ভোলাবাবুকে দেখাতে। ডাঃ ভোলা চক্রবর্তী। তাঁর কাছে গেলাম। তিনি সাতদিনের ওষুধ দিলেন। আশ্চর্য, দুদিন ওষুধ খেতেই মনে হল কোনও ব্যথাযন্ত্রণা নেই। যাই হোক, ওষুধ সাতদিন খেয়ে আবার ডাঃ চক্রবর্তীর কাছে গেলাম।

ভোলাবাবু বললেন, ঠিক আছে। আর ওষুধ খেতে হবে না।

ঘটনাটা বিমলবাবুকে বলেছিলাম। বিমলবাবু সোৎসাহে বললেন, ভানুবাবু তাহলে ভোলাবাবুর ছকটা একটু দেখতে হয়। আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই মিল আছে। তা নাহলে এরকম মিরাক্‌ল আরোগ্য হয় না।

ভোলাবাবুর ছক আর বিমলবাবুকে দেখানো হয়নি, আজ যাব, কাল যাব করতে করতে বিমলবাবু অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

বিমলবাবু কিছুদিন ধরেই বলছিলেন, ভানুবাবু আমার জীবন শেষ হয়ে আসছে। ঠিকুজিতে তাই আছে। দুবার তিনবার ঘুমের ওষুধ খেয়েও ঘুম আসে না। প্লট খুঁজতে খুঁজতে ঘুম উধাও হয়। কী যে করি, ভালো কথা, আপনার ঠিকুজি আর ভোলাবাবুর ছকটা দেখাতে ভুলবেন না। আমিও, যদি অনুকূল হয়, তাঁকে দেখাব।

ভোলাবাবুকে দেখানোর সুযোগ হয়নি বিমলবাবুর। ১৯৯১ সালের ২ ডিসেম্বর আমাদের ছেড়ে চলে যান ঘুমের মধ্যেই। এটাও কি অভ্রান্ত জ্যোতিষচর্চার ফল বা এক ধরণের অটো সাজেশন!

সেরা ভ্রমণ কাহিনী

প্রথম খণ্ড

প্রখ্যাত লেখক-পর্যটকদের দেশ-বিদেশ ভ্রমণের অন্তরঙ্গ কাহিনী। সহস্রাধিক পাতা। ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা। মজবুত বোর্ড বাঁধাই।

তৃতীয় মুদ্রণ।₹৩৫০

সেরা ভ্রমণ কাহিনী

দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বিতীয় মুদ্রণ। ৭০০ পাতা।₹২৭৫

অনলাইনে পেতে
www.swarnakshar.in
লগ অন করুন

স্বর্ণাক্ষর

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320 **Fax:** 2287-6448 **E-Mail:** info@swarnakshar.in

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, **বলাকা বুক স্টল** (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাবেন।

বিষাদগাথা

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

১২

(পরিচ্ছেদ: ৩৪, ৩৫, ৩৬)

৩৪

সবে দিন শুরু হয়েছে, বকুলগাছে ও আশপাশের গাছে পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে, পরীক্ষিৎ অনেক রাত অব্দি লিখে ভোরবেলা শুয়েছে, দরজার কড়া নাড়া শুনে নীলাঞ্জনা এগিয়ে গিয়ে দেখল দরোয়ান দরজা খুলে এক তরুণীর মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ভদ্র, সুশ্রী চেহারা, লালপাড় সাদা শাড়িতে যেন সুন্দরীই মনে হচ্ছে, নীলাঞ্জনা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কার কাছে এসেছ মা?'

'পরীক্ষিৎ চৌধুরীর সঙ্গে একবার দেখা করব।'

পরীক্ষিৎ নিজেই উঠে এসেছে। কিছুটা দূর থেকে বলে উঠল, 'তিকান, তুমি?'

'তিকান আমার মা, আমি পরী। মাকে রেলস্টেশনে বেঞ্চে শুইয়ে রেখে তার ইচ্ছেতেই আমি আপনার কাছে এসেছি। তার তো আসবার ক্ষমতা নেই, আমাকেই বাড়ির রাস্তা বুঝিয়ে দিলেন।'

'নীলাঞ্জনা, ওকে একটু বসাও, আমি তৈরি হয়ে আসছি।'

'তুমি কিন্তু রাত থেকে এখনও অব্দি ঘুমোওনি।'

'ঘুমোবার সময় অনেক পাব। ওকে দেখো।'

হাসপাতাল থেকে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে তিকানের মেয়ের সঙ্গে স্টেশনে গিয়ে পরীক্ষিৎ প্রথমে তিকানের কপালে হাত রাখে, তারপর নাড়ি দ্যাখে, তারপর তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে শুইয়ে দেয়।

হাসপাতালে রোজই পরীক্ষিৎ তাকে দেখতে যায়। কোনও কোনও দিন নীলাঞ্জনাও সঙ্গে যায়। একদিন মিতাকেও নিয়ে গিয়েছিল। আশ্চর্যের কথা, মিতা একবার দেখেই বলল, 'তুমি কীর্তন ভুলে গেছ?'

মা তো একসময় আখড়ায়ও ছিল। বাবাকে পুলিশ ধরে নিয়ে যাবার পর থেকে কোথাও দু-চার দিনের বেশি থাকতে পারি না। যেখানেই যাই, আমাদের মা-মেয়ের ওপর নানাজনের কুনজর পড়বেই। তাদের উৎপাত থেকে বাঁচতে কোথাও থিতু হতে পারিনি।

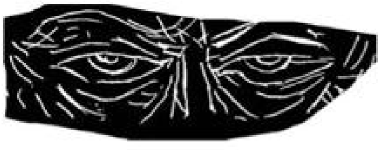

দ্বিতীয় দিন দ্বিপ্রহরে এক বুড়ি লাঠি ঠুকে ঠুকে নন্দিনীর কাছে এসে কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'তুমি কে মা? তুমি এই বনের দেবী?'

'আমি এসেছি আমার স্বামীর খুনিদের খোঁজে।

মৃদু ও মলিন হেসে তিকান বলল, 'কীর্তনই আমাকে ভুলে গেছে।'

'পরী তোমার মতোই কীর্তন গায়। মাঝে মাঝে ঘুমের মধ্যেও গায়। ও তো আমার সঙ্গে শোয়।'

পরীও কয়েকদিন হাসপাতালে তার মাকে দেখে গেছে।

একদিন হাসপাতাল থেকে ফেরার পথে পরীক্ষিৎ জিজ্ঞেস করল, 'তোমার মা এত অসুস্থ হলেন কী করে? এ তো মনে হয় অনেকদিন ধরে ভুগছে।'

'আমার বাবার জেল হবার পর থেকেই আমাদের অনটন শুরু হয়। অনেকদিনই দুবেলা খাবার জোটেনি। কোথাও কোনও মন্দিরে বা জলসায় কীর্তন থাকলে দুজনে গেয়ে কিছু পেয়েছি, তাই দিয়ে চলেছে কিছুদিন। তারপর আবার যে কে সেই।'

'তোমার মা-বাবা মন্দিরে থাকতেন না?'

'বাবা যতদিন ছিলেন আমরা মন্দিরেই থাকতাম। কোথাও তিন মাস, কোথাও ছ'মাস। মা তো একসময় আখড়ায়ও ছিল। বাবাকে পুলিশ ধরে নিয়ে যাবার পর থেকে কোথাও দু-চার দিনের বেশি থাকতে পারি না। যেখানেই যাই, আমাদের মা-মেয়ের ওপর নানাজনের কুনজর পড়বেই। তাদের উৎপাত থেকে বাঁচতে কোথাও থিতু হতে পারিনি।'

বকুলবেদির কাছে পৌঁছে পরীক্ষিৎ জিজ্ঞেস করল, 'পুলিশ তোমার বাবাকে ধরল কেন?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পরী একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জানাল, 'বাবা নাকি একজন জেলভাঙা বিপ্লবী। জেল থেকে পালিয়ে চেহারা পাল্টিয়ে তখনও নাকি বিপ্লবের কাজই করে বেড়াচ্ছিলেন। একদিন ঘোর বর্ষায় সন্ধের মুখে কাঁধ অব্দি চুল, গলায় কণ্ঠী, কপালে তিলক—মন্দিরে মার কাছে আশ্রয় চান। পরে দুজনে কণ্ঠী বদল করে মন্দিরও বদলে ফেলেন। পুলিশের ধারণা আমার বাবা বোষ্টমের ছদ্মবেশে তার আগেকার বিপ্লবী দলকে সংগঠিত করে বেড়াচ্ছিল।'

'তোমার মা-ই তাকে নিয়ে তোমাকে আমার কাছে আসতে বলেছিলেন?'

'না না, আপনার কাছে না। বালিসোনায় মায়ের বাবার একটা বাড়ি ছিল, রাজনীতির লোকেরা মাকে আর আমার দাদুকে তাড়িয়ে সেখানে উঁচু বাড়ি করছিল। সেই বাড়িতে যদি ছোট একটা ঘরও পাওয়া যায়, সে চেষ্টা করতেই আমরা এখানে আসি। মা একেবারে অসুস্থ হয়ে পড়ায় বাধ্য হয়ে আপনাকে খবর দিতে বললেন। আচ্ছা, আমার মাকে-দাদুকে যারা বাড়ি ছাড়া করল, সেই লোকগুলোর মন কি বিষাক্ত সিসে দিয়ে তৈরি?'

'তোমার যখন খুব বেশি মন খারাপ হবে, এই বকুলবেদিতে এসে বসো। ওদের কথা আর ভেবো না। লোভের বিষ সিসের চেয়েও মারাত্মক, সেই বিষে মন কালো হয়ে গেলে মানুষের হৃদয় বলে আর কিছু থাকে না রে।'

পরীক্ষিৎ, মিতা, নীলাঞ্জনা, সরস্বতী, লক্ষ্মী, চিরন্তনী অনেকে মিলে তিকানকে হাসপাতাল থেকে নিতে এসেছে। একটা গাড়িতে মিতা লক্ষ্মী চিরন্তনীর সঙ্গে তিকান; পরী বসেছে অন্যদের সঙ্গে পরীক্ষিতের পাশে, আরেকটা গাড়িতে।

চৌধুরীবাড়িতে সোজা না গিয়ে তিকানের মন জুড়োতে, পরীর মন ভোলাতে কাছে দূরে কয়েকটা ঝুলন দেখানো হল।

বালিসোনার সবচেয়ে বড় ঝুলনযাত্রা হয় রাসমাঠে। ছোট্ট ছোট্ট পাহাড়, নদী, নৌকো, দোলনা, কলাগাছ, বাঁশগাছ, ঘাসের বুকে গোরুর গাড়ি, গামলার সমুদ্রে আলোজ্বলা জাহাজ, সকলেই মুগ্ধ হয়ে দ্যাখে। এবছর নতুন যোগ হয়েছে পাহাড়ি রাস্তায় দার্জিলিংয়ের টয় ট্রেন। সরু রেললাইনে তিনকামরার ছোট্ট ট্রেন ব্যাটারিতে চলছে, সামনের কামরার নীচে ব্যাটারি-বাক্স সাঁটা।

চলন্ত রেলগাড়ি দেখতে ভিড়ও হচ্ছে খুব। এই আশ্চর্য রেলের নির্মাতা বালক মেঘাবৃত। অনেকদিন আগে শুধু স্কুলের সুদীপের মুখে টয় ট্রেনের কথা শুনে একার হাতে লাইন সমেত পুরো ট্রেনটাই বানিয়ে সে বাবার ফটোর পিছনে লুকিয়ে রেখেছিল। এবছর লাইন তৈরি করে এই প্রথম সকলের সামনে তার চলন্ত টয় ট্রেন দেখানো হচ্ছে। মহালয়ার ভোরে সে প্রতিবছর লাইন ছাড়া শুধু ট্রেনটা ফটোর সামনে রেখে বাবাকে ছবিতেই প্রণাম করে।

তিকানকে পেয়ে মিতার অসাড় মন আস্তে আস্তে সাড় ফিরে পেল। সে নিজের হাতে তিকানকে দুবেলা বড় গ্লাস ভরা দুধ খাইয়ে তার গলার আওয়াজ ফিরিয়ে এনে সারাদিনে যখন তখন কীর্তন ফরমাশ করে। গীতার বদলে তার নতুন নেশা তিকানের গভীর গলায় কীর্তন গান। কীর্তনে ডুবে থেকে আগের চেয়ে তার কথাবার্তাও ক্রমশ স্বাভাবিক হচ্ছে।

একদিন সরোজিনীর প্রিয় পদ 'না পুড়ায়ো রাধা অঙ্গ, না ভাসায়ো জলে' গাইতে গাইতে কান্নায় তিকানের গলা বুজে এল, মেয়ে পরী এসে মার চোখের জল মুছিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে নিজেও কেঁদে ফেলে তাকে শান্ত করল। সে জানে আজ একুশে শ্রাবণ মার সঙ্গে বাবার কণ্ঠীবদল হয়েছিল।

আজকাল নন্দিনীও কীর্তন শুনতে চলে আসে। তিকানকে কাঁদতে দেখে সেও ফোঁপাতে থাকে।

মিতা দুলে দুলে দুচোখ বুজে শুনছিল, কান্নার শব্দে চোখ মেলে তিনজনকে কাঁদতে দেখে বলল, 'ভেবো না, মা-মেয়েকে কেঁদে ভাসাবার জন্য এখানে আশ্রয় দিয়েছি। এ বাড়িতে কান্নার অভাব নেই বাছারা। তোমাদের আদর করে ডেকে এনেছি, কীর্তন গেয়ে তার দেনা শোধ করতে হবে। কই, ধরো দেখি 'আমি যোগিনী হইয়ে যাব সেই দেশে যেথায় নিঠুর হরি। মা গাইবে, না মেয়ে গাইবে?'

'মার কাছে আমি! মা-ই গাইবে।' বলে নিজেই গুনগুন করে উঠল 'দে দে, আমায় সাজায়ে দে গো—'

সকাল দুপুর সন্ধে সবসময় কীর্তন চলতে লাগল। বিশেষ বিশেষ তিথিতে রাতেও কীর্তন শোনা যায়। গানের কোনও কোনও কথায় বা সুরে নন্দিনীর মনের ব্যথা মিশে তার বুকে ঢেউ ওঠে।

দিবাকরের খুনিদের শাস্তি চেয়ে বছরের পর বছর নন্দিনীর প্রার্থনা বিফলে যাবার পর একদিন গান শুনতে শুনতে তোলপাড় হৃদয়ে সে সকলকে লুকিয়ে একাই রেললাইন পার হয়ে জঙ্গলে গেল। পুরো দুদিন জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে মাঝে মাঝেই গলা তুলে বলতে লাগল, 'যারা আমার ঘুমন্ত স্বামীকে আমার পাশ থেকে তুলে এনে খুন করেছে, আমার গর্ভের শিশুসন্তানের জনককে তার সন্তানের মুখ দেখতে দেয়নি, সেই

শিশুকে যারা সারা জীবনের জন্য পিতৃহীন করে দিয়েছে, যতদিন না তারা অনুতাপে দগ্ধ হয়ে দয়া মায়া করুণার মর্ম বুঝবে, ততদিন তাদের বেঁচে থাকা যেন যন্ত্রণায় জ্বলে-পুড়ে যায়।' নাট্যাভিনয়ে মুখস্থ পাঠ বলার মতো নন্দিনী জঙ্গলের নানা জায়গায় একই কথা বলে বেড়ায়।

দ্বিতীয় দিন দ্বিপ্রহরে এক বুড়ি লাঠি ঠুকে ঠুকে নন্দিনীর কাছে এসে কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'তুমি কে মা? তুমি এই বনের দেবী?'

'আমি এসেছি আমার স্বামীর খুনিদের খোঁজে। এখানেই কোথাও তাকে পাঁচ গুলিতে শেষ করে ফেলে রেখেছিল।'

বুড়ি যথাসাধ্য কোমর সোজা করে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে করতে বলল, 'জঙ্গলের ওই জল্লাদরাই তো আমার দুই নাতিকে আজ তেরো দিন ঘর থেকে তুলে এনেছে, গ্রামের কচি-কাঁচাদেরও নাকি ওরা ট্রেনিং দিয়ে জল্লাদ বানায়।'

প্রথমে একটা শেয়ালের সুরেলা ডাক, তারপর একসঙ্গে অনেক শেয়ালের হুক্কাহুয়া শুরু হওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে একদল পুলিশ এসে দুজনকে ঘিরে ফেলে বলল, 'আপনি নন্দিনী চৌধুরী?'

'হ্যাঁ। নন্দিনী বসুচৌধুরী। দিবাকর বসুর খুনিদের খোঁজ পেয়েছেন?'

'আমাদের সঙ্গে আসুন। আপনার বাড়ির সবাই পাগল হয়ে আছেন।'

নন্দিনী ফেরার পথে এদিক-ওদিক শুকনো পচা পাতায় ছাওয়া মাটি যেখানে যেখানে বেরিয়ে আছে সেইসব জায়গায় চোখ বোলাচ্ছে লক্ষ করে একজন অফিসার বললেন, 'কিছু কি আপনার পড়ে গেছে? কিছু খুঁজছেন? খোঁজার মতো সময় নেই কিন্তু। খুব তাড়াতাড়ি আমাদের জঙ্গল পেরিয়ে যেতে হবে।'

'এখানে আরও একজনকে পাঁচ গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল ওরা।'

বাড়ি ফিরে বিধ্বস্ত পোশাকেই নন্দিনী সকলের প্রশ্নের একই উত্তর দেয়— 'দিবাকরের খুনিদের অভিশাপ দিয়ে এলাম। গাছ থেকে গাছে যেভাবে হাওয়া বয়ে যায় সেইভাবে সমস্ত জঙ্গলে আমার অভিশাপ ছড়িয়ে দিয়েছি।'

পরের রবিবার থেকে ভোরে উঠে সেও মেঘাবৃতর সঙ্গে তৈরি হয়ে গানের মিছিলে যায়। সরোজিনীর মৃত্যুর পর মিছিল আরও দীর্ঘ হয়েছে। তিকান-পরীর জন্য পরীক্ষিৎ তার একটা নতুন বিষাদগাথা কিছুটা অদল-বদল করে কীর্তনের রূপ দিয়েছে। কথার টানে, সুরের মায়ায় মিছিলের সেই গান তিকানদের গলা থেকে বালিসোনার অনেকের গলায় বয়ে যায়। মিতাও প্রথমে কীর্তনের টানে এসে পরে

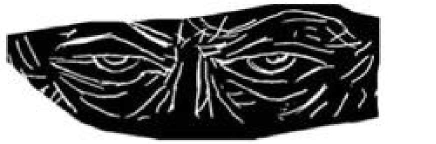

শীতের ভোরের কুয়াশা ফিরে এল। সাদায় ঢাকা সারা পৃথিবী। অদৃশ্য রাস্তায় গানের মিছিলকে কখনও মনে হয় অশরীরী আত্মার গান, কখনও মনে হয় প্রকৃতিরই একটা রূপ। মিছিলের জীবিত যাত্রীরা অনেকেই মৃতের উপস্থিতি অনুভব করে। অনেকে বিশ্বাস করে তারা এই মিছিলে আগের মতোই একসঙ্গে চলেছে।

নিয়মিত, যত দূর পারে, মিছিলে হাঁটে। লালকমল নীলকমল পুজোর ছুটিতে এসে গাঁটসুদ্ধু কয়েকটা বাঁশ কেটে লম্বা লম্বা লাঠি বানিয়ে মহা উৎসাহে ছোটদের রণ-পায়ে হাঁটার নিয়ম শিখিয়ে দেয়। সৈনিক স্কুলের পিছন দিকে আদিবাসী পল্লিতে যেমন দেখেছে সেইমতো রণপার ছোটখাটো একটা মিছিল সাজিয়ে মূল মিছিলের সঙ্গে জুড়ে দেয়। নিন্দার নাতিও রণ-পা চড়ে গর্বভরে পা ফেলছে।

এরপর থেকে আশপাশের গ্রামের অনেকেই এসে মিছিলে যোগ দিতে এল, কেউ কেউ নিজেদের রণ-পা নিয়েও এসেছে। সরোজিনী পরীক্ষিৎ যে গ্রামে গিয়ে সরস্বতী পুজোর দিন শ্লেট-খড়ি দিয়ে এসেছিল, সেখানকারও কাউকে কাউকে মিছিলে দেখা গেল।

শীতের ভোরের কুয়াশা ফিরে এল। সাদায় ঢাকা সারা পৃথিবী। অদৃশ্য রাস্তায় গানের মিছিলকে কখনও মনে হয় অশরীরী আত্মার গান, কখনও মনে হয় প্রকৃতিরই একটা রূপ। মাঝে মাঝে মিছিলের কেউ কেউ দেখতে পায়— তাদের সামনেই ওই তো সরোজিনী চলেছে, ওই তো অবনীমোহন, ওই চলেছে অম্বরীশ, ওই যাচ্ছে জাহাঙ্গীর, ওই যে শিবকৃষ্ণ, ওই যায় দিবাকর।

মিছিলের জীবিত যাত্রীরা অনেকেই মৃতের উপস্থিতি অনুভব করে। অনেকে বিশ্বাস করে তারা এই মিছিলে আগের মতোই একসঙ্গে চলেছে।

একদিন আরও গাঢ় কুয়াশার ভোরে বাদা-জোড়া টাউনশিপের আকাশচুম্বী কুয়াশা ছিঁড়ে বিলাসবহুল ফ্ল্যাটগুলোর জানলায়, বারান্দায় একে একে আলো জ্বলে উঠল, মিছিলের গান শুনে বাসিন্দারা কুয়াশা-ঢাকা ঝাপসা মিছিলের রহস্য বুঝতে চায়। মিছিলের স্লোগান শুনতে অভ্যস্ত তারা রবিবারের গানের মিছিলের অর্থ বা উদ্দেশ্য ধরতে না পেরে কেউ কেউ অধৈর্য হয়, কেউ কেউ কৌতূহলী হয়।

নির্বাচনের চারদিন আগে বালিসোনার রাস্তায় রাস্তায় ফ্ল্যাগমার্চ শুরু হওয়ায় সবরকম রাজনৈতিক মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। রাসমাঠও আবার আগের মতো আধা-সেনাবাহিনীর ক্যাম্পে অর্ধেকটা ঢাকা পড়ল।

গানের মিছিল কোনও রাজনৈতিক দলের মিছিল নয়— একথা কর্তৃপক্ষকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত সরকারি নিষেধ অমান্য করে, পুলিশ ও আধা-সেনাবাহিনীর অনুরোধ ও হুমকি উপেক্ষা করে ছোট আকারে রবিবার গানের মিছিল বেরল। সকালের দৈর্ঘ্যের ঘাটতি বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কমে এল, মধ্যাহ্নে মিছিলের চেহারা অনেকক্ষণ ধরে টিভিতে দেখিয়ে এটাকে বালিসোনার দীর্ঘতম সংগীতমিছিল আখ্যা দেওয়া হল। সেই সংবাদে একথাও বার বার বলা হতে লাগল যে লাঠি বা গুলি চালানোর অনুমতি না পাওয়ায় পুলিশ বা আধা-সেনাবাহিনী নিষ্ক্রিয় হয়ে ছিল। মিছিল ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাস বা জলকামান ব্যবহারেও সরকারের সায় মেলেনি।

ভোট গ্রহণের দিন বৃহস্পতিবার বালিসোনা সকাল থেকেই আশ্চর্য শান্ত। বুথে বুথে দীর্ঘ লাইনে সারিবদ্ধ ভোটদাতারা একের পর এক ভোট দিয়ে বেরিয়ে আসছে।

পাঁচদিন পরে ভোট গণনার দিন ব্যালট বক্সের সিল ভেঙে গণনা শুরুর অল্প পরেই সকলে আশ্চর্য হয়ে দেখল যে অল্প কিছু ভোট শাসকদলের ও বিরোধী দলের প্রার্থীর চিহ্নে পড়লেও বেশিরভাগ ব্যালট পেপারে সব প্রার্থীর নাম ও প্রতীকচিহ্নের পাশেই সীলমোহর দেওয়া। সব বুথের ভোট গণনার শেষে বাতিল ভোটের সংখ্যা শতকরা বিরানব্বইয়ে পৌঁছল।

বালিসোনার তিনটি আসনই শূন্য পড়ে

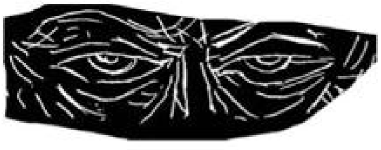

‘তিকানের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছিল?’
প্রশ্নটা বুঝতে সময় নিয়ে ধীরে ধীরে বলল ‘যদি হয়ে থাকে, সে দোষ তিকানের নয়। যদি না হয়ে থাকে সে দোষ কিন্তু আমার।’
বলে পরীক্ষিৎ হাসল, ‘এতদিন পর, কী ব্যাপার?’
নীলাঞ্জনা একগুচ্ছ হলুদ হয়ে যাওয়া কাগজ দেখিয়ে বলল,
‘এগুলো কী?’

থাকায় এই অঞ্চলের ভোট বাতিল করে পুনর্নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হবে, না ভোট বাতিল নিষ্প্রয়োজন বিবেচনায় পরে এখানে উপনির্বাচনের তারিখ জানানো হবে তাই নিয়ে গোটা রাজ্যের ফলাফল বিশ্লেষণের ফাঁকে ফাঁকে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে রাজনীতিবিশেষজ্ঞ নির্বাচন-ভাষ্যকারদের তর্ক-বিতর্ক চলল।

৩৫

একদিন মিতা, নন্দিনী, মেঘাবৃত, লিওনার্দোর সঙ্গে বসে পরীক্ষিৎ তিকানের কীর্তন শুনছে, নীলাঞ্জনা ঘরে ঢুকে উত্তেজনা চেপে পরীক্ষিৎকে বলল, ‘এখুনি একবার ঘরে আসতে পারবে?’

পরীক্ষিৎ অনিচ্ছাতেও উঠে এল।

‘তিকানের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছিল?’

প্রশ্নটা বুঝতে সময় নিয়ে ধীরে ধীরে বলল ‘যদি হয়ে থাকে, সে দোষ তিকানের নয়। যদি না হয়ে থাকে সে দোষ কিন্তু আমার।’ বলে পরীক্ষিৎ হাসল, ‘এতদিন পর, কী ব্যাপার?’

নীলাঞ্জনা একগুচ্ছ হলুদ হয়ে যাওয়া কাগজ দেখিয়ে বলল, ‘এগুলো কী?’

তার প্রথম যৌবনের শেষ না হওয়া কবিতার কিছু কিছু অংশ, কয়েকটা কাগজে টুকরো টুকরো গদ্য, একটা লেখার ওপরে তার নাকের রক্ত একফোঁটা শুকিয়ে কালো হয়ে আছে। তখনও অকারণে তার নাক দিয়ে রক্ত পড়ার ব্যামো সম্পূর্ণ সারেনি।

একটা বিবর্ণ কাগজে স্যাঁতসেঁতে ধেবড়ে যাওয়া কালির লেখা সত্ত্বেও পড়া যাচ্ছে— মহালগ্ন মেঘের মতো উড়ে যাচ্ছে। বৃথা হতে দেব কি দেব না বুঝতে পারি না। যদি তাকে হারাই সারাজীবন দুঃখ পাব, যদি তাকে পাই, তারপর কী, আমি জানি না। কিন্তু তিকানের জ্যোৎস্নামাখা চোখের জল ভুলব কী করে।

নীলাঞ্জনা একভাবে তার মুখের দিকে চেয়ে আছে দেখে পরীক্ষিৎ বলল, ‘এসব তুমি পেলে কোথায়? আমার তো মনেই ছিল না। কবিতাগুলোর কোনওটাই তো আর লিখতে পারিনি।’

‘আমি ভাবতাম তুমি একা, একেবারে নিঃসঙ্গ।’

‘সে তো এখনও।’

সেকথা না ধরে নীলাঞ্জনা প্রশ্ন করল, ‘পরী কি তোমারই মেয়ে?’

পরীক্ষিৎ মুখে মৃদু হাসি নিয়ে বলল, ‘তোমার কী মনে হয়?’

‘তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই।’

‘আমি না বললে তুমি নিজে বুঝবে না? বলা-না-বলায় সত্যিটা কি বদলে যায়? তাছাড়া, নীলাঞ্জনা, আমাদের কিন্তু এখন ঈর্ষাকাতর হবার বয়েস না।’

‘তিকানরা কি এখন থেকে এখানেই থাকবে?’

‘সেটা এখনই বলা যাচ্ছে না। ওদের অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে। বালিসোনায় নতুন বাড়ির কয়েকটা ফ্ল্যাটই তো ওদের পাওনা। দেখা যাক কতদূর কী হয়। তবে মিতা ওদের ছাড়তে চাইবে কিনা জানি না।’

কথার মধ্যেও তার কান-মন তিকানের গানের দিকে বার বার চলে যাচ্ছে দেখে নীলাঞ্জনা ব্যথিত ও অধৈর্য হয়ে বলল, ‘যাও, যাও, তিকানের গান বয়ে যাচ্ছে, তুমি যাও!’

জন্মাষ্টমীর দিন মিতার চাপে মা-মেয়েকে সারা রাত কীর্তন গাইতে হল। মাঝে একবার গলা বসে যাওয়ায় তিকান বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ভোরের দিকে নতুন পদ ধরল। আলো ফোটা পর্যন্ত শুনে পরীক্ষিৎ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। পথে মানুষ নেই, শুধু লরির সারি। বালি রড পাথরকুচি বোঝাই করে ভোরের হাওয়ায় বিশ্রী শব্দ তুলে চলেছে।

মন্থরোর মা-র নানা যেদিকটায় জঙ্গল কেটে বসতি পত্তন করে গেছে, তার সামনের অংশে বালি আর পাথরকুচির পাহাড় দেখে পরীক্ষিৎ দাঁড়াল। সারি সারি মজুররা হাতের পলিথিনের প্যাকেটের চুল্লুতে নেড়েবিস্কুট ভিজিয়ে সকালের চা-পান সেরে নিচ্ছে। সূর্য গোল হয়ে দেখা দিলেই তাদের দিনের কাজ শুরু হবে।

চোখে ঘুম, শরীরে অবসাদ নিয়ে পরীক্ষিৎ ফেরার পথে রাস্তা সংক্ষেপ করতে রেললাইন ধরল। স্পষ্ট দেখল, তার পাশে পাশে অম্বরীশ হেঁটে যাচ্ছে।

‘ঘরবাড়ির তলায় চাপা পড়ে সব মাটি মরে গেল রে! মাটি আর আকাশ ঢাকা পড়লে আর বেশি দিন বাঁচে না। মানুষের বুকের মানুষটাও মরে যায়।’ বলে অম্বরীশ যেন এর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস জোগাতে পরীক্ষিতের পিঠে বিরাট একটা থাবড়া মেরে তাকে লাইনের পাশে ফেলে দিয়ে চলে গেল।

অবনীমোহনের মৃত্যুর পর তাঁর রীতি অনুযায়ী পরীক্ষিৎ প্রতিবছর ফাল্গুনের গোড়ায় বালিসোনার মানুষকে বসন্তের প্রতিষেধক তিন সপ্তাহের তিন ডোজ মেলাড্রিনাম-২০০ বিলি করে। এবছর ওষুধের মোড়কখুলে সবাই দেখল মোড়কের একপিঠে ‘মাটি ও আকাশ ঢাকা পড়লে মরে যায়’, আরেক পিঠে ‘মুমূর্ষুকে বাঁচানোই মানুষের ধর্ম’ কথাগুলো ছাপানো রয়েছে।

গানের মিছিলেও পরীক্ষিতের নতুন নতুন বিষাদগাথার অংশ-বিশেষের সঙ্গে এই কথাটাও তুলে ধরা হল। বিষাদগাথা সংবাদপত্রে প্রকাশের পরদিনই পোস্টার হয়ে সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। কোনও কোনও পোস্টার গোটা রাজ্যের দেওয়ালে-দেওয়ালে সাঁটা দেখতে পাওয়া যায়। ‘মাটি ও আকাশ’ আর ‘মুমূর্ষুকে বাঁচানো’ এভাবেই শহরে, গ্রামে, জেলায়-জেলায় ক্রমশ দেওয়াল থেকে তরুণদের মুখে মুখে ঘুরতে লাগল।

শনিবার ভোরে সদর দরজায় জোর কড়ানাড়ার শব্দে পরীক্ষিতের ঘুম ভেঙে গেল। জাহাঙ্গীর মারা যায়নি ভেবে তার মন নানা দুর্যোগের মধ্যেও ভরসা পেল। দারোয়ানেরও আগে গিয়ে সে দরজা খুলে দিল। সামনে বারোজন সশস্ত্র পুলিশ। প্রথম তিন অফিসারের একজন বললেন, ‘আপনাকে আমাদের সঙ্গে হেডকোয়ার্টার্সে যেতে হবে। চলুন।’

‘এভাবে গেঞ্জি পরে যেতে পারব না, জামা গায়ে দিয়ে আসছি।’

‘পাঁচ মিনিট সময় দিলাম। প্লিজ ডোন্ট ট্রাই টু বিফুল আস।’

নীলাঞ্জনা, অরণ্য, মিতা, তিকান— সকলেই

দরজা আগলে রাখা অফিসারদের কাছে জানতে চাইল, পরীক্ষিৎকে এভাবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কেন? কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? তার বিরুদ্ধে অভিযোগ কী?'

'আজই কোর্টে প্রোডিউস করা হবে, সেখানে সব জানতে পারবেন।'

সরকারপক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হল। বালিসোনা সহ পার্শ্ববর্তী আরও কয়েকটি জেলায় এবার একসঙ্গে সব ক'টি প্রতীকচিহ্নে ছাপ মেরে যেভাবে নিঃশব্দে ভোট পণ্ড করা হয়েছে তার পিছনে পরীক্ষিতেরই মাথা আছে বলে পারিপার্শ্বিক প্রমাণ মিলেছে। ন'বছর আগে রাসমাঠে আধা-সেনাবাহিনীর ওপর সশস্ত্র হামলার পিছনেও পরীক্ষিতের সক্রিয় সহযোগিতা ছিল। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বৃহত্তর যুদ্ধ ঘোষণার জন্য গানের মিছিলের মাধ্যমে সে একটা বিরাট বাহিনী গড়ে তোলায় সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। এরই দিদি লক্ষ্মীপ্রতিমার গ্রিন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেও পরীক্ষিৎ আলাদা ট্রেনিং স্কিম চালু করেছে। স্কুলের স্টুডেন্টদের সাঁতার, জিমনাস্টিক, ক্যারাটে, আর্চারি, হর্স রাইডিং শেখানো হচ্ছে। তাদের প্রতিষ্ঠিত মঙ্গলমঞ্চ অনেকদিন ধরেই সরকারি প্রশাসনের সমান্তরালে নিজেদের বেআইনি বিধিবিধান চালু করার চেষ্টা করছে। সম্প্রতি বালিসোনায় শতকরা আশি ভাগ জমিতে নির্মাণ নিষিদ্ধ করার গোপন ষড়যন্ত্রেও সে লিপ্ত। পরীক্ষিৎ চার বছর এগারো মাস বিদেশে থাকার সময় স্পেনের গ্রানাডা শহরে ও আলমেরিয়া বন্দরে গিয়েছিল। সেখানে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ করে শাসক উচ্ছেদের অঞ্চলভিত্তিক লড়াইয়ের রীতি-নীতি বিষয়ে তাদের পরামর্শ নিয়েছে। অতএব মহামান্য আদালতের কাছে পুলিশের আবেদন, অভিযোগের পক্ষে পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণ উদ্ধারের কাজে সহায়তার জন্য পরীক্ষিৎকে তিরিশ দিন পুলিশি হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেওয়া হোক। আদালত পুলিশের প্রার্থনা মঞ্জুর করল।

সারা রাত গোয়েন্দাদের জেরার উত্তরে পরীক্ষিৎ জানাল— রাসমাঠে আধাসেনা-জঙ্গলসন্ত্রাসীদের সংঘর্ষ চোখে দেখার আগে সন্ত্রাসীদের সে জানতই না, ভোট পণ্ড করতে সে কখনও কাউকেই বলেনি, যা করেছে মানুষ নিজের বিবেচনায় করেছে, গানের মিছিল মানুষের মনে দয়ামায়া করুণার বীজ ছড়ানোর সংগীত-উৎসব ছাড়া অন্য কিছু নয়, সে চারবছর এগারো মাস বিদেশে ছিল, শুধু গ্রানাডা ও আলমেরিয়াই নয়, আন্দালুসিয়ার কর্ডোবা-গ্রানাডা ছাড়াও স্পেনের আরও অনেক জায়গায় সে ঘুরেছে, রাশিয়ার কির্কিনেস বন্দর থেকে জাহাজে বিশ্বের উত্তরতম শহর

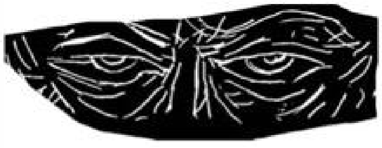

আকাশের যে-জায়গাটা জুড়ে আগে ক্রেনের নড়াচড়া ছিল ঠিক সেখানকার বহুতল বাড়ির আলোকিত ব্যালকনির সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্র অনর্গল কথা বলে তার বনবাস যাপন করে চলেছে। আজও সে কথা বলায় মগ্ন ছিল, পিছনের রাস্তায় ভোরের সগর্জন বানরসেনার মিছিল দেখে সেও মিছিলের সামনে গিয়ে একবার বাঁহাত একবার ডানহাত তুলে-বাড়িয়ে তার বানরসেনা পরিচালনা করতে লাগল।

হ্যামারফেস্ট হয়ে নরওয়ের মধ্যযুগের রাজধানী বার্জেন পর্যন্ত বহু বন্দরশহরে সে নেমেছে, কোথাও কোনও সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে তার কখনও সাক্ষাৎ হয়নি। লক্ষ্মীদির স্কুলে মিলিটারি ট্রেনিং না, প্রকৃত মানুষ গড়ার বিশেষ প্রশিক্ষণসূচি তৈরিতে লক্ষ্মী-লিওনার্দোর সঙ্গে সেও মাথা ঘামিয়েছে মাত্র। তবে, আশি ভাগ জমি খালি রাখার কথাটা অবশ্য একশো ভাগ সত্যি। বালিসোনার কোথাও কোনও ঘরবাড়ি, দোকান-বাজার নির্মাণ করতে হলে পুরো জমির শতকরা আশি ভাগ খালি রাখার স্বপ্ন তো সে তার লেখাতেও বলেছে। কিন্তু মানুষের প্রতি এ তার অনুরোধ ও প্রার্থনা। সশস্ত্র আন্দোলনের আহ্বান নয়।

চারদিন ধরে পরীক্ষিতের একই কথা শুনতে শুনতে গোয়েন্দা অফিসাররা কৌশল বদলে সারা রাত তার চোখের সামনে এক হাজার ওয়াটের দুটো ফ্লাড লাইট জ্বালিয়ে রেখে তার বলা না-বলা কথা ধরে-ধরে অর্থহীন অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে গেল। পাঁচ-ছ ফুটের মধ্যেই ওই তীব্র আলো জ্বলে ওঠা মাত্রই তার গাল ও কপাল আগুনের তাপে ঝলসে যায়। চোখে কিছুই দেখতে পায় না।

গ্রেপ্তারের চব্বিশ ঘণ্টা পর, রবিবার ভোরে গানের মিছিল থেকে গান ও গর্জন শুনে বাদাজোড়া নতুন নগরের বহুতল বাড়ির ফ্ল্যাটগুলোর জানলায় বারান্দায় আলো জ্বলে উঠল। পুরনো বালিসোনার মানুষ রাস্তায় নেমে এসেছে। আকাশের যে-জায়গাটা জুড়ে আগে ক্রেনের নড়াচড়া ছিল ঠিক সেখানকার বহুতল বাড়ির আলোকিত ব্যালকনির সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্র অনর্গল কথা বলে তার বনবাস যাপন করে চলেছে। আজও সে কথা বলায় মগ্ন ছিল, পিছনের রাস্তায় ভোরের সগর্জন বানরসেনার মিছিল দেখে সেও মিছিলের সামনে গিয়ে একবার বাঁহাত একবার ডানহাত তুলে-বাড়িয়ে তার বানরসেনা পরিচালনা করতে লাগল। তার ফূর্তির কারণ ক্রেনের শূন্য জায়গায় আলোর মালায় সজ্জিত লংকাপুরী আক্রমণ করে এবার তার সীতাকে উদ্ধার করা যাবে। সারা রাত তর্জনী তুলে রাবণকে শাসাতে শাসাতে তার হাত ও মুখ ব্যথা হয়ে গেছে।

মিছিল এবার পুরো রাস্তা জুড়ে চলেছে, পাশাপাশি আটজনকে এভাবে আগে কখনও দেখা যায়নি। দৈর্ঘ্যেও এই মিছিল আগের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। গান ছাপিয়ে এরকম গর্জনও আগে কেউ শোনেনি। এক পুলিশ অফিসার ও দুজন কনস্টেবল লাঠি উঁচিয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে মিছিলের সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার সময় কেউ কেউ সেটাকে মিছিলের ওপর পুলিশের লাঠি চার্জ ভাবলেও মিছিল নির্ভয়ে একইরকম উদ্দীপনায় এগোতে লাগল।

পরের রবিবার মিছিলের দৈর্ঘ্য আরও বাড়ল। পরীক্ষিতের মুক্তির দাবিতে লেখক শিল্পী গায়ক অধ্যাপক অভিনেতারাও পথে নেমে এসেছেন। ছুটির দিনের সকালের চা-জলখাবারের উদ্যোগ না করে মেয়েরাও ঘর ছেড়ে মিছিলে পা মিলিয়েছে।

গ্রেপ্তারের তৃতীয় রবিবার ভোর থেকে বালিসোনার প্রধান প্রধান রাস্তায় ১৪৪ ধারা জারি করা হল। শেষ রাত থেকেই পুলিশের জীপ থেকে মাইকে বারবার অনির্দিষ্টকালের জন্য ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকার ঘোষণা করা হতে লাগল, সকলের বোঝার জন্য এ-ও বলা হল— কোথাও একসঙ্গে পাঁচজনের বেশি লোক জড়ো হবেন না, হলেই পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করবে।

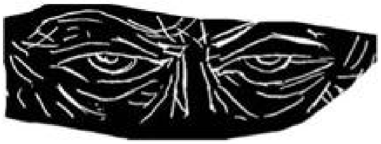

‘ঘোড়ায় চড়ে যেতে চাও? আমরা তার ব্যবস্থাও করতে পারি।’ লালকমল বিশদ করে দেয়, ‘স্টেশনের ওধারে জঙ্গলে ঢাকা একটা গোরস্থান আছে, সেখানে সাদা ধপধপে দাড়িওলা এক বুড়ো মুসলমানের খুব সুন্দর একটা ঘোড়া আছে। ছোটবেলায় আমরা দুভাই সেই ঘোড়ায় চড়ে অনেকবার জঙ্গলে আছাড় খেয়েছি।’ এবার নীলকমল— ‘যদি চড়ো, খানিকক্ষণের জন্য চেয়ে আনতে পারি। আমরা চাইলেই দেবে। আমাদের ও বলে লব-কুশ।’

ঘোষণা শুনেও অনেকে এল, অনেকে এল না। অধিকাংশ মানুষ ঘোষণা না শুনে চলে এসেছে। মেয়েরা আজ সংখ্যায় আরও বেশি। কেউ কেউ শিশু-কোলেই এসেছে। টিভিতে খবরের কাগজে খবর দেখেও বহু লোক ট্রেন থেকে নেমে মিছিলে পা মেলাচ্ছে। বাস-রাস্তার দুধারে যেখানে মরুভূমির মতো আদিগন্ত শুকনো জমি সেইখানে মিছিলের পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট পুলিশবাহিনী। মিছিলও দাঁড়িয়ে গেছে। অনেকে রাস্তায় বসে পড়েছে। মাইক হাতে পুলিশ প্রথমে ১৪৪ ধারার কথা জানিয়ে এই জনসমাবেশ বেআইনি ঘোষণা করে সকলকে শান্তিপূর্ণভাবে বাড়ি ফিরে যেতে বলল। একজনও পুলিশের কথায় কান দিচ্ছে না দেখে, ঘড়ি ধরে সময় বেঁধে দেওয়া হল। তার মধ্যে রাস্তা ফাঁকা না করলে সকলকেই গ্রেপ্তার করা হবে। এজন্য সারি সারি পুলিশ-ভ্যানও তৈরি রাখা হয়েছে।

উনত্রিশে আগস্ট সকাল ন'টা পঁচিশে পুলিশবাহিনী আবালবৃদ্ধবণিতা নির্বিচারে মিছিলের ওপর লাঠিচার্জ করল। যাদের পারল তাদের টেনে হিঁচড়ে ভ্যানে তুলল। অনেক কবি-শিল্পী অধ্যাপক ও বয়স্ক মানুষ নিজেরাই এগিয়ে এসে ঠেলাঠেলি করে ভ্যানে উঠে গেলেন।

পরদিন তিরিশে আগস্ট সকালে স্কুল-কলেজ দোকান-বাজার অফিস আদালত বন্ধ করে রাস্তায় মানুষের ঢল নামল। মিছিল থেকে গানের বদলে সেদিন শুধু আকাশ কাঁপানো গর্জন উঠতে থাকল। বিকেল তিনটে সতের মিনিটে শুরু হয়ে পুরো তিনঘণ্টা ধরে পুলিশের গুলিবর্ষণের উত্তরে মিছিল থেকেও গুলি ও গ্রেনেডের যুদ্ধ চলল। রিভলবারের গুলি ছাড়াও গামছায় মুখ ঢাকা চারজনের প্রত্যেকের হাতে ছোট আকারের পাঁচনলা থেকে একসঙ্গে পাঁচগুলি ছুটে গিয়ে একেকবারে পাশাপাশি তিন-চারজন পুলিশকে এফোঁড়-ওফোঁড় করতেও দেখা গেল। দুটি কিশোরের ক্ষিপ্র ও লক্ষ্যভেদী গ্রেনেড নিক্ষেপ যে দেখল সে-ই অবাক হল। মিতা, নীলাঞ্জনা, নন্দিনী, তিকান, লক্ষ্মী, চিরন্তনী, লিওন ছাড়া মিছিলের আর কেউ তাদের চেনে না। এমনকি পরীও পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে হাসপাতালে সেরে না ওঠা পর্যন্ত তাদের চিনত না। সন্ধের অন্ধকারে পুলিশের হতাহতের সঙ্গে মিছিলের নিহত ও গুরুতর আহতদের দুটো আলাদা কালো ভ্যানে তুলে নেবার আগেই জ্ঞানহীন পরীকে নিয়ে লিওন লক্ষ্মী নীলাঞ্জনা ও তিকান হাসপাতালে চলে এল। দ্রুত অপারেশন করে বাহু থেকে তার গুলি বের করে দেবার তিনঘণ্টা পর পরী যন্ত্রণায় চোখ মেলে নীলাঞ্জনা ও তিকানের সঙ্গে লালকমল-নীলকমলকে দেখে ক্ষীণ গলায় বলল, ‘ওরা কে মা? কাল মিছিলেও দুজনকে দেখেছি।’

‘কাল নয়, আজই মিছিলে দেখেছিস। ওরা লালকমল-নীলকমল, দুভাই, নীলাঞ্জনার ছেলে। কাল তোকে বাড়ি নিয়ে যাব।’

‘কোন বাড়ি? নদীয়ায় নদীর ধারের বাড়ি? নাকি এখানে দাদুর বাড়ি? নাকি মিতাদিদিমার বাড়ি? আমরা কোথায় যাব মা?’

লালকমল-নীলকমল এতক্ষণ সব দেখছিল আর শুনছিল। এবার লালকমল বলল, ‘আমাদের বাড়িতেই নিয়ে যাব।’ নীলকমল ধরতাই দেয়, ‘ঘোড়ায় চড়ে যেতে চাও? আমরা তার ব্যবস্থাও করতে পারি।’ লালকমল বিশদ করে দেয়, ‘স্টেশনের ওধারে জঙ্গলে ঢাকা একটা গোরস্থান আছে, সেখানে সাদা ধপধপে দাড়িওলা এক বুড়ো মুসলমানের খুব সুন্দর একটা ঘোড়া আছে। ছোটবেলায় আমরা দুভাই সেই ঘোড়ায় চড়ে অনেকবার জঙ্গলে আছাড় খেয়েছি।’ এবার নীলকমল— ‘যদি চড়ো, খানিকক্ষণের জন্য চেয়ে আনতে পারি। আমরা চাইলেই দেবে। আমাদের ও বলে লব-কুশ।’

পরী ক্ষীণ স্বরেই বলল, ‘তোমাদের ছোটবেলায়— সেটা কবে? তোমরা তো এখনও ছোটই।’

‘আগে ছিলাম। এখন আমরা বড় হয়েছি। পনেরো শেষ করে ষোলয় পড়েছি আমরা।’

‘খুব হয়েছে, এখন বাড়ি চ' তো। আগে তো কখনও এরকম স্কুল থেকে একা চলে আসতি না?’

‘মা, তুমি কেন ভুলে যাও, পাহাড়ের দেশে আমরা অনেক কিছু শিখেছি। পাহাড়ে চড়তে শিখেছি, তীরধনুক দিয়ে খরগোশ, সাপ, বনবেড়াল শিকার করতে শিখেছি। গুলতি দিয়ে পাখির ছানা খেতে আসা ঈগল তাড়াতে পারি। মহুয়া খেতে শিখেছি, আদিবাসীদের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে নাচতে পারি, পাহাড়ি নদী হেঁটে পার হতে পারি, ঝরনার মধ্য দিয়ে চলে যেতে পারি।’ দুভাই পালা করে তাদের একেকটা সিদ্ধির কথা বলে যায়।

‘স্কুলে এইসবই শেখায় বুঝি?’

‘না, না, স্কুলের বাইরে শিখি এসব। স্কুলে জানতে পারলে কড়া শাস্তি দেবে।’

‘তাই বলে মহুয়া খাবি? ওসব খাই আমরা?’

‘খেতে খারাপ না মা। ছোটবেলায় একবার বিজয়া দশমীর দিন দারোয়ানের ঘরে সিদ্ধি খেয়েছিলাম, মিষ্টি-মিষ্টি, সেরকম খেতে। আমরা সাঁওতালদের সঙ্গে মোটে দুদিন খেয়েছি।’

পরী প্রথম থেকে দুভাইয়ের মুখের দিকে অনিমেষে তাকিয়ে তাদের অদ্ভুত সব বাহাদুরির কথা শুনছিল, কিছুক্ষণ পর অ্যানাসথেসিয়ার রেশ পুরোপুরি কেটে যেতে যন্ত্রণায় তার মুখ বেঁকে গেল, শেষদিকে ওদের কথায় আর মন দিতে পারল না। ব্যথা কমার বড় ট্যাবলেট খেয়ে তার আবার ঝিমুনি এল।

তাদের বাবাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে খবর পেয়ে দুভাই পাহাড়ের খাঁজে জঙ্গলের মধ্যে পড়ে থাকা পলিথিনের চাদরে মোড়া পিসবোর্ডের বড় বড় বাক্সভরা গ্রেনেড থেকে লুকিয়ে বেশ কয়েকটা নিয়ে বালিসোনা এসেছিল। মালগাড়ি থেকে পাহাড়ের বন্দুকবাজদের লুট করা সব জিনিস উদ্ধার হলেও পুলিশ এই গ্রেনেডের বাক্সগুলোর সন্ধান পায়নি শুনে অনেকদিন ধরে লালকমল-নীলকমল পাহাড়ে জঙ্গলে তন্ন তন্ন করে খুঁজে শেষ পর্যন্ত গ্রেনেডের হদিশ পেয়েছে।

বাবাকে পুলিশ লোহার গরাদ দেওয়া ঘরে

আটকে রেখেছে শুনে দুভাই মাকে বলল, 'গরাদ ভেঙে বাবাকে আমরা দুজনে বের করে আনব মা?'

'ওরকম করা যায় না। এসব কথা আর কখনও মুখেও আনিসনি।'

আদালতের জামিন পেয়ে পরীক্ষিৎ বাড়ি ফিরে দিনের বেলা গাঢ় কালো চশমা পরে থাকে। রাতে পারতপক্ষে আলো জ্বালানো হয় না। জ্বালালে রাতেও তাকে রোদচশমা পরে নিতে হয়। আলো তার চোখে সয় না।

রবিবারের সংগীতমিছিল চলতেই থাকে। এরপর প্রতিবছর উনত্রিশে আগস্ট, তিরিশে আগস্ট বালিসোনার শোকদিবস হিসেবে পরপর দুদিনই মিছিল বেরবে ঠিক হল। একদিন মৌন মিছিল, আরেক দিন গানের।

৩৬

স্কুলের শেষ পরীক্ষা দিয়ে লালকমল-নীলকমল বাড়ি ফিরে এল। পরীক্ষার ফল বেরলে বড় শহরে কলেজে ভর্তি হবে। তার আগে দুজনে দিনের পর দিন বালিসোনার এপাড়া-ওপাড়া এগ্রাম-ওগ্রাম, বনজঙ্গল, খালবিল, পোড়োজমি, জলাভূমি ঘুরে ঘুরে জরিপ করে শেষ পর্যন্ত তাদের স্কুলের দেশের মতো পাহাড় বানানোর বাসনা ত্যাগ করল। স্কুলের দিনগুলোতে পাহাড়ের কোলে, ওপরের জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে দুভাই কতদিন বালিসোনায় এরকম একটা দীর্ঘ পাহাড়ের স্বপ্ন দেখেছে। পাহাড়ের পিছনে রোজ সূর্য ডুবে গিয়েও সারা পশ্চিম আকাশ অদ্ভুতভাবে রাঙিয়ে দেয়, দুভাই ভেবেছিল বালিসোনায়ও ওরকম আকাশ হবে। তার বদলে বাদা জুড়ে বিরাট একটা নতুন শহরে আকাশ ঢাকা পড়ে গেছে, সারি সারি বহুতল বাড়ির আড়ালে অস্তগামী সূর্য তার রঙের পাপড়ি মেলতে পারে না।

মিতা দুই ভাইকে ঘরে ডেকে নিয়ে তাদের কাছে পাহাড়ের গল্প শোনে। পরীকে শোনায়। লালকমল সেখানকার সূর্যাস্ত আর এখানকার সূর্যাস্তের মধ্যে তুলনা করে একদিন বলল, 'এইসব আকাশ ফুঁড়ে ওঠা বাড়ি কী করে গুঁড়িয়ে দেওয়া যায় বলো তো? দিয়ে আবার এখানে ঘাস-মাটি ভরিয়ে দেওয়া যায় না?'

হুবহু অম্বরীশের মন। মিতা আর ভয় পায় না। তার স্বামীর স্বপ্নের কথা মনে করে বলল, 'ঘাস মাটির তলায় নদীও হয়তো আবার খুঁজে পাওয়া যায়।'

একা পরীর সঙ্গেও দুভাইয়ের অনেক কথা হয়। কখনও লালকমল-নীলকমল একসঙ্গে আসে, কখনও আলাদা। তখন বাইরে থেকে মিতার সঙ্গে ফিরে এসে তিকান যদি কীর্তন গাইতে শুরু করে, দুভাই-ই কিছুটা শুনে উঠে

লালকমল সেখানকার সূর্যাস্ত আর এখানকার সূর্যাস্তের মধ্যে তুলনা করে একদিন বলল, 'এইসব আকাশ ফুঁড়ে ওঠা বাড়ি কী করে গুঁড়িয়ে দেওয়া যায় বলো তো? দিয়ে আবার এখানে ঘাস-মাটি ভরিয়ে দেওয়া যায় না?'

পড়ে। কীর্তন তাদের ভালো লাগে না। কিন্তু পরী একলা যদি তাদের জন্য গায় তাহলে তারা চুপ করে বসে শোনে। পরী গাইতে গাইতে একবারও চোখ খোলে না বলে সে জানতে পারে না লালকমল-নীলকমল গান শোনার থেকে বেশি তার মুখের দিকে চেয়ে আছে।

রাজধানীর বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা শেষ না করে অরণ্য ফিরে এল। সারা দিন একরকম, সন্ধে হলে কেমন ঢুলুঢুলু চোখে বসে বসে ঝিমোয়। কেউ কিছু না বললে সে নিজে থেকে কথা বলে না। নীলাঞ্জনা সন্দেহবশে অরণ্যর জিনিসপত্র খোঁজাখুঁজি করতে করতে ম্যাগ ফস ১২X লেখা একটা শিশি দেখতে পায়। ভেতরে ম্যাগ ফসের বড়ির বদলে সাদা পাউডার। শিশির বেশিটাই খালি।

প্রদীপ অনেকদিনই দিল্লির পাট তুলে দিয়ে বালিসোনায় ফিরে দিনরাত ইংরিজিতে কী একটা বই লিখছে। সরোজিনীর মৃত্যুর পর থেকে শুধু সংগীতমিছিল নয়, বালিসোনার সব কিছু থেকেই সে নিজেকে সম্পূর্ণ গুটিয়ে নিয়েছে। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে সে কারও সঙ্গেই আর আগের মতো কথা বলে না। কেউ এসে কাচার জন্য জামাকাপড় চাইলে বের করে দেয়। খাবার দিয়ে গেলে খেয়ে নেয়। কথা বিশেষ না বললেও কখনও কখনও তাকে কথায় পায়। তখন একবার শুরু করলে আর থামতে চায় না। মাঝেমাঝে অসংলগ্ন কথাও বলে।

একদিন দুপুরে অরণ্য কিছু টাকা চাইতে এসে জিজ্ঞেস করল, 'সারা দিন আপনি কী লেখেন ছোট্দাদু?'

অরণ্য তাদের বড়দাদুকে কোনওদিন দেখেনি, তার ছেলেকেই ছোট্দাদু বলে ডাকে।

'একটা বই, আস্ত একটা বই লিখছি।'

'কী নিয়ে লিখছেন?'

'আমার অটোবায়োগ্রাফি লিখছি। আসলে কী যেন একটা লিখতে চাই, হয়তো সুভাষচন্দ্র বসুর সত্যিকার জীবনী, অথবা হয়তো বালিসোনার ইতিহাস, কিংবা তেইশবিঘা-আমবাগানের আত্মকথা। বিষয়ের খেই হারিয়ে এক বিষয় থেকে আরেক বিষয়ে চলে যাচ্ছি রে। খুব ইচ্ছে করে মন্বন্তরের মার জীবনকথা লিখি। কোনওদিন হয়তো কপিখেতের যুদ্ধও লিখব। কিংবা আমার ঠাকুরদার শেষজীবন। টাকা নিয়ে তুই কী করিস?'

'এমনিই। আপনার অসুবিধা থাকলে, থাক।'

'না না, অসুবিধা কিসের? সারাজীবন তো শুধু আয়ই করেছি। বড় খরচ বলতে তো বই কেনা।' একটুক্ষণ চুপ করে থেকে কী ভেবে, আবার বলল, 'বই পড়ত বটে রাঙাকাকিমা। ওরকম বিদূষী নারী বালিসোনায় আর কখনও হবে কি না জানি না। অবশ্য চিরন্তনীর কথা বলতে পারব না, ওর একটা বই সম্প্রতি ইংল্যান্ড ও আমেরিকা থেকে একসঙ্গে পাবলিশড হয়েছে শুনলাম। আমি এখনও পড়িনি বা দেখিনি। চিরন্তনী আমাকে বলেছিল তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোয় দারিদ্র্যের মূল কারণ নিয়ে সে গভীরভাবে ভাবছে। হয়তো ওই বিষয়েই সে লিখেছে। হয়তো নাড়া দেবার মতো মৌলিক কোনও কথা সে বলতে পেরেছে। মুশকিল কী জানো, রাঙাকাকির কথা আমি ভুলতে পারছি না। ওঁর মনটা রবীন্দ্রনাথের যুগের মন। খানিকটা পেয়েছে পরীক্ষিৎ। ও আর পাওয়া যাবে না।'

সন্ধেবেলা অরণ্য ঝিমধরা চেহারায় ঢুলুঢুলু চোখে বকুলবেদিতে বসতে গিয়ে দ্যাখে পরী অন্ধকারে লুকিয়ে বসে কাঁদছে। অরণ্যকে দেখে সে উঠে দাঁড়ায়। অরণ্য আরও একটু জায়গা ছেড়ে দিয়ে বলল, 'তুমি আমাদের পরী না? তুমি কাঁদছ কেন? তুমি এখানে বসলে আমার কোনও অসুবিধে হবে না। তোমার কিসের দুঃখ? আমার বাবাকে গিয়ে বলো, বাবা সকলের দুঃখ নিয়েই ভাবেন।'

পরী হাউহাউ করে কেঁদে উঠে আরও বেশি অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেল।

তিনদিন পর মিতা ও তিকান পরীক্ষিতের

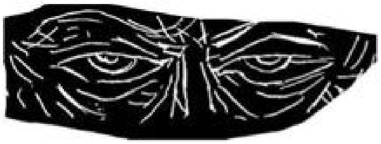

'সে কী! কী করে তুমি বুঝলে তুমি মা হতে যাচ্ছ?'
'সব মেয়ে যেভাবে বোঝে।'
'তুমি মা হলে, এর বাবা কে?'
'তোমরা জানো না? তোমরাই তো তার কাছে শ্রীচৈতন্যের নিজের হাতে লেখা চিঠি আছে বিশ্বাস করে যখন যা চেয়েছে দিয়েছ। সে-চিঠি তোমাদের দেখাবে বলেছিল না? দেখাতে পেরেছে?'
'নদীয়ায় আমার বাবার কাছে আসত, ভালো ছাত্র ছিল। খুঁজে খুঁজে ঠিক চলে এসেছে।'

ছাড়া পাওয়ার মানতের ঢিল খুলতে বিশালাক্ষীতলায় যাওয়ার সুযোগে দুপুরবেলা পরীকে একা পেয়ে লালকমল কী একটা বলতে গিয়েও কথা পাল্টে নিয়ে বলল, 'তোমার এ কী চেহারা হচ্ছে দিন দিন, রাতে ঘুমোও না?'

এই দুটি ছেলের ওপর পরীর অগাধ আস্থা, তার জন্য এরা করতে পারে না এমন কাজ নেই। তেমনই কোনও ভরসার কথা ভেবে বিষণ্ণ দুচোখ লালকমলের চোখের ওপর রেখে মৃদু স্বরে পরী বলল, 'সাত মাস পরে আমি মা হতে যাচ্ছি। তার আগে আমি আত্মঘাতী হব।'

'সে কী! কী করে তুমি বুঝলে তুমি মা হতে যাচ্ছ?'

'সব মেয়ে যেভাবে বোঝে।'

'তুমি মা হলে, এর বাবা কে?'

'তোমরা জানো না? তোমরাই তো তার কাছে শ্রীচৈতন্যের নিজের হাতে লেখা চিঠি আছে বিশ্বাস করে যখন যা চেয়েছে দিয়েছ। সে-চিঠি তোমাদের দেখাবে বলেছিল না? দেখাতে পেরেছে?'

'তোমার সেই টিচার?'

'নদীয়ায় আমার বাবার কাছে আসত, ভালো ছাত্র ছিল। খুঁজে খুঁজে ঠিক চলে এসেছে।'

'কণ্ঠীবদল না কী যেন বলো, তোমাদের কি তাই হয়েছে?'

'সামনের অঘ্রাণে বিয়ে হবে বলেছিল।'

'তাহলে এখনই বাবা হল কী করে?'

'তোমরা বুঝবে না।'

'কাল ও এলেই আমাদের খবর দেবে। হাত-পা বেঁধে ওকে দীঘিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসব।'

'তিন মাস হয়ে গেল আর আসে না, তোমরা জানো না?' বলেই মুখে হাত চাপা দিয়ে বমি আটকে দৌড়ে বাথরুমে যেতে গিয়ে মিতার সঙ্গে ধাক্কা লাগতে লাগতেও সে সামলে নিল। মিতা ভাবল ঘরে দুজনে হয়তো হাত ধরাধরি করে বসে ছিল, তাদের পায়ের শব্দে একজন লজ্জায় পালাল। দুই ভাইয়ের সঙ্গে পরীর গভীর বন্ধুত্ব। দেখে তিকান অসন্তুষ্ট হয়, মিতার ভারি ভালো লাগে।

সেদিন রাতে আরেকবার বমি করতে উঠে সে তিকানের কাছে ধরা পড়ে গেল।

পরদিনই ভোরে তিকান এই দ্বিতীয়বার সকলের অগোচরে বালিসোনা ছেড়ে চলে গেল। প্রথমবার বাবাকে নিয়ে, এবার মেয়েকে নিয়ে।

দুজনে সত্যিই চলে গেছে আবিষ্কার করে মিতার বুক শূন্য হয়ে গেল। তার মনে হয় তার বড় একটা সম্পদ তার ঘুমের ঘোরে কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে। এক রাতেই তার জীবনের আরও একটা আশ্রয় যেন চুরমার হয়ে গেল।

বেলায় বাড়িময় শোরগোল উঠল। সকলেই বেকুব বনে গেছে। কাউকে কিছু না বলে, কোনও হদিশ না রেখে এভাবে হঠাৎ গৃহত্যাগের কারণ কেউ ভেবে পেল না। যত ভাবে তত অবাক হয়। ক্রমশ মা ও মেয়েকে চৌধুরী বাড়ির অধিকাংশ সদস্যেরই ভারি রহস্যময় মনে হয়।

এরপর তিকানদের সে বাঁচাবে কী করে, মিতার বুকের শূন্যস্থান ভরবে কী দিয়ে পরীক্ষিৎ ভেবে পায় না।

লালকমল-নীলকমল সকলের নজর এড়িয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে অনেক দূরে রেললাইনের ধারে পৌঁছেই দুজনে একসঙ্গে বুক উজার করে কেঁদে উঠল। অনেকক্ষণ কান্নার পর নীলকমল জিজ্ঞেস করল, 'ওর বাবা কে, কিছু বলে গেছে?'

'পরীর প্রাইভেটে পরীক্ষার সেই টিচার।'

'পরী চলে গেল কেন? পরীকে না দেখলে আমরা বাঁচব না। চল, ওকে খুঁজে বের করি। বলেছিল আত্মঘাতী হবে। আমরা হতে দেব না। বাচ্চাটাকেও বাঁচাতে হবে। আমরা দুজনে ওকে বড় করে তুলব।'

'আসলে আমাদের ভুলটা কোথায় হয়েছে জানিস?'

'কোথায়?'

'যখনই আমরা জানলাম, তখনই আমাদের দুজনের ওকে বিয়ে করে ফেলা উচিত ছিল।'

'দুজন ছেলে একটা মেয়েকে কি বিয়ে করতে পারে?'

'পারে না? চল, ছোট্‌দাদুকে গিয়ে জিজ্ঞেস করি। ছোট্‌দাদু অনেক কিছু জানে।'

দুজনকে ঘরে ঢুকতে দেখে প্রদীপ চশমা কপালে ঠেলে ওদের মুখ দেখতে দেখতে বলল, 'তোমরা কারা?'

'আমরা লালকমল আর নীলকমল। পরীক্ষিৎ চৌধুরীর ছেলে। আচ্ছা, দুটো ছেলে একটা মেয়েকে বিয়ে করতে পারে?'

'মেয়েটা রাজি হবে কেন?'

'হবে।'

'ছেলেদুটোই বা রাজি হবে কেন?'

'হবে।'

'দেশের আইন রাজি হবে না।'

'যমজ ছেলে হলেও না?'

'ওরে, আমি একটা-ছেলে হয়েও একজন মেয়েকে বিয়ে করতে পারলাম না, তোরা চাস দুজনে একটা মেয়েকে বিয়ে করতে! বেশ, তাই কর গিয়ে, এখন আমাকে লিখতে দে।'

সারা রাত পরিকল্পনা করে, সামান্য জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে ভোর হবার অনেক আগেই লালকমল আর নীলকমল পলাতকা পরীদের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল।

সাত মাস পরই পরীর পেট কাটা হবে কল্পনা করে ভয়ে তাদের বুক শুকিয়ে গেছে।

ক্রমশ

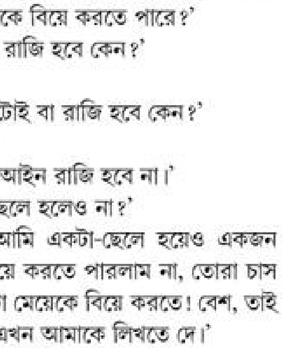

বারিদবরণ ঘোষ

পর্ব: ১১

উত্তরা

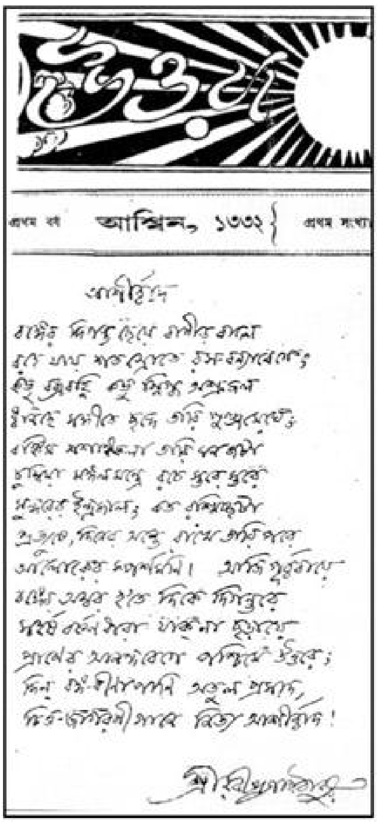

প্রথম সংখ্যায় আরম্ভপত্র, রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদবাণী

'প্রবাসী', 'প্রবাসজ্যোতি'র মতো বঙ্গদেশ থেকে বহুদূরে আরও— একটি মাসিক পত্রিকার জন্ম হল; জন্ম হল নাড়ির টানে— কাশী থেকে এলাহাবাদ-লখনউ হয়ে বঙ্গদেশ পর্যন্ত এই টান পরিব্যাপ্ত। কাশীতে আছেন সুরেশ চক্রবর্তী ('চন্দ্র'বিহীন হয়েছিলেন কবি-গায়ক সুরেশচন্দ্র থেকে পৃথক থাকার কারণে)— আপাদমস্তক সাহিত্যমগ্ন এবং লখনউতে অতুলপ্রসাদ— স্বনামধন্য ব্যবহারজীবী। একদা এক শুভলগ্নে সুরেশ চক্রবর্তী এক মজলিশে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আর মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলেন প্রবাসে 'প্রবাসী' ছাড়া আরও একটি সাহিত্যপত্র প্রকাশের। তাতেই প্রকাশিত হয়েছিল স্বল্পায়ু 'প্রবাসজ্যোতি'। এর রূপকার হয়েছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ ব্যারিস্টার এ পি সেন— অতুলপ্রসাদ সেন। সে ছিল ১৩২৭ সালের কথা।

'প্রবাসজ্যোতি' একবছরের মাথায় জ্যোতিহারা হয়ে পড়ল বটে, কিন্তু চিরযুবা সুরেশ চক্রবর্তী তাতে দমবার পাত্র নন। কাশী থেকে তিনি অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে সঙ্গে নিয়ে পরের বছরেই বের করলেন মাসিকপত্র 'অলকা'। রবীন্দ্রনাথ একে আশীর্বাদ করলেন। 'অলকা'ও ক্ষণস্থায়ী হল। প্রধান কারণ অর্থের অনটন। অতঃপর তার সন্ধান শুরু করলেন সুরেশবাবু।

কাশীর মতো কানপুরেও সেসময়ে সেখানের 'বঙ্গসাহিত্য সমাজ'-এর উদ্যোগে একটি পাঠাগার গড়ে উঠেছিল স্থানীয় বাঙালিদের অনুপ্রেরণায়। এরই একটি বার্ষিক উৎসবে যোগ দিতে লখনউ থেকে উপস্থিত হলেন অতুলপ্রসাদ। তাঁর প্রস্তাবে এখানে একটি সম্মিলনী স্থাপিত হল— 'উত্তর ভারতীয় বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন'। এর প্রথম অধিবেশন বসল কাশীতে ১৩২৯ সালে ফাল্গুন মাসের ১৯ তারিখে। সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ্বিতীয় অধিবেশন বসল এলাহাবাদে, পরের বছরের পৌষ মাসে— সম্মেলনের নাম বদলে গিয়ে হল 'প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন'। এবং তার পরের বছর তৃতীয় অধিবেশন লখনউতে— আহ্বায়ক অতুলপ্রসাদ স্বাগতভাষণে বললেন: 'প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের মধ্যে সাহিত্য-সাধনার একটা প্রবল ইচ্ছা দেখা দিয়েছে; তাহার ফলে বাঙ্গালীবহুল কাশীনগরী হইতে কয়েকখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে 'অলকা', 'প্রবাসজ্যোতি' নির্বাপিতপ্রায়। সম্প্রতি সাহিত্যপ্রেমী শ্রী সুরেশ চক্রবর্তী কাশীধাম হইতে 'প্রবাসী বাঙালী' নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা বাহির করিতেছেন। আমি তাঁহার সাহিত্যোৎসাহের প্রশংসা করি এবং তাঁহার সুলিখিত পত্রিকার স্থায়িত্ব কামনা করি। আমি কিন্তু তাঁহাকে একটি মনোরম ও সারগর্ভ মাসিক পত্রিকা সম্পাদন বিষয়ে সহায়তা করিতে অনুরোধ করিতেছি। পত্রিকাখানি সচিত্র হইবে।'

সভাস্থলে হর্ষধ্বনি উঠল এবং তেত্রিশ বছরের সুরেশ চক্রবর্তী বিস্মিত— এমন পত্রিকার স্বপ্নই তো তিনি দেখছিলেন। অতুলপ্রসাদ কি তাঁর মনের ভাষা পাঠ করতে পেরেছিলেন? আসলে এটা শুধু একটা সাহিত্যবিলাসীর দিবাস্বপ্ন ছিল না— অতুলপ্রসাদ প্রস্তাবটি পেশ করার আগেই এর পরিকল্পনা বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করেছিলেন গভীরভাবে। বাংলার ভাষার প্রসার, প্রতিবেশী সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করা, বাংলা সাহিত্যকে একটা বিশেষ মর্যাদায় স্থাপন— ইত্যাদি ভাবনার সঙ্গে এ-ও তিনি ভেবে নিয়েছিলেন যে সুরেশ চক্রবর্তীর লালনে তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে। অর্থ সরবরাহ বিষয়ে তিনি তো আছেনই। তাই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পরেই তাকে কার্যকরী করার জন্য একটি পত্রিকাসমিতি গড়ে তোলা হল। সুরেশবাবু সভায় পূর্ব অভিজ্ঞতার কারণে জানিয়েছিলেন পরিকল্পিত পত্রিকাটি প্রকাশ করতে বছরে প্রায় তিনহাজার ছ-শো টাকা লাগবে। অতুলপ্রসাদ ভেবেছিলেন— এই টাকা সহজেই সংগ্রহ করা যাবে— এককালীন দান, মাসিক চাঁদা এবং গ্রাহক-সংগ্রহের নিষ্ঠিত উদ্যোগ থেকে।

পত্রিকা কমিটিতে নির্বাচিত হলেন অন্যান্যদের মধ্যে অতুলপ্রসাদ ছাড়া দুই ইতিহাসবিদ— রাধাকমল ও রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ভ্রাতৃদ্বয়, হীরেন্দ্রলাল দে এবং সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। উত্তরপ্রদেশের আরও ছ'জন কৃতী ব্যক্তিকে নিয়ে গড়া হল এগারো সদস্যের পরিচালন সমিতি। প্রথম উদ্যোগে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেল, অর্থপ্রদানের প্রতিশ্রুতিও উচ্চারিত হল। একটি মন্ত্রণা পরিষদও গড়া হল সরলাদেবী (চৌধুরানি)-কে সামনে রেখে। অতুলপ্রসাদ নিজে নাম রাখলেন পত্রিকার, উত্তরপ্রদেশের কথা মনে রেখে— 'উত্তরা'। আশ্বিন মাসের প্রথম দিবসে, ১৩৩২ বঙ্গাব্দে, ১০/১ নম্বর লাটুস রোড, লখনউ থেকে প্রকাশ পেল, পরবর্তীকালের মধ্যজীবী উন্নতশ্রেণির মাসিক সাহিত্যপত্রিকা 'উত্তরা'— 'সংবাদ-সাহিত্য' পত্রিকা নয়।

প্রস্তাবানুসারে সমস্ত উদ্যোগ প্রায় সম্পূর্ণ করে সুরেশবাবু ফিরে এলেন কাশীতে (পরে কাশীর ভেলপুরা অঞ্চলের তিনি আমৃত্যু বাসিন্দা ছিলেন)। তিনি একটা নেটওয়ার্ক বিস্তারের জন্য অতুলপ্রসাদের বকলমে দুটি চিঠির মকশো করে ছাপিয়ে বিতরণ করতে লাগলেন— অর্থসংগ্রহ এবং সংগঠনকে মজবুত করতে। এই উদ্যোগে হাজার টাকা পাওয়ার প্রতিশ্রুতি পেলেও গ্রাহকসংখ্যার ব্যাপারে উৎসাহিত হওয়ার মতো পরিস্থিতি দেখলেন না। অন্তত পাঁচশো গ্রাহক না হলে কাগজ চালানো যে দুষ্কর— অভিজ্ঞ সুরেশবাবু তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁরই বকলমে লেখা সুরেশের চিঠি পেয়ে অতুলপ্রসাদ সঙ্গে সঙ্গে করণীয় বিষয়ের তালিকা করে হবু সম্পাদকের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তাতে সুরেশবাবু যে একটু ক্ষুণ্ণ হননি— তা বলা যাবে না; কিন্তু প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করার সামর্থ্য তাঁর ছিল। রাধাকমলবাবুকে পাশে নিয়ে তিনি প্রেস ঠিক করলেন। অতুলপ্রসাদের সুবাদে তিনি শিল্পী অবনীন্দ্র-শিষ্য অসিতকুমার হালদারের সঙ্গে আগেই পরিচিত হয়েছিলেন। ভেবে নিয়েছিলেন তাঁকে দিয়েই প্রচ্ছদের ছবি আঁকিয়ে নেবেন।

এমন সময়ে অতুলপ্রসাদের মাতৃবিয়োগ ঘটল। মনের শান্তিবিধানের জন্য রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে তিনি শান্তিনিকেতনে চলে গেলেন, এরপর সেখান থেকে কলকাতা হয়ে সিমলায়। এহেন অবস্থায় সুরেশবাবুও অসহায় বোধ করতে লাগলেন। অতুলপ্রসাদই তাঁর বল এবং ভরসা। বাধ্য হয়ে সিমলাতে অতুলপ্রসাদকে চিঠি দিলেন ইতিকর্তব্য স্থির করার জন্য। অতুলপ্রসাদ উত্তর দিলেন। তাতে তিনি বলতে চেয়েছিলেন— পত্রিকা বের করতে হবে ১ আশ্বিন ১৩৩২ তারিখে, ছাপতে হবে চিন্তামণি

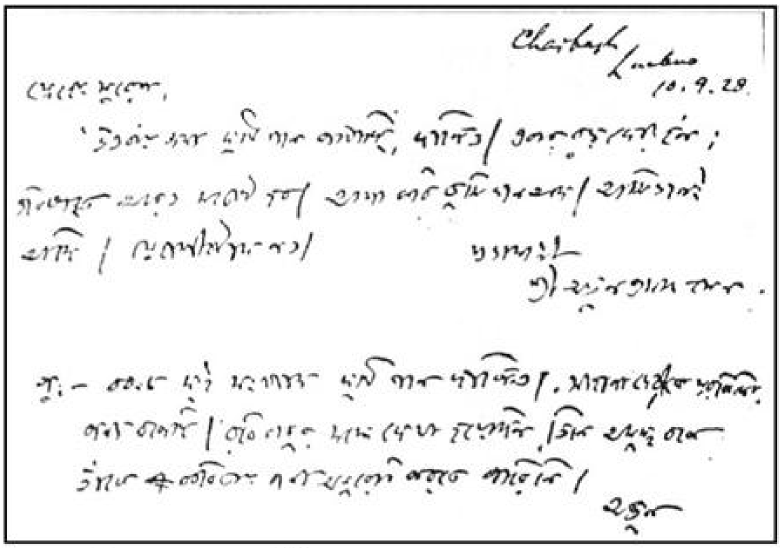
Charbagh
Lucknow

সুরেশ চক্রবর্তীকে লেখা অতুলপ্রসাদের চিঠি

ঘোষের ইন্ডিয়ান প্রেসে— খরচ পড়বে ফর্মাপিছু বারো টাকা; লখনউতে তাঁর অফিসের ঠিকানাই হবে পত্রিকা-দপ্তরের ঠিকানা; বিজ্ঞাপন নেওয়া যেতে পারে; জুলাইয়ের তিন তারিখে তিনি লখনউ ফিরবেন; ফিরে রবীন্দ্রনাথকে প্রবন্ধ ও কবিতা রচনার জন্য অনুরোধ জানাবেন; সরলাদেবী প্রদত্ত অভিভাষণও সংগ্রহ করে ছাপতে হবে; টাকা-পয়সা অন্যান্য ব্যাপারে সুরেশবাবুকে একবার আসতে হবে তিনি ফিরে এলে।

অতুলপ্রসাদ ফিরে এলেন এবং তাঁর জীবিকার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন। যেটুকু অবকাশ বের করতে পারতেন— তা 'উত্তরা'র ভাবনাতেই নিয়োগ করতেন এবং তাঁর ও সুরেশবাবুর যৌথ উদ্যোগে 'উত্তরা' প্রকাশিত হল অসিতকুমার হালদারের প্রচ্ছদ এবং রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ নিয়ে। অতুলপ্রসাদ লিখলেন একটি গান, 'তাহারে বলিব বল কেমনে?' —সাহানাদেবী-কৃত স্বরলিপি সহ। আরও অনেকের লেখা নিয়ে ১ আশ্বিন মহালয়ার দিনে 'উত্তরা' প্রকাশ পেতেই পত্রিকা হাতে নিয়ে লখনউয়ে অতুলপ্রসাদের কাছে হাজির হলেন সুরেশ চক্রবর্তী। পরে তাঁর স্মৃতিচারণে মুহূর্তটি ধরে দিয়েছেন সুরেশবাবু— 'গাড়ি-বারান্দার সম্মুখে অলিন্দে পায়চারি করছেন অতুলপ্রসাদ, গায়ে সুদৃশ্য রঙিন ড্রেসিং গাউন। টাঙা থামার শব্দে তাড়াতাড়ি হাসি হাসি মুখে এগিয়ে এসে বললেন, 'এই যে এসে গেছ। তোমারই অপেক্ষা করছিলাম। ট্রেন লেট করেনি দেখছি। কই, দেখি দেখি উত্তরা।'

এবং কাজ দেখে মন্তব্য করেছিলেন— 'কাগজ আমাদের ভালোই হয়েছে।' অসিত হালদারের হাতে কাগজ পাঠানো হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের কাছে। তিনি কাগজ পেয়ে বলে উঠেছিলেন— 'উত্তরা উত্তম হয়েছে।' বার্ষিক তিন টাকা চার আনা, প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা দামের সাহিত্যপত্রিকাটি মুদ্রণসৌষ্ঠব আর বিষয়গৌরবে পাঠকের মন জয় করে নিল। ছবিগুলির মুদ্রণসৌকর্যও ছিল আকর্ষক।

এরপরে প্রেস বদল হয়েছে। ঠিকানাও বদল হয়েছে, সম্পাদকীয় দায়িত্বেও পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু উত্তরার চরিত্রে উন্নতি বই অবনতি ঘটতে দেননি সুরেশবাবু। কিন্তু অচিরেই অর্থসঙ্কট প্রবল বাধা হয়ে দেখা দিল। পরিচালক সমিতির একটি বৈঠকে অতুলপ্রসাদ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন ইন্ডিয়ান প্রেসের পাওনা এবং পত্রিকা না ছাপার হুমকির ব্যাপারে তাঁর দায়িত্ব নেই— 'আমি এ টাকার জন্য দায়ী হতে পারি না। 'উত্তরা' সম্মেলনের কাগজ, দায়িত্ব সম্মেলনের।' কেউ কেউ বললেন— গ্রাহকদের জানিয়ে দেওয়া উচিত কাগজ বন্ধ করে দেওয়া হবে। তখন কাগজের তৃতীয় বর্ষ চলছে।

সুরেশবাবু তবুও মরিয়া হয়ে অতুলপ্রসাদের কাছে পাঁচশো টাকা চেয়ে বসলেন এবং বললেন আর কখনও চাইবেন না।

কিন্তু পাঁচশো টাকা দিয়ে কাগজ যে বাঁচানো যাবে না, তা সুরেশ চক্রবর্তীর চেয়ে কে বেশি জানেন? অতএব কাগজ বাঁচাবার

জন্য প্রথমেই ঠিকানা বদল করলেন তার। লখনউ থেকে কাগজ উঠে এল কাশীতে সুরেশবাবুর ঠিকানায়। আর টানাপোড়েন সহ্য হয় না। কাগজ অনিয়মিত হয়ে পড়ছে। গ্রাহক কমছে। এলাহাবাদ ছেড়ে দু-তিন সংখ্যা ছাপতে হয়েছে কলকাতার প্রেসেও। এখন ঠিকানা হল ‘উত্তরা প্রেস’ ভেলুপুরা রোড, কাশীধাম। মুদ্রক শরদিন্দু চক্রবর্তী।

পাঁচমিশেলি পত্রিকা। পাঠকদের চাহিদা মেনে কাগজে রচনার সম্ভার। লোকসাহিত্য, জনপ্রবাদ থেকে গান, উপন্যাস থেকে জীবনী, পৃথিবীর মাসিক ও সাময়িক পত্রিকাগুলো থেকে চয়ন করে ‘আহরণী’ বিভাগ। পুস্তক সমালোচনার পাশাপাশি কবিতা-নাটক এবং অবশ্যই গল্প এবং উপন্যাস। দীর্ঘদিনের যোগাযোগে একটা বড় লেখকগোষ্ঠীকে পত্রিকার পৃষ্ঠায় আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন সুরেশবাবু। রাধাকমল-রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ভ্রাতারা তো ছিলেনই, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও প্রথম সংখ্যা থেকেই লিখছিলেন। লিখছিলেন গোপীনাথ কবিরাজ, অবিনাশচন্দ্র মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং ‘দাদামশায়’ কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরে পরে এলেন মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রমোহন বাগচি, কালিদাস রায়, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, হুমায়ুন কবির, বন্দে আলি মিঞা, নরেন দেবের মতো কবিরাও। লিখতে শুরু করলেন রমেশচন্দ্র সেন, শিবরাম চক্রবর্তী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নিরুপমাদেবী, প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বাগচি, প্রবোধচন্দ্র বাগচি থেকে শুরু করে প্রমথ চৌধুরি, এমনকি নবীন মনোজ বসুও।

বত্রিশ বর্ষ থেকে শুরু করে শেষ অবধি যাঁরা লেখক হিসেবে পত্রিকায় সুবিদিত হলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বাণী রায়, আশাপূর্ণা দেবী, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, গোপাল হালদার, বনফুল থেকে আজও বর্তমান শক্তিপদ রাজগুরু পর্যন্ত।

ছবির জন্য তুলি ধরেছিলেন— অসিতকুমার হালদার, সারদাচরণ উকিল, অজিতকৃষ্ণ বসু, যামিনীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, আবদুর রহমান চুঘতাই থেকে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত। ‘উত্তরা’ তখন একটি পরিপূর্ণ মাসিক পত্রিকা। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের চিঠিতে এই পরিপূর্ণতার আস্বাদ (কার্তিক ১৩৩২) আগেই উচ্চারিত হয়েছিল:

‘উত্তর ভারতের প্রবাসী বাঙালীদের মুখপত্র ‘উত্তরা’ সেদিন কল্লোলের বিনিময়ে এসে যখন আমার হাতে পৌঁছল তখন সাগ্রহে সানন্দে এবং সগৌরবে তাকে মাথায় তুলে নিলেম। হাঁ, কাগজ বার করতে হয়তো এমন কাগজই বার হওয়া উচিত। প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে

অতুলপ্রসাদ সেন

লেখকের অভাব কোনদিনই নেই, হবেও না। তবে এতদিন তাঁদের নিমন্ত্রিত হবার যথাযোগ্য সুযোগ আসেনি, আজ এসেছে, এ সুযোগ অবহেলিত না হলেই সুখী হব। অতুলপ্রসাদ, কমল ভ্রাতৃদ্বয়, কবিরাজ, ভট্টাচার্য, রায়, মুখোপাধ্যায় প্রমুখ রথীরা যে প্রতিষ্ঠানের পাণ্ডা, তার বৈভব যে কোনদিন হ্রাস হবে এটা অবিশ্বাসের কথা, তার উপর তোমার সহকারিতা যাকে প্রাণশক্তি দেবে, তার সাফল্য সুনিশ্চিত। প্রথম সংখ্যা পড়ে ভারী খুশী হয়েছি। সবকটি লেখাই ভারী সুন্দর। বাঙলার কোন কাগজই একে প্রবন্ধ— সম্পদে এড়িয়ে যেতে পারবে না।’

এই টানেই তো ‘উত্তরা’র আসরে এসে পড়েছিলেন নজরুল ইসলাম, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধকুমার সান্যাল, অজিত দত্ত থেকে বুদ্ধদেব বসু ইস্তক। লেখক সম্পর্কে ‘উত্তরা’র তালিকাকে ঈর্ষা করত সেসময়ের অনেক সাময়িক পত্র। রবীন্দ্রনাথের কাছে লেখার জন্য অতুলপ্রসাদ হাত পাততেই তিনি তাঁর অতুল বাণীর প্রসাদ তাঁকে দান করেছেন। পরে অবশ্য একটা বিতর্ককে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ ক্ষুণ্ণ হন। ‘উত্তরা’তে তখন কবির ‘জাভাযাত্রীর পত্র’ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। ‘বিচিত্রা’য় প্রকাশিত কবির ‘সাহিত্যধর্ম’ প্রকাশ পেয়েছে। ‘উত্তরা’তে সেই প্রবন্ধের কয়েকটি প্রতিবাদপত্র প্রকাশ পেতেই অতুলপ্রসাদ-সুরেশ চক্রবর্তীকে কবি লিখে পাঠালেন— এখানে যেন আর তাঁর ‘জাভাযাত্রীর পত্র’ ছাপা না হয়। পরে অবশ্য সম্পর্ক স্বাভাবিক হয় ভুল বোঝাবুঝির অবসানে। তবে ‘উত্তরা’ অজাতশত্রু ছিল মনে করা উচিত হবে না। ‘শনিবারের চিঠি’র শনিদৃষ্টি থেকে ‘উত্তরা’ মুক্তি পায়নি। সাহিত্যে অশ্লীলতা প্রচারের অভিযোগে পত্রিকাটির বিরুদ্ধে মামলাও হয়। অতুলপ্রসাদকে পর্যন্ত এতে সামিল করা হয়। অভিযোগকারীদের পক্ষ নিয়েছিলেন কলকাতার তৎকালীন পাবলিক প্রসিকিউটার তারকনাথ সাধু— তিনি সাহিত্যে আধুনিকতাবাদীদের দুচোখে দেখতে পারতেন না। বড্ড কষ্ট পেয়েছিলেন অতুলপ্রসাদরা। সে ধাক্কা সামলে উঠেও ‘উত্তরা’ প্রকাশিত হয়ে চলেছিল।

‘উত্তরা’র চলনপথ কোনওকালেই মসৃণ ছিল না। বার বার এর পরিচালনা সংকটের আবর্তে পড়েছে। এর একচল্লিশ বছরের দীর্ঘ পথপরিক্রমায় অতুলপ্রসাদের দাক্ষিণ্যের কথা ভুলবার নয়। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে যখন অতুলপ্রসাদের মৃত্যু হল— তখন সে-বছরের শারদীয় সংখ্যাটি (১৩৪১) ‘অতুল-সংখ্যা’ নামে চিহ্নিত হয়। আজও পর্যন্ত এই সংখ্যাটি অতুলপ্রসাদ-সম্পর্কিত সেরা সংখ্যা বলে পরিগণিত হয়ে চলেছে। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমদিন থেকে এর ভালো-মন্দের সঙ্গে জড়িত থেকে এর অভিভাবকত্ব করেছেন। কেন এই পত্রিকা এই প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে এগিয়ে যেতে পেরেছিল, সুরেশ চক্রবর্তীকে প্রবোধকুমার সান্যালের লেখা এই চিঠিখানিই তার বড় প্রমাণ:

‘উত্তরা কাগজটিকে দাঁড় করাবার জন্য তুমি স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল পরিভ্রমণ করেছ, এবং আজও তোমার সেই আশ্চর্য ধৈর্য অব্যাহত রয়ে গেছে। রম্যরচনা কাকে বলে, ভাল লেখার প্রকৃতি কেমন— এ তুমি অনেকবার জানিয়ে দিয়েছ তোমার ‘উত্তরা’ মারফতে। এককালে বাঙ্গালা দেশের যে কোনও শ্রেষ্ঠ মাসিকপত্রের পাশে তোমার ‘উত্তরা’ সগৌরবে দাঁড়িয়ে থাকত। সত্য বলতে কি, অনেক লেখক জাতে উঠেছে তোমার কাগজে তাঁদের লেখা প্রকাশ হওয়ার জন্য। অনেক খ্যাতিমান লেখকের লেখায় অনেক ভুলও তোমাকে সংশোধন করতে দেখেছি। এককালের তোমার হাতেগড়া লেখক অন্যকালে গিয়ে তোমার প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়েছে, এ পোড়া চোখে তাও দেখেছি একাধিকবার। কিন্তু তোমার শরীরের ওই শুকনো খোসার তলায় একটি হৃদয়বান বন্ধু ও দরদী চিরদিনই থেকে গেছে— যে ব্যক্তিমানুষের ভুল, ত্রুটি, ভ্রূকুটি, ভ্রান্তি ও দুর্বলতা হাসিমুখে এবং সহানুভূতির সঙ্গে ক্ষমা করে এসেছে। তোমার স্বভাবের অসঙ্গতি আজও আমার চোখে পড়েনি।’

বঙ্গদেশের সঙ্গে সেতুবন্ধনের এমন সূত্রটি নিজেও বড়মাপের সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর ‘রহমান খাঁর দুর্গোৎসব’, ‘মানসী’, ‘মধুপ’ এককালে পাঠকের তৃপ্তিসাধন করেছিল।

বুড়োক্রেজি

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

কমিশনারের কিক

অকস্মাৎ গন্ধমাদন বয়ে একটি রেডিও-মেসেজ এসে আছড়ে পড়াতে খুবই ঝঞ্ঝাটের মধ্যে পড়লেন কাকদ্বীপের বিডিও মুখার্জি সাহেব। বিডিও-র চাকরিতে জয়েন করা ইস্তক সারাক্ষণই তাঁকে খুব টেনশনের মধ্যে থাকতে হয়। রাজনৈতিক হ্যাপা তো সারাক্ষণই আছে, তার ওপর ওপরওলাদের চাপও মাঝেমধ্যে বুকের ওপর চেপে বসে পাহাড়ের মতো।

এবারের মেসেজটি সেরকমই এক গন্ধমাদন বয়ে আনার খবর সহ। থানা থেকে আসা চিরকুটটিতে লেখা আছে ডিভিশনাল কমিশনার উইল ভিজিট সাগরদ্বীপ অন...বিডিও কাকদ্বীপ উইল অ্যাকমপ্যানি।

ডিভিশনাল কমিশনার গাঙ্গুলি সাহেবকে মাত্র একবারই দেখেছেন মুখার্জি সাহেব। ছোটখাটো চেহারা, কথার ধরণে একটু উন্নাসিকতা আছে, মাথার চুলে সাদার বহর দেখে অনুমান করা যায় বয়স অবসরের কাছাকাছি, বয়সের কারণেই বোধহয় একটু খিটখিটে মেজাজের। তাঁকে অ্যাকমপ্যানি করা মানে সারাক্ষণ তটস্থ থাকতে হবে মুখার্জি সাহেবকে।

ডিভিশনাল কমিশনার মানে বিডিও-র কাছে প্রপিতামহের স্ট্যাটাস। বিডিও-র ওপরে এসডিও, তার ওপরে ডিএম, তার ওপরে ডিভিশনাল কমিশনার। বাবার বাবা, তস্য বাবা।

ব্যুরোক্রেসির এই হায়ারার্কি বিষয়ে মুখার্জি সাহেব খুবই চিন্তার মধ্যে থাকেন। কখন তাঁরা অধস্তনদের কোন কথা বা কোন আচরণের মধ্যে বেয়াদপি খুঁজে পাবেন তা দেবাঃ না জানন্তি। ব্যুরোক্র্যাট শব্দটির মধ্যে কীরকম একটা রাশভারী, জলদগম্ভীর, হুমদোমুখো, উন্নাসিকতা নিহিত থাকে। ব্যুরোক্র্যাট মানেই এক অসীম ক্ষমতাধর ব্যক্তি, যার ইচ্ছায় হ্যাঁ হয়ে যেতে পারে না, না হয়ে যেতে পারে হ্যাঁ।

ব্যুরোক্র্যাট মানেই ভারী বুটের ঠকঠকি শব্দ। শব্দটা শুনলেই বুকের ভেতর কেমন যেন হাতুড়ি পিটতে শুরু করে মুখার্জি সাহেবের।

কাকদ্বীপের বিডিও হওয়ার সুবাদে এরকম নানা ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয় তাঁকে। পাথরপ্রতিমা, নামখানা, সাগরদ্বীপ— যেখানেই ভিআইপি-রা যান না কেন, কাকদ্বীপের ওপর দিয়েই যেতে হবে তাঁকে। ফলে কেউ পাথরপ্রতিমা যাবেন অমনি খোঁজ পড়ে বিডিও কাকদ্বীপের। হঠাৎ ট্রান্সফার হয়ে কেউ সাগরদ্বীপ যাবেন, অমনি কোথায় বিডিও কাকদ্বীপ! কত মন্ত্রী, কত বিগ বিগ অফিসারের সঙ্গে যে তাঁকে সারাদিন ল্যাংবোটের মতো ঘুরতে হয়, তার ইয়ত্তা নেই।

তা এবারও এক গ্র্যান্ড গ্র্যান্ড ফাদারের সঙ্গে যেতে হবে বিশাল মুড়িগঙ্গা পার হয়ে ওপারে— সাগরদ্বীপে। কিন্তু মেসেজের কোথাও লেখা নেই, কমিশনার সাহেবের যাওয়ার উদ্দেশ্য কী! তিনি কি সেখানে কোনও মিটিং করবেন, না কি কোনও প্রকল্প ভিজিট করবেন, না কি—

বিডিও সাগরের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেও কোনও সুরাহা হল না, কেন-না তিনিও জানেন না ডিভিশনাল কমিশনার কেন সেখানে যাচ্ছেন!

দিনের দিন মুড়িগঙ্গার হারউড পয়েন্টে লঞ্চ নিয়ে অপেক্ষা করছেন মুখার্জি সাহেব, আর হাপিসটিপিস করছেন প্রপিতামহ মানুষটি কীরকম, তাঁর সব কথার উত্তর কি ঠিকঠিক দিতে পারবেন — এইসব ভেবে! নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পরেই দেখা মিলল কমিশনার সাহেবের, তাঁকে লঞ্চঘাটে দেখে উল্লসিত হয়ে বললেন, গুড। কতক্ষণ লাগবে ওপারে যেতে?

—স্যার, খুব বেশি হলে চল্লিশ মিনিট।

—ওপারে গাড়ি আছে তো?

—আছে স্যার, মুখার্জি সাহেবের ঝটিতি উত্তর।

—দেন লেট'স স্টার্ট ।

লঞ্চ স্টার্ট দিতেই কমিশনার সাহেব ডেকের ওপর পাতা বিলাসবহুল চেয়ারে বসে উপভোগ করতে লাগলেন বিশাল গঙ্গার প্রাকৃতিক দৃশ্য। কিন্তু এখন ভাটার সময়, সমুদ্রাভিমুখে ভাটার টানে লঞ্চ হুহু করে পৌঁছে গেল ওপারে, মিনিট পঁচিশের মধ্যে।

ডিভিশনাল কমিশনার তৎক্ষণাৎ জানতে চাইলেন, কী ব্যাপার, বললেন চল্লিশ মিনিট লাগবে! এখানে কত বছর আছেন? এখনও লঞ্চের টাইমিং জানেন না!

মুখার্জি সাহেব প্রমাদ গোণেন, এখন কমিশনার সাহেবকে সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা বোঝাতে গেলে যদি বলেন, আপনি আমাকে শেখাচ্ছেন!

হায়ার বস্ সবসময়ে অধস্তনের চেয়ে বেশি জানবেন এটাই স্বতঃসিদ্ধ।

মুখার্জি সাহেব তখন প্রমোদ গুণছেন ওপারে গাড়িটা ঠিকঠাক আছে তো! গাড়ি তিনিই পার করেছেন গতকাল, কিন্তু ড্রাইভার যদি গাড়ি রেখে কোথাও গিয়ে থাকে!

কিন্তু না, গাড়ি ঠিক জায়গায় আছে দেখে কমিশনার সাহেব আবার খুশি। বিডিওকে তিনি পাশের সিটেই বসিয়ে নিলেন যাতে তাঁর অন্তরে উদিত বিবিধ প্রশ্নের উত্তর পেতে পারেন বিডিও-র কাছ থেকে। মুখার্জি সাহেব যথাসম্ভব উত্তর দিচ্ছেন আর ভাবছেন কতক্ষণে

গন্তব্যে পৌঁছোবেন!

তখনও কমিশনার কোথায় যাবেন তা প্রকাশ না-করায় মুখার্জি সাহেব জানতে চাইলেন, স্যার, আমরা কি বিডিও-অফিসে যাব?

—প্রথমে বিডিও-র কাছেই যাই, দেখি কীরকম কাজকর্ম হচ্ছে এখানে!

বিডিও-ও প্রস্তুত ছিল তার রিপোর্ট ইত্যাদি দেখে, সেখানে মিনিট পনেরো প্রশ্নোত্তরপর্ব সেরে এবার তিনি জানালেন তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য। সাগরদ্বীপের বিডিও-র কাছে বললেন, মি. মিত্র, আমার গুরুদেব এখানে এসেছেন দিন পনেরো আগে। আপনি নিশ্চয় জানেন তিনি কোথায় উঠেছেন?

—গুরুদেব! বিডিও সাগর তখন হাতড়াচ্ছেন তাঁর মনের এনসাইক্লোপিডিয়া। এখানে অনেকগুলো আশ্রম আছে, কয়েকজন সাধুসন্ন্যাসী সেখানে বসবাস করেন সে-খবরও আছে তাঁর কাছে, কিন্তু ডিভিশনাল কমিশানরের গুরুদেব ঠিক কোথায় আছেন সে-খবর জানা নেই তাঁর।

কিন্তু জানি না বললে তো তাঁর প্রপিতামহ তাঁকে চিবিয়ে খাবেন, অতএব জানতে তাঁকে হবেই। প্রাথমিক হতভম্বভাব কাটিয়ে বললেন, স্যার, আপনার গুরুদেবের নাম যদি বলেন, আমি এখনই খোঁজ নিয়ে দেখছি কোন আশ্রমে তিনি উঠেছেন!

সেই খবর সংগ্রহ করতে বিডিও-র খুব বেশি দেরি হল না, কিন্তু সেই সময়টুকুও যেন এক দীর্ঘ সময়। যা হোক, খবর সংগ্রহ করে বিডিও বললেন, চলুন স্যার, আমি চিনি সেই আশ্রমটা।

—উঁহু, আপনি কাজ করুন। আমি মুখার্জিকে নিয়েই যাচ্ছি আশ্রমে। আপনার ড্রাইভার চেনে তো?

— চেনে, স্যার।

—দ্যাট উইল ডু, আপনি কাজ করুন, কমিশনার সম্ভবত বিডিও সাগরের উপর ক্ষুব্ধ তিনি কেন তাঁর গুরুদেবের আস্তানা বিষয়ে আগেই খোঁজখবর নেননি, তাই তাঁকে ছুটি দিলেন আজকের মতো!

মুখার্জি সাহেব তাতে খুবই ব্যথিত হলেন, কেন-না মিত্র সঙ্গে থাকলে কমিশনার সাহেবের ক্রোধাগ্নি ভাগ হয়ে যেত দুই অধস্তন অফিসারের মধ্যে। এখন যা কিছু উষ্মা সবই তাঁর একার উপর।

অচিরেই ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে ঢুকে পড়ল সেই নির্দিষ্ট আশ্রমে। গাড়ি থেকে নামতেই আশ্রমের জনা তিনেক জুনিয়র সন্ন্যাসী সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন আগন্তুককে। তাঁরা যে কমিশনার সাহেবকে ভালোমতো চেনেন তা বোঝা গেল তাঁকে আপ্যায়নের ধরণ দেখে।

তাঁদের পিছু পিছু কমিশনার সাহেব চললেন

ছবি: প্রণব হোড়

যেখানে তাঁর গুরুদেব বিশ্রাম করছেন দুপুরের নির্জন মুহূর্তে। মুখার্জি সাহেবও অনুসরণ করলেন বসকে।

শ্মশ্রুমণ্ডিত গুরুদেব তখন একটি নিমগাছের নীচে ধ্যানমগ্ন, তাঁর আসনে বাঘছালের প্রিন্ট, ফলে বেশ রাজকীয় লাগছে তাঁর ধ্যানরত রূপ। কমিশনার সাহেব দু-দণ্ড অপেক্ষা করলেন গুরুদেবের ধ্যান ভঙ্গ হয় কি না দেখতে, কিন্তু গুরুদেবের দুই চোখ খুলছে না দেখে তাঁর স্যুটেড-বুটেড চেহারা নিয়ে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়লেন মাটির ওপর, গুরুদেবের একেবারে পায়ের কাছে।

মুখার্জি সাহেব সেই দৃশ্য দেখে অতীব চমকিত, কিঞ্চিৎ বিব্রতও। তাঁর প্রপিতামহ যাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করছেন, তাঁকে যদি অধস্তন অফিসার প্রণাম না করেন তো সেটা ঘোর অপরাধ। কী আর করেন মুখার্জি সাহেব, তিনিও তদ্দণ্ডে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে ফেললেন সেই গুরুদেবকে।

কিন্তু কমিশনার সাহেব চোখ বুজে শুয়ে আছেন তো আছেনই, কিছুতেই আর উঠছেন না! যেন গুরুদেবের মতো তিনিও ধ্যানমগ্ন। মুখার্জি সাহেবও উঠতে পারছেন না বস উঠছেন না বলে! তিনি চোখ পিটপিট করে দেখছেন কখন তাঁর প্রপিতামহ ধ্যান ভঙ্গ করে উঠে বসবেন!

হ্যাঁ, উঠলেন তিনি, মুখার্জি সাহেবও তড়াক করে উঠে বসলেন।

তাঁদের প্রণামের বহরেই ধ্যান ভঙ্গ হল গুরুদেবের, প্রথমেই তাঁর চোখ পড়ল কমিশনারের ওপর, দেখে তাঁর মুখে প্রশস্ত হাসি, মন্দ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছিস?

কমিশনার সাহেব তখন আপ্লুত কণ্ঠে বললেন, আমি ভালো আছি, আপনার সব কুশল তো, বাবা?

—হ্যাঁ। এই আশ্রমের ব্যবস্থাপনা ভালোই। তবে পানীয় জলের একটু সমস্যা আছে।

—তাই নাকি! কমিশনার প্রবল উৎকণ্ঠার সঙ্গে বললেন, ঠিক আছে বাবা, আমি এখানকার বিডিওকে অর্ডার দিয়ে যাচ্ছি যাতে প্রতিদিন আপনার পানীয় জল আশ্রমে পৌঁছে দিয়ে যায়।

গুরুদেব এই সময় হঠাৎ কমিশনারের ঘননীল কোটের বুকের কাছে হাত ছুঁয়ে বললেন, পইতে পরেছিস তো! আগের দিন পইতে ছিল না তোর গলায়!

বলে শার্টের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে বার করে পইতেটা দেখে আবার যথাস্থানে রেখে দিলেন

সেটি। কমিশনার সাহেব কাঁচুমাচু মুখে বললেন, বাবা, আগের দিন পইতেটা কাচতে দিয়েছিলাম।

মুখার্জি সাহেব সেই দৃশ্য দেখে দ্রুত সরে এলেন নিরাপদ দূরত্বে কেন-না তিনিও তো ব্রাহ্মণসন্তান, কিন্তু তাঁর গলায় আপাতত পইতে নেই, সেই না-থাকাটা নিশ্চয় গুরুদেবের কাছে এবং সে কারণে কমিশনার সাহেবের কাছেও গণ্য হবে চরম অপরাধ।

কিন্তু গুরুদেব তখন ব্যস্ত তাঁর ভিআইপি শিষ্যটিকে নিয়ে। তিনিও জানেন তাঁর এই শিষ্য অগাধ ক্ষমতার অধিকারী, অতএব এই আশ্রমের নানা সমস্যা ব্যক্ত করছেন একে একে।

তারপর একসময় বিদায় নেওয়ার সময় হয়, বিদায়বেলায় কমিশনার সাহেব সবিনয়ে জানালেন তিনি এবার গুরুদেবের পায়ের বুড়ো আঙুল ধোয়া জল খাবেন। বোঝা গেল গুরুদেব এ-বিষয়ে খুবই অভ্যস্ত, তৎক্ষণাৎ তাঁর কাছে থাকা জলভর্তি একটি গেলাসে পায়ের বুড়ো আঙুলটি ডুবিয়ে বললেন, নে, বেটা, খেয়ে নে, তোর ভালো হবে।

কমিশনার সাহেব সেই গেলাসের জল অমৃত জ্ঞানে চোঁ চোঁ করে খাচ্ছেন দেখে মুখার্জি সাহেব সামনে থেকে হাওয়া, পাছে কমিশনারকে খুশি করতে তাঁকেও গুরুদেবের পা-ধোয়া জল খেতে হয়।

গুরুদেবের সামনে আর এক প্রস্থ সাষ্টাঙ্গ প্রণামের পর কমিশনার অতঃপর মুখার্জিকে বললেন, সাগরের বিডিওকে খবর দিন, প্রতিদিন এই আশ্রমের যা পানীয় জল লাগবে তার ব্যবস্থা করতে।

মুখার্জি সাহেব মস্ত করে ঘাড় নাড়তেই শুরু হল ফেরা। কমিশনার সাহেবের কথাবার্তায় ধারণা করা গেল মুখার্জি সাহেব মোটামুটি পাশ করেছেন আজকের কঠিন পরীক্ষায়।

কিন্তু সেখানেই শেষ হল না কমিশনারের ট্যুর। ঠিক সাতদিনের মাথায় আবার রেডিও মেসেজ, ডিভিশনাল কমিশনার উইল ভিজিট সাগর অন...বিডিও কাকদ্বীপ উইল অ্যাকমপ্যানি।

এবার আর তিনি একা নন, সস্ত্রীক এলেন কমিশনার, ফলে তাঁর মেজাজটিও গতবারের চেয়ে একটু ভালো, মুখার্জি সাহেবের সঙ্গে স্ত্রীর পরিচয় করে দিয়ে বললেন, গুড অফিসার।

মুখার্জি সাহেব তখন পাখনা মেলে উড়তে চাইছেন আকাশে, আহ্! এবার অ্যানুয়াল কনফিডেন্সিয়াল রোল দারুণ হবে নিশ্চয়!

সেদিনও সারাদিন অসংখ্য ভাইভা-ভোসির পর সন্ধেয় ছুটি পেলেন, সেই সঙ্গে কমিশনারের কাছে আর এক দফা প্রশংসা লাভ। কিন্তু মুখার্জি সাহেব তখন উপলব্ধি করতে পেরেছেন গুরুদেব যতদিন সাগরদ্বীপে থাকবেন কমিশনার প্রায়ই আসবেন সাগরদ্বীপ ভিজিট করতে। আর তাঁকেও সারাদিন ল্যাংবোট হয়ে ঘুরতে হবে। এ কী হায়ারার্কি ঝঞ্ঝাট! এখন গুরুদেব মানে মানে এখান থেকে চলে না গেলে তার জীবনযৌবন সব রসাতলে! গুরুদেবের ট্রান্সফার চাই।

তার এই আকুল প্রার্থনা যথাস্থানে পৌঁছতে ট্রান্সফার হলেন, কিন্তু গুরুদেব নন, সপ্তাহখানেকের মধ্যে খোদ ডিভিশনাল কমিশনার হঠাৎ ট্রান্সফার হয়ে গেলেন অন্যত্র। আহা, কী আনন্দ!

মুখার্জি সাহেব যখন স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন, সে সময় হঠাৎ একদিন একটা ম্যাটাডোর এসে পৌঁছলো বিডিও-র কোয়ার্টার্সে, তাতে সেই বিদায়ী ডিভিশনাল কমিশনারের নির্দেশ, ম্যাটাডোরে করে একটি জলের ড্রাম পাঠালাম। এটি অবিলম্বে গুরুদেবের আশ্রমে পাঠানোর ব্যবস্থা করুন।

আবার গুরুদেব! কিন্তু এত বড় একটা জলের ড্রাম কীভাবে এত বড় একটা নদী পেরিয়ে ওপারে পাঠাবেন তা ভেবে বার করতে দিন দুই দেরি হয়ে গেল মুখার্জি সাহেবের। কিন্তু তবু পৌঁছে দেওয়া গেল শেষপর্যন্ত। কিন্তু সেই দুদিন দেরিতে পৌঁছনোর খবর ঠিক পৌঁছে গিয়েছে বিদায়ী কমিশনারের কাছে। পরের দিনই ফোন, ইউ আর এ্যা ওয়ার্থলেস অফিসার। হ্যাড আই বিন ইন মাই প্রিভিয়াস প্লেস অফ পোস্টিং, আই উড হ্যাভ কিকড ইউ আউট অফ মাই ডিভিশন।

মুখার্জি সাহেব তখন ভাবছেন কমিশনার এখানে থাকলে তাঁর লাথিটা কত ওজনের হত!

দুচাকায় দুনিয়া

বিমল মুখার্জি

১৯২৬ সালে সাইকেলে পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছিলেন
প্রথম ভারতীয় ভূ-পর্যটক বিমল মুখার্জি।
তাঁর সেই দুঃসাহসিক বিশ্বভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত। পঞ্চম মুদ্রণ। ₹১৫০

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩,
বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর সব দোকান ও
অন্যান্য বইয়ের দোকানে আমাদের সব বই পাবেন।

অনলাইনে পেতে www.swarnakshar.in লগ অন করুন

স্বর্ণাক্ষর
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ **ফ্যাক্স:** ২২৮৭-৬৪৪৮ **ই-মেল:** info@swarnakshar.in

তিনটি আতঙ্কিত চোখ!

'স্বনামধন্য বিশ্বতোমুখ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত'-র একগুচ্ছ কবিতা পড়ার আনন্দ আজও অম্লান, যে-কথা এই একাদশ সংখ্যাটি পড়ে বুঝতে পারলাম আবার। ভাবা যায় না যে আশি বছরের মুখোমুখি হয়ে এই কবি লিখছেন: 'থাকে শুধুই/আকাশি দূর—/যে-নারী তার/শাঁখাসিঁদুর/নবোঢ়া নাম/ঘুচিয়ে দিয়ে/ছুঁল আমার/কাঁধ, কনুই,/কী করে তাকে/আমিও ছুঁই!' কথার এই মায়াবী বিস্তার পেয়ে কবিতাপাঠের বিরল আনন্দ ঘটে আমাদের। মনে পড়ছে কয়েকদিন আগে অলোকরঞ্জনের অগ্রজ সহযাত্রী কবি অলোক সরকার ৮২ বছর পূর্ণ করলেন। তিনিও ভাষা ও চেতনার, মুক্তি ও মুক্তকথনের নতুন নতুন দিগন্ত স্পর্শ করে চলেছেন তাঁর কবিতায়। তাঁরও একটি কবিতাগুচ্ছ পড়তে চাই একটি স্বরচিত মুখবন্ধসহ। এই প্রবীণেরা আজও পথপ্রদর্শকের ভূমিকায়। চাই উৎপলকুমার বসুকেও।

সক্রেটিস সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল ফুরোবার নয়, অরুন্ধতী ভট্টাচার্যকে ধন্যবাদ। সান্ত্বনা বসুকেও ধন্যবাদ অবশ্যই।

'কেন লিখি' প্রশ্নের উত্তর পড়তে এখন বাস্তবিক ক্লান্ত লাগে। এসংখ্যায় যাঁরা উত্তর দিলেন তাঁদের অনেকের লেখাই আমি পড়িনি, এই আমার বিনীত স্বীকারোক্তি। এই অক্ষমতা মার্জনীয়। যাঁদের লেখা কিছু পড়েছি এরকম দুজন— রবিশংকর বল এবং অবশ্যই দেবারতি মিত্র। এঁদের লেখাদুটি পড়লাম এবং প্রত্যাশিতভাবেই চমৎকৃত হলাম।

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ সম্পর্কে অমিতাভ চৌধুরির অনবদ্য লেখাটিতে তিনটি বক্তব্য পেলাম যা নিয়ে ভেবে যাচ্ছি: ১. 'কবি বর্ণিত রাশিয়ায় প্রগতির ভিতও তৈরি করেছিলেন প্রশান্তচন্দ্রই।' ২. '১৯৫৭ সালে সমাবর্তনে তিনি দীক্ষান্ত ভাষণ দেন। মাত্র দু'পাতার ভাষণ। কিন্তু কী তথ্যপূর্ণ ও আবেগবর্জিত এবং রবীন্দ্রনাথের মূল ধরে টানাটানি।' ৩. 'রবীন্দ্রনাথকে ভালো করে জানতে হলে তাঁকে জানা চাই।' ভাবা শেষ হবে হয়তো রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে প্রশান্তচন্দ্রের লেখাগুলি পড়ে উঠতে পারলে। জানি না লেখাগুলি সংগ্রহ করা যাবে কিনা!

পবিত্র সরকারের লেখাটিই আমার জন্য সর্বাগ্রে পাঠ্য। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে অনেক পেশাদার লেখকও সমাস-বিষয়ে সচেতন নন। আর, বলতেই হবে, সমাসের ঠিক ব্যবহার না-জানলে শুদ্ধ বাংলা লেখা সম্ভব নয়। তবে এ-বিষয়ে তর্কের পরিসর আছে। এ-নিয়ে ভবিষ্যতে পবিত্র সরকার একটি প্রবন্ধ লিখলে ভালো হয়। কেন আমরা রবীন্দ্রজন্মসার্ধশতবর্ষ সংকলন লিখব (নাকি অতটা বড় সমাসবদ্ধপদ লিখব না?), কোথায় গিয়ে সমাসের বন্ধন ভেঙে দিতে হবে পাঠের স্বাভাবিকতার স্বার্থে, এইসব প্রশ্ন নিয়ে একটা যুক্তিগ্রাহ্য লেখা দরকার আমাদের। এ-বিষয়ে লেখার যোগ্য লোক অবশ্য আরও অনেকে আছেন, যেমন— সুভাষ ভট্টাচার্য, অশোক মুখোপাধ্যায় (শঙ্খ ঘোষের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম)। কথাটা মনে এল প্রণব চৌধুরীর লেখাটি পড়ে এবং প্রশান্তচন্দ্রের মধ্যে ফাঁক (প্রশান্ত চন্দ্র) দেখে!

ভালো লাগল 'নাচঘর'। বারিদবরণের মতো গবেষকদের হাত থেকেই পেতে হয় এইসব লেখা যাঁদের পুজোর সময় কাটে পাঠমন্দিরে তথা গ্রন্থাগারে।

ক্ষমতার চেয়ে ক্ষমা অধিক ক্ষমতা
সদম্ভ উচ্চতা নয়, মধুর মমতা

হ্যাঁ, আমরা সবসময়ই চাইব 'সদম্ভ উচ্চতা নয়, মধুর সমতা।'

ভুল স্বীকারের পর অর্থনীতিবিদ ভবতোষ দত্তের তো পাতাজোড়া ছবি প্রত্যাশিত ছিল!

শেষ কথা, তিনটি আতঙ্কিত চোখের দিকে তাকিয়ে থাকা কি স্বস্তিদায়ক? নতুন এক চিত্রশিল্পীকে অভিনন্দন জানিয়েও কথাটা বলতে হল। প্রচ্ছদ বোধহয় অনুচ্চকিত হওয়াই ভালো যাতে তা খুব বেশি মনোযোগ দাবি না করে।

কালীকৃষ্ণ গুহ
কলকাতা-৭০০ ১০৬

□ উৎপলকুমার বসুর স্বনির্বাচিত কয়েকটি কবিতা ২ আগস্ট, ২০১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

তুষ্টিপাথর প্রসঙ্গে

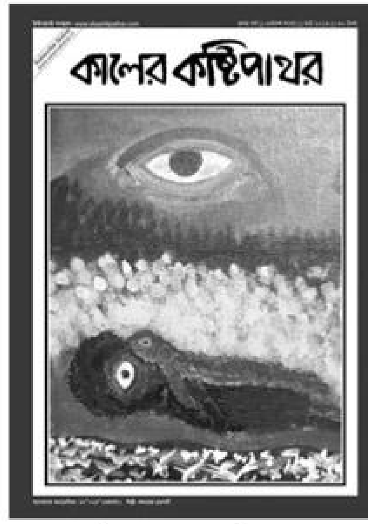

'কালের কষ্টিপাথর'-এর মার্চ সংখ্যায় প্রণবেশ ঘোষ দস্তিদারের চিঠিটি বেশ কৌতুকময় হলেও তাঁর তোলা প্রশ্নটির গুরুত্ব কম নয়। একটি পত্রিকার সম্পাদকের ভূমিকা কি কেবল সম্পাদনা ও সম্পাদকীয় লেখাতেই সীমিত থাকা উচিত? নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু তাঁর নিজস্ব সৃষ্টিই যদি পত্রিকার সিংহভাগ দখলে নেয়, তবে? এ বিষয়ে কি কোনও প্রোটোকল চালু আছে দেশে বা বিদেশে? বোধহয় না। প্রসঙ্গত, মনে পড়ে গেল খবরের কাগজে পড়া এক উদীয়মান C.A.-র কথা, যিনি কন্নড় ভাষায় একটি উপন্যাস লিখে প্রকাশকের অপেক্ষায় না থেকে নিজেই মেশিন বসিয়ে ছেপেছেন তার একহাজার কপি আর তারপর বইয়ের দোকানের ভরসা না করে নিজেই বইটি বেচার আশায় তাঁর হকার অবতারে হাজির বিভিন্ন কলেজ-চত্বরে। ভবিষ্যতে ওই ব্যক্তি যদি নিজেই বইটির সমালোচনাও লিখে ফেলেন, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না। কেননা, ওই বইটি কেউ কিনেছেন বা পড়েছেন কি না জানা যায়নি। অর্থাৎ মোদ্দা কথা হল সৃষ্টির মান, পাঠকমহলে তার সমাদর— তার পরিমাণ নয়।

নজিরের কথা যদি ওঠে, 'বঙ্গদর্শন' বা 'সন্দেশ' পত্রিকাতেও সম্পাদকের প্রভূত উপস্থিতি দেখা গিয়েছে। এর কারণ বোঝা খুব কঠিন নয়। আমার মনে হয়, যেসব মানুষ চিন্তাশীলতায় এগিয়ে চলেন অন্তরের সৃষ্টিশীলতার ধাক্কা খেতে খেতে, তাঁদের ডাক

শুনে কেউ এল কি এল না, সেসব বিচার করার সময় থাকে না। তাই উপন্যাস, কবিতার পর অমরেন্দ্রবাবুর শিল্পী-সত্তার প্রকাশ বাঙালির আরও এক পাওয়া। আমার প্রশ্ন অন্য জায়গায়— 'কালের কষ্টিপাথর'-এর প্রচ্ছদ দেখে, যাঁদের কলম তেমন না চললেও তুলি বেশ চলে, তাঁরা যদি নিজেদের আঁকা প্রচ্ছদ আপনাদের দপ্তরে পাঠান, ছাপার মতো হলে ছাপবেন কি? যদি ছাপেন, তবে কালে কালে একটা প্রচ্ছদ প্রতিযোগিতাও হতে পারে। কোনও নাম না জানা আঁকিবুকি মাস্টারের ভাগ্যে জুটে যেতে পারে বর্ষসেরা প্রচ্ছদশিল্পীর সম্মান!

আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটি শিল্প প্রসঙ্গেই। বাঙালির মনন কি শুধুই সাহিত্যনির্ভর? 'বই-ঠেক'-এ বিভিন্ন ভাষার বইয়ের আলোচনা পড়ে খুব ভালো লাগছে। যদি শিল্প বিষয়েও ভারত তথা পৃথিবীর কিছু কিছু খবর ও আলোচনার স্বাদ পাওয়া যেত!

শৈলজা সেন
বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

*** খুবই ভালো প্রস্তাব। ছাপার মতো হলে নিশ্চয়ই ছাপা হবে। এখানে এও বলা যায় যে, প্রচ্ছদে সম্পাদকের আনাড়ি আঙুলের আঁকিবুকিও অদীক্ষিত রংবাজি নিন্দামন্দের ন্যায়সঙ্গত ঝুঁকি নিয়েও ছাপা হচ্ছে এই আশায় যে অদূর ভবিষ্যতে ক্রমশ এখানে চেনা-অচেনা প্রকৃত শিল্পীদের ছবি প্রদর্শিত হবে। এই সংখ্যাতেই তার সগৌরব সূচনা— দুঃসাহসিক ভ্রমণখ্যাপা, কবি, দেশ-দেশান্তরে চিত্রপ্রদর্শনখ্যাত পাপিয়া ঘোষালের উপস্থিতি। 'কালের কষ্টিপাথর'-এর প্রতি সংখ্যার প্রচ্ছদ আসলে একচিত্রের প্রদর্শনীদেওয়াল, প্রচলিত রীতিমতো নিছক প্রচ্ছদ অঙ্কন বা মলাট অলংকরণ নয়।*

—সম্পাদক

ভালো সাহিত্য যেন দারুচিনি দ্বীপ

মার্চ ২০১৩ সংখ্যার 'কালের কষ্টিপাথর'-এর সম্পাদকীয়তে খোদ সম্পাদকের কলম কিঞ্চিৎ হাহাকারের মতো শোনাল। বাংলাসাহিত্যের একজন পাঠক হিসেবে এতে বিশেষ উদ্বিগ্ন বোধ করছি। সম্পাদক লিখেছেন, 'ছোট ছোট এইসব স্বপ্নভঙ্গের একটা বড় কারণ সাহিত্যের বাজার। তার চাহিদা-জোগানের নিয়মের রাজত্ব।' ভালো ও সৎ সাহিত্যের বাজার চিরদিনই সীমিত। প্রশ্ন হচ্ছে, সেটি ইদানীং আরও সংকুচিত হচ্ছে কিনা।

কালের কষ্টিপাথর

সম্পাদকমশাইয়ের খেদ আমাদের হৃদয়ে কাঁপন তুলেছে। আমাদের মতো পুরনোপন্থীদের কাছে ভালো সাহিত্য এখনও দারুচিনি দ্বীপ।

সম্পাদকমশাইয়ের উদ্বেগকে সমর্থন জানিয়েই বলি, ভালো বাংলাসাহিত্যের বাজার সত্যিই মনে হয় আরও ছোট হয়ে আসছে, যেটা খুবই দুর্ভাবনার কথা।

কিন্তু ঘটনা হচ্ছে সেরকম বাজারের সংকোচন আজ বাঙালি সংস্কৃতির প্রায় সর্বত্র। ভালো গানের বাজার— নেই, ভালো জলসার বাজার— নেই, সত্যিকারের ভালো সিনেমার বাজারও কি সে অর্থে আছে? সবক্ষেত্রেই যেন একটা অবক্ষয়ের চড়া সুর। আমাদের সময়ে দেখতাম সন্ধে হলে নিয়ম করে যেমন পড়তে বসতে হত, তেমনই প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই গান শেখার একটা চর্চা ছিল— গানের মাস্টারমশাইরা আসতেন। সেসব তো উঠেই গিয়েছে কবে। পড়ার অভ্যাস তো এখন নোটবই আর এস এম এস— চারদিকে এমনটাই তো চোখে পড়ে।

সমাজে এই সার্বিক অবনমনের ছাপ সংস্কৃতির সব তল্লাটেই পড়ছে খুব স্বাভাবিকভাবেই এবং ভাঙনটা খুব স্পষ্ট। লক্ষ করে দেখুন না, আগে আমাদের হাতে অর্থ কত সামান্য ছিল, আয়োজন কত অল্প ছিল, তবু কত আনন্দে যৌথ পরিবারে থাকতাম। প্রত্যেক পরিবারেই কোনও-না-কোনও আশ্রিতজন থাকতেন— তিনি বিধবা পিসি হোন কী জ্ঞাতি-সম্পর্কে বেকার কাকা, তবু কেউ তাদের গলগ্রহ মনে করত না। অথচ এখন আমাদের পকেটে পকেটে কত বৈভব, তবু আমরা ভেঙে ছড়িয়ে গিয়েছি নিউক্লিয়ার পরিবারে। সমাজে এই ভারসাম্যটা টলে যাওয়ায় লক্ষ করুন, আমাদের সমাজে-সংস্কৃতিতে সার্থক সৃষ্টি কত কমে আসছে। 'মেনে নাও' মানসিকতার জেরে প্রতিবাদ—বিপ্লব ছিটকে যাচ্ছে কত দূরে। এসব ঘটনাই মনে হয় একের সঙ্গে অন্যে সম্পর্কযুক্ত। তাপ-উত্তাপহীন এত নিস্তরঙ্গ সমাজজীবন থেকে কী উপাদানই বা আহরণ করবেন একজন লেখক?

কিন্তু এতৎসত্ত্বেও অভিজ্ঞ সম্পাদকমশাইয়ের খেদ আমাদের হৃদয়ে কাঁপন তুলেছে। আমাদের মতো পুরনোপন্থীদের কাছে ভালো সাহিত্য এখনও দারুচিনি দ্বীপ। 'কালের কষ্টিপাথর' আমাদের অনেকদিনের ভালো সাহিত্যপাঠের বুভুক্ষা মিটিয়েছে বিগত একাদশ সংখ্যা ধরে। তার কাছে আমাদের অনেক প্রত্যাশা।

পরিশেষে একটা কথা বলি, জানি না প্রাসঙ্গিক হবে কিনা। বিদেশে প্রকাশনা জগতে একটা প্রথা চালু আছে। সেখানেও অনেক উৎসাহী তরুণ-তরুণী লিটল ম্যাগাজিন বের করে। সেখানেও যথারীতি ছাপা-বাঁধাই-কাগজ ইত্যাদির অগ্নিমূল্যের কারণে তাদের পকেটে টান পড়ে। বড় বড় প্রকাশনা সংস্থাগুলি এইসব ক্ষেত্রে এগিয়ে আসে তাদের সাহায্যে। অর্থকরী ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব এই প্রকাশকরাই নিজেদের কাঁধে নিয়ে নেন। সম্পাদনার কাজটি অনেক নিশ্চিন্তে তখন সামলাতে পারেন সেই তরুণ-তরুণীরা। এমন প্রকাশনা সংস্থাও সেখানে আছে বলে শুনেছি, যারা একইসঙ্গে তিন-চারটি লিটল ম্যাগাজিনের দায়িত্ব সামলায়। এতে তাদের কিছুটা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়তো হতে হয়, কিন্তু তা তাদের পুস্তক প্রকাশনা থেকে প্রাপ্ত আয়ের নিরিখে নগণ্যই। লিটল ম্যাগাজিনের বেস্টসেলার হওয়ার ভাগ্য নেই। তবু আর্থিক ক্ষতি হবে জেনেও কেন তারা এগিয়ে আসেন স্বেচ্ছায়? মনে হয় কেবল সামাজিক দায়পালন ছাড়াও এতে তাদের কিছু ব্যবসায়িক অভিসন্ধিও থাকে। এইভাবে আসলে নতুন সাহিত্যপাঠের অভ্যাসকে তারা জায়মান রাখেন সমাজে, নতুন পাঠক তৈরি হয়,

ক য়ে ক টি চি ঠি

এমনকি তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করা পত্রিকা থেকে তারা পেয়ে যান ভবিষ্যতের বেস্টসেলিং লেখককেও।

আমাদের দেশেও কি বড়মাত্রায় এমন উদ্যোগ শুরু হতে পারে না? তাতে কেবল নতুন পাঠকই তৈরি হয় তা নয়, সাহিত্য নামের এক প্রাচীন সৃষ্টিও বেঁচে থাকে।

সমরেন্দ্র ভৌমিক

কলকাতা-৭০০ ০৬৮

একটি দাবি

বিশেষ সংকলন

কেন লিখি

আমি প্রথম সংখ্যা থেকে না হলেও, বেশ কিছু মাস ধরেই 'কালের কষ্টিপাথর'-এর আগ্রহী পাঠক। আমার সবচেয়ে ভালো লাগে আপনাদের বিষয়-বৈচিত্র্য। এপার বাংলার পত্রিকায় ওপার বাংলার উপস্থিতি যেন এক উপরি পাওনা। এমন একটি পত্রিকার জন্য অজস্র অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার একটি দাবি পেশ করছি: এখন যেমন জ্বলদর্চির সংকলন থেকে 'কেন লিখি' ছাপা হচ্ছে, ভবিষ্যতেও কি লিটল ম্যাগাজিনে বেরনো কিছু উৎকৃষ্ট রচনার জন্য কয়েক পাতা বরাদ্দ করা যায়? তাতে পাঠক, লেখক সকলেই উপকৃত হবেন।

নির্ঝর সান্যাল

চিত্তরঞ্জন পার্ক, নয়াদিল্লি

সঙ্গগুণের বর্ণনদোষ

মাত্র এগারোটি সংখ্যাতেই 'কালের কষ্টিপাথর' আমার খুব প্রিয় পত্রিকা হয়ে উঠেছে। যদিও পত্রিকাটি হাতে পেতে বেশ একটু কাঠখড় পোড়াতে হয়। প্রথমত, এটি প্রকাশের কোনও নির্দিষ্ট দিন নেই, সেটা একটা বড় সমস্যা। আর দ্বিতীয় সমস্যা হল সব জায়গায়, সব স্টলে পাওয়াও যায় না। কেন যায় না, জানি না। সত্যি বলতে কী শেষ পাতা পর্যন্ত আকর্ষণ জিইয়ে-রাখা এমন নিটোল সাহিত্যপত্রিকা এই মুহূর্তে বাজারে নেই।

মুশকিল কী হয়, প্রিয় কোনও জিনিসের মধ্যে যখন এতটুকু বিচ্যুতি চোখে পড়ে তখনই বুকে বড় বাজে। কেবল বৃথা প্রশংসায় আপনাদের আশ্বস্ত না করে তাই এই চিঠির মাধ্যমে অল্প সমালোচনার রাস্তা নেওয়াই সমীচীন বোধ করলাম। আশা করি তাতে এই পত্রিকাটি আরও আমার মনের মতো হয়ে উঠবে ভবিষ্যতে।

'কালের কষ্টিপাথর'-এ দুটি ধারাবাহিক রাখা হয়েছে যেখানে বিখ্যাত সাহিত্যিক বা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের স্মৃতি রোমন্থন করেন প্রবীণ ও আমার বিশেষ প্রণম্য দুজন লেখক। প্রথম সংখ্যা থেকেই 'মহাজনসঙ্গ' এবং 'বরণীয় লেখকের স্মরণীয় সঙ্গ' শীর্ষক লেখা দুটি পড়ছি। প্রথমদিকে দুটি ধারাবাহিকই খুব আকর্ষণ করত। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে লক্ষ করছি 'মহাজনসঙ্গ' ক্রমেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্বের সংক্ষিপ্ত জীবনীমূলক রচনা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আর 'বরণীয় লেখকের স্মরণীয় সঙ্গ'-এ সঙ্গলাভের অভিজ্ঞতার চেয়েও লেখকের লেখালেখির বিশ্লেষণ মাঝেমধ্যেই পীড়ার কারণ হচ্ছে। সাহিত্যের পাঠকমাত্রেই সাহিত্যের ছাত্র হবেন এমন ধরাবাঁধা নিয়ম কিছু নেই। পাঠক হিসেবে ওই দুটি লেখাই পড়তে বসতাম লেখকের সঙ্গে ওই ব্যক্তিদের ঘনিষ্ঠতার, যোগসূত্রতার খুঁটিনাটি বিবরণ পাব বলে। অনেকক্ষেত্রেই তা না পেয়ে একটু হতাশ হচ্ছি।

প্রসঙ্গত বলি, 'বই-ঠেক' বিভাগটিও খুব উপভোগ্য হচ্ছে। অনেক না-পড়া বই নিয়ে আলোচনা দেখছি। যথার্থ পরিপূরক ছবিতে সেই বইটির সম্পর্কে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক খবরাখবরও জানাচ্ছেন। তবে এই বিভাগে লেখাগুলি উপন্যাস ধরে ধরে কেবল কাহিনির আভাস না দিয়ে যদি একটু বিশ্লেষণধর্মীও হত, তাহলে বোধহয় সম্পূর্ণতা পেত।

তবে, আবারও বলি, এসবই ছোটখাটো ত্রুটি। সংশোধন করে ফেলা যায় অতি সহজেই।

চিত্তব্রত ঘোষ

কলকাতা-৭০০ ০৪৭

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ভ্রমণ-ভিসিডি

আন্টার্কটিকা
ঘরে বসেই উপভোগ করুন দক্ষিণমেরু ভ্রমণের রোমাঞ্চ। ঘুরে বেড়ান আশ্চর্য সব অহিসবার্গের গা ঘেঁষে, ঝাঁক ঝাঁক পেঙ্গুইন-অ্যালবট্রসের ভিড়ে, বরফে ঢাকা দ্বীপে-পাহাড়ে। ₹৫০

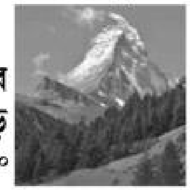

সুইজারল্যান্ডের পাঁচ পাহাড়ে
₹১০০

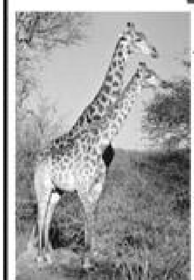

আফ্রিকার জঙ্গলে
আফ্রিকার জল-জঙ্গল তৃণভূমিতে পালে পালে বন্যপ্রাণীদের অবাধ বিচরণ। সঙ্গে আফ্রিকার আদিবাসীদের নাচ গান। ₹৫০

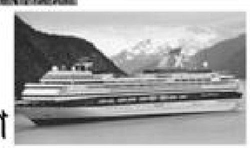

আলাস্কা
ঘরে বসেই ঘুরে বেড়ান আলাস্কার অরণ্য, পাহাড়, হিমবাহ, হ্রদ, নদী, সাগর-উপসাগর। ₹৫০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর আরও ভ্রমণ-ভিসিডি
চিন। শ্রীলংকা। দক্ষিণ থাইল্যান্ড। ব্যাংকক-পাটায়া। কম্বোডিয়া। লেবানন। ভিয়েতনাম। মিশর। মোঙ্গোলিয়া। ইন্দোনেশিয়া। মায়ানমার। রাশিয়া। মালয়েশিয়া। প্যারিস-ভিয়েনা। রোমানিয়া। চেক রিপাবলিক। নেপাল। নানা দেশের লোকনৃত্য। সুমেরুবৃত্তে ভ্রমণ।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর পরিচালনায়
জম্মু ও কাশ্মীর। গাড়োয়াল হিমালয়। হিমাচল প্রদেশ। রাজস্থান। গোয়া। অরুণাচল প্রদেশ ও ত্রিপুরা। অন্ধ্রপ্রদেশ। কেরালা। বারাণসী। উইক এন্ড।

সব মিউজিক শপে পাওয়া যায়
অথবা নীচের ঠিকানায় লিখুন:
for Preview: www.bhraman.com

স্বর্ণাক্ষর
Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kol-19
Phone: 2283-2320 **Fax:** 2287-6448
Website: www.swarnakshar.in
E-Mail: info@swarnakshar.in

বই-টই

ফিরে পড়া বই

গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ-এর 'ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিটিউড'

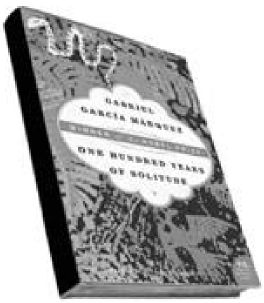

পাবলো নেরুদার কথায়, 'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা' 'Perhaps the greatest revelation in the Spanish language since the Don Quixote of Cervantes.' কলম্বিয়ার নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের এই বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে। প্রকাশমাত্রই আলোড়ন ওঠে সারা পৃথিবী জুড়ে। কিছুদিনের মধ্যে প্রধান ২৭টি ভাষায় অনূদিত হয়। সমালোচকেরা বলতে থাকেন হোমারের 'ওডিসি'-র সঙ্গেই একমাত্র এ বই তুলনীয়। এমনকি মানবসভ্যতাকে নিরীক্ষণ ও বিশ্লেষণের গভীরতা বিচারে এ বইকে মহাভারতের পাশেও রাখা যায়। শোনা যায়, বইটি লেখার সময় নাকি গার্সিয়া মার্কেজ ১৫ মাস যাবৎ নিজেকে সম্পূর্ণ গৃহবন্দী করে রেখেছিলেন। সাতটি প্রজন্ম ধরে একটি পরিবারের ও তাদের আবাস একটি কাল্পনিক শহরের উত্থান থেকে পতনের বিস্তৃত পটভূমিকায় একটি একটি করে তিনি জড়ো করেছেন সময়, ইতিহাস, সভ্যতা, ধর্ম, প্রেম, যৌনতা, রাজনীতি, আধুনিকতা, বাস্তব, যাদু-বাস্তব। তারপর সামগ্রিকতায় পৌঁছে যে অতুলনীয় সৃষ্টি তিনি গড়ে তুললেন, একেবারে প্রথম বাক্য থেকে মোহাচ্ছন্নের মতো তাকে অনুসরণ করতে করতে সর্বশেষ পাতার সর্বশেষ বাক্যে গিয়ে, থেমে, অনুভব করতে হয় আগুনস্নাত হওয়ার অভিজ্ঞতা।

স্বাভাবিকভাবেই বইটি গতানুগতিক উপন্যাসের ধাঁচে লেখা নয়। মাকোন্দো শহর ও বুয়েন্দিয়া পরিবারের ইতিহাস এ কাহিনীর মূল কথন। তাই কাহিনীর শাখা-প্রশাখারা বহু বিচিত্রগামী। সেই বৈচিত্রকে অনুসরণ করে সময়ও কখনও দ্রুতগামী, কখনও বা স্তব্ধ, আবার কখনও বা আবর্তিত। আর তার পাশে রয়েছে নিঃসঙ্গতার দীর্ঘ ও অন্তরীণ অবস্থান। হোসে আর্কাদিয়ো বুয়েন্দিয়া তার স্ত্রী উরসুলা ইগুয়ারানকে নিয়ে সমুদ্রের সন্ধানে বেরিয়ে এসে পৌঁছয় এক জনহীন স্থান মাকোন্দোয় এবং ধীরে ধীরে সেখানে গড়ে তোলে মানুষের আবাস-ভূমি। মাকোন্দো শহরটি কাল্পনিক, তবে এ যেন লেখকের জন্মস্থান আরাকাতাকারই প্রতিরূপ। ছোটবেলায় ট্রেনে করে যাওয়ার সময় একটি কলা কোম্পানির সাইনবোর্ডে এই শব্দটি তিনি দেখেন। শব্দের ধ্বনিমাধুর্য তাঁকে আকৃষ্ট করে। যদিও শব্দটির নির্দিষ্ট কোনও গভীর অর্থ নেই।

বুয়েন্দিয়া পরিবারের প্রথম পুরুষ হোসে আর্কাদিয়ো বুয়েন্দিয়া অত্যন্ত সাহসী, দক্ষ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে উৎসাহী একটি চরিত্র। যদিও ঘটনাচক্রে তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে এবং শেষ জীবনে তাকে একটা বাদামগাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। মৃত্যুর কিছু পূর্বে উরসুলা তাকে মুক্ত করে দিয়েছিল। তার শবযাত্রায় আকাশ থেকে ঝরে পড়া ফুলে ঢেকে গিয়েছিল পথ। হোসে আর্কাদিয়ো বুয়েন্দিয়ার চরিত্রগত দক্ষতা ও দুর্বলতা উভয়ই পরবর্তী প্রজন্মের চরিত্রদের মধ্য দিয়ে সারা উপন্যাস জুড়ে প্রবাহিত। তার প্রথম পুত্র হোসে আর্কাদিয়োর মধ্যে ছিল বাবার প্রচণ্ড শারীরিক ক্ষমতা ও আবেগপ্রবণতা। পিলার তেরনেরা নামে এক মহিলার সঙ্গে ছিল তার অবৈধ সম্পর্ক। পরে বাবা-মায়ের দত্তক কন্যা রেবেকাকে বিয়ে করে এবং কোনও এক অজ্ঞাত ব্যক্তি তাকে গুলি করে হত্যা করে, যে রহস্য শেষপর্যন্ত সমাধানহীন থাকে। হোসে আর্কাদিয়ো বুয়েন্দিয়ার দ্বিতীয়পুত্র কর্নেল আউরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া মাকোন্দোয় ভূমিষ্ঠ প্রথম মানুষ। সে পেয়েছিল বাবার দৃঢ় নীতিবোধ ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি। জন্মের সময় তার চোখ ছিল খোলা ও ছোটবেলায় সে নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারত। রক্ষণশীল

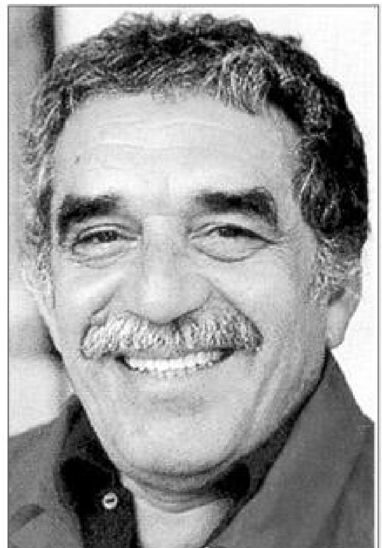

গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ

সরকারের বিরুদ্ধে ৩২টি গৃহযুদ্ধে সে অংশ নেয় এবং এই সময়ে অপরিচিত ১৭জন মহিলার গর্ভে তার ১৭টি পুত্র হয়। পরবর্তীকালে যাদের সকলকেই দুই চোখের মাঝে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। মাকোন্দো, একসময় যা ছিল নিষ্পাপ ভূমি, এই যুদ্ধের সময়েই তা প্রথম প্রত্যক্ষ করল রক্ত। যুদ্ধের জন্য কর্নেলের খ্যাতিই এ শহরকে পৌঁছে দিল বাইরের পৃথিবীর জনাকীর্ণ ভূমিতে। আর সেই অন্য পৃথিবীর আধুনিক সভ্যতার উন্মাদনা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ল মাকোন্দোয়, বুয়েন্দিয়া পরিবারে, আদিম সারল্যের স্বর্গরাজ্যে। এই যুদ্ধের পরেই সাম্রাজ্যবাদী ও ধর্মীয় শক্তি দখল করল মাকোন্দো। অবধারিতভাবে নতুন গড়ে ওঠা কলা কোম্পানির পুঁজিবাদী শক্তি রাষ্ট্রের সহায়তায় নির্বিচারে হত্যা করল অসংখ্য নিরীহ শ্রমিককে। এই গণহত্যার পরেই মাকোন্দোয় ঘটে এক বিরাট পরিবর্তন। শুরু হয় বৃষ্টি। এক নাগাড়ে পাঁচ বছর ধরে এই প্রবল বর্ষণ ধুয়ে-

উপন্যাস সম্পর্কে লেখক

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল যেটা, সেটা হল (অবাস্তব কাহিনিগুলো বলার সময়) ওঁর (ঠাকুরমার) মুখের অভিব্যক্তি। যখন গল্পগুলো বলছেন, মুহূর্তের জন্যও সেই অভিব্যক্তি বদলাতো না আর প্রত্যেকে তাতে বিস্মিত হতো। ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিটিউড উপন্যাসটি লিখতে গিয়ে, প্রথম প্রথম উপন্যাসের ঘটনাগুলিতে বিশ্বাস না রেখেই গল্প বলার চেষ্টা করেছিলাম। তারপরে বুঝলাম, আগে আমার নিজের মনে এই ঘটনাগুলির প্রতি বিশ্বাস জন্মাতে হবে তারপর লিখতে হবে ঠাকুরমার অভিব্যক্তি নিয়েঃ কঠোর মুখে।

গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ। পিটার স্টোনকে এক সাক্ষাৎকারে।

মুছে দেয় কলা কোম্পানির অস্তিত্ব। মারা যায় অসংখ্য মানুষ। মাকোন্দো পরিণত হয় এক হতাশাময় মৃত্যুপুরীতে। এর পাশাপাশি চলতে থাকে বুয়েন্দিয়া পরিবারের জীবনধারা। কর্নেল আউরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া যুদ্ধে আগ্রহ হারিয়ে শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করে ঘরে ফিরে আসে এবং দিন কাটাতে থাকে শুধুমাত্র ছোট ছোট সোনার মাছ তৈরি করে। শেষে, যে বাদামগাছে তার বাবাকে বেঁধে রাখা হত সেখানে প্রস্রাব করার সময় তার মৃত্যু হয়।

এ উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র উরসুলা ইগুয়ারান; তার অনবদ্য শক্তি, ধৈর্য, উৎসাহ ও বাস্তববুদ্ধি গড়ে তোলে মাকোন্দোর পারিবারিক জীবন। যদিও তার মেয়ে আমারান্তা বা অন্য নারীরা এই চারিত্রশক্তির অধিকারী ছিল না। অনেক পরে পঞ্চম প্রজন্মের দুটি মেয়ে রেনাতা রেমেদিওস (মেমে) ও আমারান্তা উরসুলার মধ্যে তার শক্তির কিছুটা ঝলক থাকলেও বাস্তব বুদ্ধির অভাবে তারা ব্যর্থতা প্রতিরোধ করতে পারেনি। পাঁচ বছর যাবৎ টানা বৃষ্টির প্রভাবে বুয়েন্দিয়া পরিবারেও নেমে আসে ধ্বংস আর হতাশার ছায়া। বাইরের পৃথিবী থেকে পুনরায় পরিত্যক্ত সেই শহরে এই পরিবারের বয়স্ক সদস্যরা ক্রমশ নস্টালজিয়ায় ডুবে যায় আর নতুন প্রজন্ম হারিয়ে যায় লাম্পট্য ও একাকিত্বের অন্ধকারে। শেষপর্যন্ত মেমের অবৈধ পুত্র আউরেলিয়ানো বাবিলোনিয়ার সঙ্গে তার মাসি আমারান্তা উরসুলার অবৈধ সম্পর্কের ফলে জন্ম নেয় যে সন্তান, তার শরীরে থাকে শুয়োরের লেজ। অজাচারী সম্পর্কের ফলে সন্তান শুয়োরের লেজ নিয়ে জন্মাতে পারে এই ভয় উরসুলার ছিল এবং গোটা উপন্যাসে সেই ভয় প্রবাহিত হয়ে সবশেষে বাস্তবের আকার নেয়। সন্তান জন্মের পরেই মারা যায় আমারান্তা উরসুলা আর শোকগ্রস্ত আউরেলিয়ানো বাবিলোনিয়ার অবহেলায় কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা যায় বাচ্চাটিও। পরিসমাপ্তিতে এটাই উচ্চারিত হয় যে, বুয়েন্দিয়া পরিবারের পরিণতি ছিল পূর্বনির্ধারিত এবং তাকে পুনর্বিন্যস্ত করার কোনও সুযোগ আর তাদের ছিল না।

উপন্যাসটির আঙ্গিক ও ভাষা বিশ্বসাহিত্যে অতুলনীয়, বহু প্রশংসিত ও বহু আলোচিত। যাদুবাস্তববাদ, রূপক ও ব্যাজস্তুতির সঙ্গে নিরপেক্ষ কথনের সহাবস্থান ওই উপন্যাসকে দিয়েছে মহাকাব্যিক মাত্রা। একেবারে শেষের দিকে দেখা দিয়েছেন স্বয়ং লেখক— স্বনামে, স্বল্প পরিসরে ও একটি অত্যন্ত গৌণ চরিত্রে। এও অতি বিরল ঘটনা। লেখকের নোবেল পুরস্কার পাওয়া ছাড়াও উপন্যাসটি ফ্রান্স ও ভেনেজুয়েলার সাহিত্য পুরস্কার লাভ করে।

অরুন্ধতী ভট্টাচার্য

গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ-এর 'লাভ ইন দ্য টাইম অব কলেরা'

মার্কেজের সব উপন্যাসেরই একটা বিশেষ চরিত্র থাকে। তাঁর ক্যানভাসটা সবসময় অনেক বড়ো, তাঁর উপন্যাসের বিস্তৃতিকে সময়ের সূচকে মাপা যায় না, তা আসলে কাল। মার্কেজের যে উপন্যাস তাঁকে নোবেল পুরস্কার এবং অমরত্ব এনে দিয়েছে, সেই 'ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অফ সলিটিউড'ও সাত প্রজন্মের অজস্র চরিত্রের ঘনঘটায় পুষ্ট। 'লাভ ইন দ্য টাইম অব কলেরা'র মধ্যেও মার্কেজ পুরে দিয়েছেন ৫০টি বছর, মোটামুটি আটের দশকের শেষ দুই দশক এবং নয়ের দশকের প্রথম তিন।

কী বলা যায় এই উপন্যাসটির চরিত্র সম্পর্কে? মধুর প্রতিশোধপরায়ণতার কাহিনি? নাকি, ভালোবাসার জন্য আধ শতকের দীর্ঘ প্রতীক্ষার মহাকাব্য? নাকি সেসব কিছুই নয়, প্রেমের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা, ব্যভিচারিতার পুরনো কাসুন্দি? নাকি, এর সবকিছুর একটা নিটোল প্যাকেজ, ঠিক যেমনটি চায় হলিউড?

এ কথা সত্যি, হলিউড এই উপন্যাসটিকে লুফে নিয়েছে এবং বানিয়েছে বক্স-অফিস সফল ছবি। কিন্তু এভাবে বললে কিছুই প্রায় বলা হয় না উপন্যাসটির গড়ন সম্পর্কে। ছবির দর্শক নন, কেবল মনোযোগী পাঠকই টের পান, এই উপন্যাসের স্তরে স্তরে লুকিয়ে আছে মনুষ্যজীবনের কত মর্মান্তিক জটিলতা। এতটাই জটিল যে অনেক সময় বোঝাই যায় না উপন্যাসের চরিত্রগুলির মন। কাহিনির তরতরে বহতা নদীর নীচে তরঙ্গের মর্মরতা বোঝা যায় কেবল একাধিকবার পাঠে।

সন্দেহ নেই, মার্কেজ আমাদের সময়ের শ্রেষ্ঠ গল্পকইয়ে। কাহিনি যেন এক দীর্ঘ বিনুনি তাঁর কাছে, পাঠকের সামনে মার্কেজ সময় নিয়ে সেই বিনুনি খুলতে বসেন। 'লাভ ইন দ্য টাইম অব কলেরা'-তেও রয়েছে পাঠকের সঙ্গে তাঁর সেই শানিত বুদ্ধির খেলা।

কাহিনিসূত্র মোটামুটি এরকম: জুভেনাল উর্বিনো একজন চিকিৎসক। তাঁর স্ত্রী ফারমিনা ডাজা একজন গৃহবধূ। তাঁরা কোন দেশের নাগরিক তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি উপন্যাসটিতে। তবে এটুকু বোঝা যায়, সমুদ্র উপকূলবর্তী সেই দেশ দীর্ঘ যুদ্ধবিগ্রহ আর কলেরা সংক্রমণে মুমূর্ষু। বিদেশফেরত চিকিৎসক উর্বিনো অল্পদিনেই কেবল ধন্বন্তরি ডাক্তার হিসেবেই নয়, কলেরার প্রকোপ কমানোর জন্য নানা সামাজিক কাজের সূত্রেও সমাজে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিত্ব। কাহিনি যখন শুরু হচ্ছে, তিনি তখন বৃদ্ধ, বর্ষীয়সী তাঁদের দাম্পত্য। উপন্যাসের গোড়ার দিকেই, পালিয়ে যাওয়া পোষা তোতাটিকে গাছ থেকে নামিয়ে

স্মরণীয় পংক্তি

তোমার চোখের জলের যোগ্য কেউ নয়, যদি কেউ এমন যোগ্য হয়, (জেনো) সে তোমায় কখনও কাঁদাবে না।

...

ভালোবাসা একটা স্বাভাবিক প্রতিভা। এটা কীভাবে হয়, হয় সেটা জেনেই তুমি জন্মাও, নয়তো কোনওদিনই জানতে পারো না।

...

ভালো বন্ধু সে-ই যে তোমার হাত ধরে আর স্পর্শ করে তোমার হৃদয়।

...

একটি মিথ্যা, সন্দেহের থেকে বেশি সহনীয়, ভালোবাসার থেকে কার্যকরী আর সত্যের চেয়ে দীর্ঘায়ু।

...

হতে পারো এই বিরাট পৃথিবীতে তুমি সামান্য একজন মানুষ, কিন্তু এমন কেউ তো আছে যার কাছে তুমিই পৃথিবী।

...

না, ধনী না। আমি একজন সামান্য মানুষ, যার টাকাপয়সা আছে। দুটো জিনিস এক নয়।

...

বুড়ো হবার সময় একজন মানুষ টের পায়, কেন না তখন তাকে ক্রমশ তার বাবার মতো দেখতে লাগে।

আনতে গিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ে তাঁর মৃত্যু হচ্ছে। সদ্যবিধবা ফারমিনা শোকস্তব্ধ। অন্ত্যেষ্টির পর তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একে একে চলে যাচ্ছেন অতিথিরা। শোকের মধ্যেও যে ধ্বনি থাকে তা ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসছে। শেষতম অতিথিকে বিদায় জানিয়ে সদর দরজার দিক থেকে মুখ ফেরাতেই ফারমিনা দেখলেন শূন্য ড্রয়িংরুমে তখনও একজন রবাহূত অতিথি দাঁড়িয়ে—ফ্লোরেন্তিনো আরিজা। তাঁর চোখদুটি নরম হয়ে এসেছিল। অর্ধশতকেরও বেশি সময় ধরে লোকটিকে তিনি মুছে দিয়েছিলেন স্মৃতি থেকে। এই শোকের দিনে আসার জন্য তিনি তাঁকে ধন্যবাদ দিতে যাওয়ার আগেই ফ্লোরেন্তিনো মাথা থেকে হ্যাটটি খুলে বুকের ওপর ধরে বললেন, 'ফারমিনা, এই সুযোগটার জন্য আমি পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে অপেক্ষা করেছি। আবার তোমার কাছে আমার আনুগত্য আর চিরকালীন ভালোবাসার কথা বলার এই সুযোগটা পাব বলে।' তাঁর বেমক্কা কথার ছিরি দেখে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন ফারমিনা। সদর দরজা দেখিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, বেরিয়ে যাও। জীবনের আর যতগুলি দিন অবশিষ্ট আছে, ও মুখ যেন আর না দেখতে হয়।

চলে গেলেন ফ্লোরেন্তিনো। তারপর বৈধব্যের প্রথম রাত দাম্পত্য বিছানায় অন্য প্রান্তে থাকা মানুষটির অনুপস্থিতি টের পেতে পেতে ঘুমের মধ্যে কেঁদে কাটিয়ে সকালে উঠে ফারমিনার মনে হল, সারারাত কি তিনি শুধু তাঁর মৃত স্বামীর জন্যই কেঁদেছেন, ফ্লোরেন্তিনোর জন্যও কি কাঁদেননি?

ঠিক এই জায়গায় থেমে পড়ে মার্কেজ আমাদের নিয়ে চললেন পঞ্চাশ বছর পিছনে। ফ্লোরেন্তিনো তখন যুবক। টেলিগ্রাফ অফিসের কেরানি। রাশভারি মদ্যপ বাপের নম্র জড়োসড়ো মেয়ে ফারমিনা স্কুলছাত্রী। ওদের ভালোবাসা চালাচালি হয় চোখের তারায় আর গোপন চিঠিতে। ফ্লোরেন্তিনোর মা বন্ধকি কারবার চালান, সেইসঙ্গে দেশে যেহেতু যুদ্ধ চলছে, তাই সেনাদের ব্যান্ডেজের কাপড়ও বিক্রি করেন। এইসময়ই যুদ্ধের সঙ্গে কলেরাও মহামারি হয়ে উঠল। আর সেইসূত্রে ছড়াতে লাগল ডক্টর জুভেনাল উর্বিনোর নাম চতুর্দিকে। উর্বিনো বিদেশে চিকিৎসাবিদ্যা পড়ে আসা ধন্বন্তরি ডাক্তারবাবু। সুপুরুষ যুবক। শহরের মেয়েরা তাঁকে গোপনে হৃদয় দিয়ে বসে আছে। কারও শরীরে একবার কলেরার উপসর্গ দেখা গেলেই সে ডক্টর উর্বিনোকে একবার দেখিয়ে নিতে চায়। সেইমতোই লোরেঞ্জ ডাজার বাড়িতে তাঁর কন্যা ফারমিনাকে দেখতে এসে উর্বিনো তার প্রেমেই পড়ে গেলেন। ডাক্তারবাবুর চোখে ভালোবাসার তরঙ্গ অভিজ্ঞ লোরেঞ্জের চোখ এড়ালো না। এবং তিনি যত রকম ভাবে সম্ভব চেষ্টা শুরু করে দিলেন যাতে ফারমিনা ওই টেলিগ্রাফ আপিসের কেরানিবাবুটিকে ভুলে যায়। এমনকি তাকে দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় নিয়ে যাওয়া অবধি বাদ দিলেন না। ঘটনাক্রম যেদিকে গড়ালো তাতে ফারমিনারও মনে হতে থাকল উর্বিনোর প্রেম একটা স্বর্ণমারীচ। মনের যে অঞ্চলটা দখল করে রেখেছিল ফ্লোরেন্তিনো আরিজা নামে সেই যুবক, সেখান থেকে তাকে ঘষে তুলে সেই জায়গায়, লেখকের ভাষায়, আফিমের খেত বসিয়ে দিল কিশোরী মেয়েটি।

দীর্ঘ বিরহ যন্ত্রণা দুজনকেই ভোগাল বেশ কিছুদিন। তারপর দুজনেই মিশে গেল জীবনের স্বাভাবিক তরঙ্গে। তবে জীবনের অভিমুখ উভয়ের ক্ষেত্রেই গেল বদলে। ফারমিনা যেমন বিবাহ-সন্তানধারণ-স্বামীর চণ্ড মেজাজ আর দজ্জাল শাশুড়ির এক্তিয়ারে হয়ে উঠল বাড়ির 'অভিজাত কাজের লোক', তেমনই কেরানিগিরি ছেড়ে জাহাজ-ব্যবসায় প্রবল উত্থান সত্ত্বেও প্রেমের প্রত্যাখ্যান যেন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াল ফ্লোরেন্তিনোকে। যার দরুন সে জড়িয়ে পড়তে থাকল একের পর এক মন আর শরীরময় সম্পর্কে। কিন্তু প্রথম প্রেমের স্মৃতি রয়েই গেল ছাইচাপা আগুনের মতো।

ইতিমধ্যে দুজনের জীবনই গেছে অনেক ঘটন-অঘটনের মধ্য দিয়ে। অনেকানেক সম্পর্কে জড়িয়েও ফ্লোরেন্তিনো যেমন সেসবের মধ্যে প্রথম প্রেমের কোনও নিশ্চিত বিকল্প খুঁজে না পেয়ে কঠোর অতৃপ্তিতে ভুগেছে, তেমনই ফারমিনা একদিন শিউরে উঠেছে জুভেনাল উর্বিনোর অবৈধ সম্পর্কের কথা আবিষ্কার করে। আর এভাবেই কেটে গিয়েছে ৫১ বছর ৯ মাস ৪ দিন।

উর্বিনোর মৃত্যুর দিন ফ্লোরেন্তিনোকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়ে, সারা রাত কেঁদে ভাসিয়ে, সকালে সেই ফ্লোরেন্তিনোকেই একটি দীর্ঘ চিঠি লিখলেন ফারমিনা। বহুবছর পর, অথচ তাতে কোনও ভালোবাসার কথা আর নেই, আছে ঘৃণা আর শাপমন্যি। কিন্তু এও এক ঘনিষ্ঠতার সূচনাই প্রত্যাখ্যানের মধ্যে দিয়ে। এক চিঠির উত্তরে আর এক চিঠি, তার জবাবে আর এক, এইভাবে একদিন আমরা ফ্লোরেন্তিনোকে দেখতে পাচ্ছি নিঃসঙ্গ ফারমিনার সঙ্গে তারই বাড়িতে একান্তে বিকেলের চা পান করতে। ফ্লোরেন্তিনোর কোনও একদিনের অনুপস্থিতিতে সত্তরোর্ধ ফারমিনার মানসিক অস্থিরতা, অস্বীকারের প্রাবল্য সত্ত্বেও, কুণ্ঠার সঙ্গে প্রকাশিত হতে দেখছি। এমনই এক অলস অপরাহ্নে পাকা জাহাজি ফ্লোরেন্তিনো প্রস্তাব করলেন, দুজনে নদীবক্ষে দূর যাত্রায় যাওয়া যায় না? এ প্রস্তাব যেন মেনে নেওয়ার জন্যই রাখা। দীর্ঘ যাত্রায় কৈশোরের প্রেমিক দুই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা জগৎসংসার ভুলে অপরাহ্নের আলোয় পরস্পরকে আবিষ্কার করছেন এবং শেষে যখন এ নদীপথের শেষ বন্দরে জাহাজ নোঙর করতে যাবে, তখন ফারমিনার মনে পড়ে যাচ্ছে তার সামাজিক অবস্থানের কথা, দীর্ঘদিন ধরে গড়ে তোলা পায়ের তলায় আভিজাত্যের জমির কথা। জাহাজের জানলা থেকে বন্দরে বেশ কিছু পরিচিত মানুষজনকে ঘোরাফেরা করতে দেখে তাকে পেয়ে বসল ভয়, সম্ভ্রম হারানোর। ফ্লোরেন্তিনোর সঙ্গে তাকে দেখলে কেচ্ছাকেলেঙ্কারির কি কিছু বাকি থাকবে!

কী করা যায়! ফ্লোরেন্তিনোর নির্দেশে তক্ষুনি জাহাজের কাপ্তেন মাস্তুলে হলুদ পতাকা তুলে দিল। হলুদ পতাকা একটা সংকেত। এর অর্থ, জাহাজে কলেরা দেখা দিয়েছে। সংকেত দেখে জাহাজের বাকি যাত্রীরা প্রাণ বাঁচাতে তড়িঘড়ি নেমে পড়ল বন্দরে। জাহাজে এখন কেবল ফারমিনা আর ফ্লোরেন্তিনো, আর জাহাজের কাপ্তেন আর তার প্রেমিকা। বন্দর ছেড়ে গেল জাহাজ। হলুদ পতাকা যতক্ষণ উড়বে ততক্ষণ কোনও বন্দর এ জাহাজ নোঙর করতে দেবে না কলেরা সংক্রমণের ভয়ে। জলযানের গায়ে অনির্দিষ্টের ঠিকানা সেঁটে দিয়ে উপন্যাস এখানেই শেষ করে দিলেন মার্কেজ।

কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

উপন্যাস সম্পর্কে লেখক

উপন্যাসটির (লাভ ইন দ্য টাইম অব কলেরা) শেষ কীভাবে হবে সেটা একটা সমস্যার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। কারণ, শেষে যদি দুজনের মধ্যে কোনও একজন বা দুজন চরিত্রই মারা যায়, সেটা খুবই কুরুচিকর দেখাবে। সবচেয়ে ভালো হবে যদি দেখানো যায় তারা চিরকালের জন্য পরস্পরকে ভালোবেসে গেল। সুতরাং পাঠককে এই সান্ত্বনা দেওয়া হল যে, প্রেমিকদের নিয়ে সেই জলযান তার যাত্রা বহাল রাখল, এল এবং গেল...। শুধু তাদের অবশিষ্ট জীবনের জন্য নয়, চিরকালের জন্য।

গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ। একটি সাক্ষাৎকারে।

চার্লস ডারউইন-এর 'দ্য অরিজিন অব স্পিসিস'

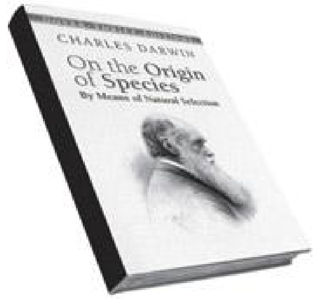

বিশ্বের ইতিহাসে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারে গবেষণাপত্র বা বইয়ের ভূমিকা অপরিসীম। বিজ্ঞানী-গবেষক-চিন্তকদের একেকটি লেখা বা কাজ যেন দেশকালের সীমারেখা পেরিয়ে বহুদূর বিস্তৃত হয়েছে। এমনও হয়েছে এই ধরনের কোনও প্রকাশনা মানুষের প্রচলিত বিশ্বাস, চিন্তাধারাকে সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত করেছে। এমনই একটি বই— বলা ভালো গবেষণালব্ধ ফল হল চার্লস ডারউইন লিখিত 'দ্য ওরিজিন অব স্পিসিস', যার প্রথম প্রকাশকাল ২৪ নভেম্বর, ১৮৫৯। যদিও প্রথম প্রকাশকালে এই বইটির নাম ছিল 'অন দ্য ওরিজিন অব স্পিসিস বাই মিন্স অব ন্যাচারাল সিলেকশন, অর দ্য প্রিজারভেশন অব ফেভার্ড রেসেস ইন দ্য স্ট্রাগল ফর লাইফ'। ১৮৭২-এ ষষ্ঠ সংস্করণে বইটির নাম পরিবর্তিত হয়ে হয় 'দ্য ওরিজিন অব স্পিসিস'।

১৮০৯ সালে ডারউইনের জন্মের আগে থেকেই ইউরোপের চিন্তাবিদরা জীবজগতের উদ্ভব ও তার বিস্তার সম্পর্কে চর্চা করতেন। এমনকি চার্লসের পরিবারেও তাঁর পিতামহ এরাসমাস ডারউইন বিবর্তন সম্পর্কে উৎসাহী হয়ে পড়েন। যদিও সে সময়ে সকলেই বিশ্বাস করতেন যে সৃষ্টির মূলে আছেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর— যিনি সব জানেন, সব পারেন। ছাত্রাবস্থায় চার্লস গ্রান্ট, ল্যামার্ক, প্যালে, হেনস্লো, সেজউইক, লাইয়েল, ওয়েন প্রমুখ বিজ্ঞানীর কাজ গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। এব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করে এডিনবরা ও কেমব্রিজের বিজ্ঞান-বান্ধব পরিবেশ।

কিশোর বয়স থেকেই চার্লসের মনের মধ্যে যে প্রশ্নসমূহের ভিড়, সত্যসন্ধানের যে আকুলতা, তা যেন তাঁকে ঘরের চার দেওয়ালের বাইরে দেখতে শেখাল। এইচ এম এস বিগল জাহাজে চড়ে তিনি পাড়ি দিলেন দূর সমুদ্রপথে। দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে। দেশ থেকে দেশান্তরে। তিনি তাঁর হাতের খাতায় লিখে চললেন জীবজগতের খুঁটিনাটি। তাদের বাস্তুতন্ত্র থেকে স্বভাব। অঙ্গের প্রকারভেদ থেকে জীবাশ্মের ধরন— সব কিছু। দীর্ঘদিনের সফর, বলা ভালো এই কেজো বিজ্ঞান যাত্রা চার্লসের মনের মধ্যে তোলপাড় তুলল। প্রশ্নজালে তিনি নিজেকেই ক্ষতবিক্ষত করতে লাগলেন তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে। ফিরে এসে তিনি কিছুটা অসুস্থও হয়ে পড়েন— যদিও নিরলসভাবে চালিয়ে যান তাঁর গবেষণার কাজ। দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকে এই প্রক্রিয়া। চার্লসের ভাবনার ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল একটি বই— মালথাসের লেখা 'অ্যান এসে অন দ্য প্রিন্সিপল অব পপুলেশন'। নিজের লেখাটাকে ক্রমশ বিস্তৃত করে চলেন তিনি। কিছুটা গোপনেই। যদিও তাঁর ঘনিষ্ঠ ও শ্রদ্ধেয় কয়েকজন বিজ্ঞানীর সঙ্গে তিনি ভাবনার আদানপ্রদান করেই চলেন। যেমন লাইয়েল, যেমন ডালটন হুকার। হুকার এই সময়ে তাঁকে কিছু গঠনমূলক পরামর্শও দেন। এই সময়ে একজন স্কটিশ বিজ্ঞানী রবার্ট চেম্বার্স-এর লেখা 'ভেস্টিজেস অব দ্য ন্যাচারাল হিস্টোরি অব ক্রিয়েশন' (১৮৪৪) তাঁর নিজস্ব ভাবনার বিস্তারে উদ্দীপক হিসাবে কাজ করেছে। ১৮৫৬ সালে লাইয়েল, চার্লস ডারউইনকে একজন অল্পবয়সী গবেষকের কথা বলেন— যাঁর নাম আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস। ওয়ালেসের গবেষণার ক্ষেত্র তখন বোর্নিওতে। বিবর্তনবাদের ধারা নিয়ে ওয়ালেসের গবেষণাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। যাই হোক, অবশেষে বহু দ্বিধা, প্রশ্ন ও বিরোধিতাকে কাটিয়ে প্রকাশিত হয় চার্লস ডারউইনের সেই বিশ্বখ্যাত গবেষণাপত্র। সমস্ত বই সঙ্গে সঙ্গেই বিক্রি হয়ে যায়। প্রথমে প্রকাশিত হয় ১,২৫০ কপি, যার মধ্যে ১,১৭০ কপি ছিল বাইরে বিক্রির জন্য। দ্বিতীয় সংস্করণে ৩,০০০ কপি ছাপা হয় এবং তা হয় ১৮৬০ সালের ৭ জানুয়ারি। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৮৬১, ১৮৬৬ এবং ১৮৬৯ সালে। সর্বপ্রথম, পঞ্চম সংস্করণেই (১০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৯) বারবার ঘুরেফিরে আসে সার্ভাইভ্যাল অব দ্য ফিটেস্ট-এর কথা। প্রসঙ্গত, এই 'সার্ভাইভ্যাল অব দ্য ফিটেস্ট' শব্দবন্ধনী হারবার্ট স্পেন্সার কৃত। প্রথম সংস্করণের দাম ঠিক হয়েছিল প্রতি কপি পনেরো শিলিং। ষষ্ঠ সংস্করণে বইটির নাম থেকে 'অন' কথাটি বাদ পড়ে এবং ছোট অক্ষরে ছাপা হয়। তাতে দামও হয় অর্ধেক এবং বিক্রিও যায় বেড়ে।

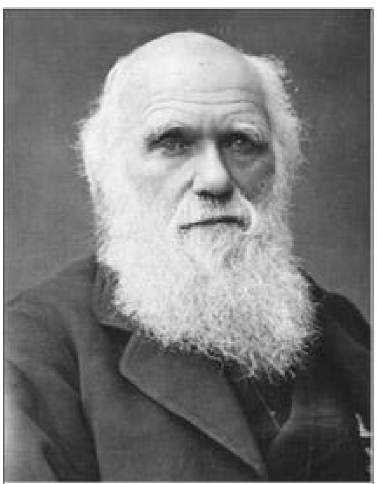
চার্লস ডারউইন

'সার্ভাইভ্যাল অব দ্য ফিটেস্ট' শব্দবন্ধনী হারবার্ট স্পেন্সার কৃত। প্রথম সংস্করণের দাম ঠিক হয়েছিল প্রতি কপি পনেরো শিলিং। ষষ্ঠ সংস্করণে বইটির নাম থেকে 'অন' কথাটি বাদ পড়ে।

প্রশ্ন হল, যে বই নিয়ে এত মাতামাতি, আলোচনা— কী ছিল সেখানে? বর্তমানে আলোচিত চার্লস ডারউইনের গবেষণাপত্র তথা বইটি, মূলত তাঁর প্রাকৃতিক পর্যবেক্ষণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার ওপর ভিত্তি করে লিখিত। চার্লস খেয়াল করেছিলেন প্রজাতির বাহ্যিক রূপ। পরিবেশের সঙ্গে তাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা। এই সব প্রজাতির-ই ক্ষমতা আছে প্রবলভাবে বংশবৃদ্ধি করার। কিন্তু কোথাও যেন একটা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আছে। যে পৃথিবীতে জীবের ও জীবনের এত কর্মকাণ্ড সেখানে খাদ্য ও বাসস্থান কিন্তু সীমিত। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বাঁচবার জন্য সংগ্রাম— এই সংগ্রামের তিনটি স্তর আছে— প্রজাতির নিজেদের মধ্যেকার, অন্য প্রজাতির সঙ্গে এবং পরিবেশের বিরূপতার সঙ্গে। জীবনের যুদ্ধে জয়ী হচ্ছে তারাই— যারা যোগ্য। যাদের ব্যবহারিক শক্তি প্রবলতর। আছে প্রজাতির বিভিন্ন সদস্যের বিভিন্নতা। সুবিধাজনক বিভিন্নতাকেই নির্বাচিত করা হয়। এটাই প্রাকৃতিক নির্বাচন। যে সময় ডারউইন এসব ভেবেছিলেন, চর্চা করেছিলেন, লিখেছিলেন— সে সময় আধুনিক জীববিদ্যার বহু শাখাই উন্মোচিত হয়নি। তাই হয়তো ডারউইন-পরবর্তী সময়ে অন্য বহুবিধ আলোচনার বিস্তার হয়েছে— তবু একথা অনস্বীকার্য যে 'The origin of species' বইটি

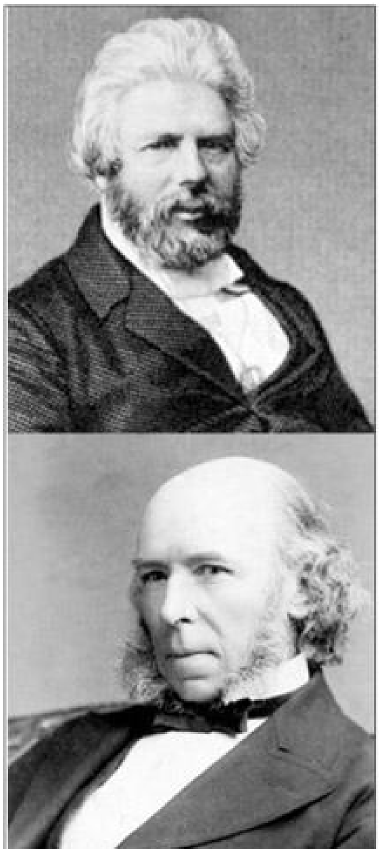

দ্য অরিজিন অব স্পিসিসে অবদান রেখেছেন দুজনেই— রবার্ট চেম্বার্স (ওপরে) এবং হারবার্ট স্পেন্সার

মানব সভ্যতায় একটি অনন্যসাধারণ সংযোজন। যে ফিঞ্চ (Finch) পাখিকে চার্লস দেখেন সুদূর দ্বীপপুঞ্জে— কিংবা সামুদ্রিক মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণিকূলকে ঘুরে বেড়াতে দেখেন দ্বীপসমূহের আশপাশে বা গভীর সমুদ্রে— তাদের অঙ্গসংস্থান, বাস্তুতন্ত্র, স্বভাব ইত্যাদি সবকিছুই তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে, প্রশ্ন তুলে দিয়েছে তাঁর যুক্তিবাদী মনে। তিনি ক্রমে বুঝতে পারেন এবং নিশ্চিত হন যে গতিশীলতাই বিবর্তনবাদের মূলমন্ত্র। সেখানে কোনওকিছুই দাঁড়িয়ে থাকে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জীববৈচিত্রের রকমফের হয়। বদলে যায় জীবের বাহ্যিক রূপরেখা— ক্রমে তৈরি হয় নতুন প্রজাতি— বহু রকমের প্রজাতি। বলা যায় প্রজাতির উৎস সন্ধানে— এটাই চার্লসের মহা-আবিষ্কার।

আর এই বিশ্লেষণ ও ভাবনার শরিক হতে হলে যে বই হাতের কাছে থাকতেই হবে, পড়তেই হবে— বলা ভালো জানতেই হবে, সেটি হল— চার্লস ডারউইনের দ্য ওরিজিন অব স্পিসিস।

ডঃ অনিরুদ্ধ মুখোপাধ্যায়

সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী'

'জাগরী' (প্রকাশকাল: ১৯৪৫) সতীনাথ ভাদুড়ীর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ, প্রথম রবীন্দ্রপুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস। 'জাগরী' কথাটির অর্থ— বিনিদ্র'। একটি রাত্রিতে একই পরিবারের চারজনের বিচ্ছিন্নভাবে বিনিদ্র রাত্রিযাপনের কাহিনী যেমন 'জাগরী', তেমনই নিজেদের ভেতরের প্রকৃত 'আমি'টিকে উপলব্ধি করার তথা আত্মা বা সত্তার জাগরণই হল 'জাগরী'।

জেলের ট্রায়াল সেলে বসে জীবনশিল্পী সতীনাথ লিখেছিলেন 'জাগরী'র চারটি অধ্যায়— 'ফাঁসির সেল' (বিলু); 'বাবা'; 'আওরৎকিতা' (মা); 'নীলু' (জেলেগেটে)। ৪২-এর আগস্ট আন্দোলনে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি বিহার অঞ্চলে যে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালায়, তাতে নেতৃত্ব দিয়েছিল পরিবারের বড় ছেলে বিলু। কিন্তু ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে দেশের শাসকশক্তির সমর্থনে বিলুকে ধরিয়ে দেয় তারই ছোট ভাই নীলু এবং বিলুর ফাঁসির আদেশ হয়। ভাবুক অথচ আত্মবিশ্বাসী বিলু জেলের পণ্ডিতজির দৃষ্টিতে 'নাস্তিক'— বাবার পাঠানো 'গীতা' ফেরত পাঠিয়ে জানিয়েছে ধর্মোপদেশে তার কোনও প্রয়োজন নেই।

গর্বিত, অহংদৃপ্ত এহেন বিলুই আবার পূর্ণিয়ার মুক্তিকামী মানুষদের কাছে আদর্শচরিত্র ভালো ছেলে। অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ, সহানুভূতিশীলও সে— জ্যাঠাইমাকে 'মা' বলে সম্বোধনে জ্যাঠাইমার মনে যে ছবি ভেসে ওঠে এবং এই ঘটনা শুনে মায়ের মনে যে বেদনাকর অনুভূতি— এইসব উপলব্ধিতে; মায়ের সঙ্গে দুই ভাইয়ের হাস্যালাপে বিলুর মায়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ব, মায়ের জন্য দুধটুকু রেখে যাওয়া— এইসব অসংখ্য ঘটনায় বিলুর কোমল হৃদয়ের আঁচটুকু দিয়ে যান লেখক।

শেষ পর্যন্ত, মৃত্যু যতই কাছে এসেছে, বাঁচার তীব্রতা, আকাঙ্ক্ষা ততই বৃদ্ধি পেয়েছে বিলুর মধ্যে— আদর্শবান চরিত্রও শেষ পর্যন্ত চিনতে পেরেছে নিজের ভেতরকার সত্য 'আমি'টিকে— যেখানে সে বাঁচতে চেয়েছে রাজনৈতিক নেতা বা বাবা-মায়ের ছেলে বা নীলুর দাদা হয়ে নয়— ভবিষ্যতের সুন্দর সুখস্বপ্নময় জীবনে গৃহী মধ্যবিত্ত মানুষ হয়েই।

'জাগরী' উপন্যাসের 'বাবা' আদর্শ গান্ধিবাদী, সকলের পরিচিত মাস্টার সাহেব। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে চাকরি ছেড়ে বাড়িটিকে করে তুলেছিলেন আশ্রম। এরপর ৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে প্রথম সারির রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে স্থান পেয়েছেন জেলের আপার ডিভিশন ওয়ার্ডে। কিন্তু তাঁর এই গান্ধি আদর্শ, নিরাসক্ত অহিংস মনোভাব ছেলেদের সঙ্গে তাঁর ব্যবধান ক্রমেই বাড়িয়ে দিয়েছে। তাই বড় ছেলে বিলুর জীবনের অন্তিমক্ষণটিতে আত্মযন্ত্রণায় কাতর হয়েছেন তিনি— 'কোনওদিন উহাদের সহিত প্রাণখোলাভাবে মিশি নাই। কোলেপিঠে করিয়া আদর করি নাই।' বোঝা যায়, বাবার চূড়ান্ত আদর্শও তাঁর সাধারণ মধ্যবিত্ত মানসিকতার কাছে কতটা পরাজিত!

'জাগরী' উপন্যাসে 'মা' চরিত্রটি সবচেয়ে সজীব এবং আদ্যন্ত বাস্তব। স্বেচ্ছায় তিনি রাজনীতির পথে আসেননি, হিন্দু নারীর স্বাভাবিক সংস্কার অনুযায়ী তিনি স্বামীর অনুগামিনী হয়ে বর্তমানে কোলের আওরৎকিতায় স্থান পেয়েছেন। জেলে বসেই তিনি শুনেছেন বড় ছেলের ফাঁসির কথা অথচ তিনি চাননি নিশ্চিন্ত সংসার, স্বামী-সন্তানসুখ বিসর্জন দিয়ে দারিদ্র আর দুঃখকে সঙ্গী করতে। স্বামী যে সুখ, মুক্তি দেননি, ছেলেরা বড় হয়ে মায়ের দুঃখ ঘুচিয়ে তাকে দেবে পূর্ণ স্বাধীনতা— এই আশাতেই বুক বেঁধেছিলেন তিনি। তাই গান্ধি আদর্শে ক্ষোভপ্রকাশ করে তিনি বলেছেন— 'তোমার দেখানো রাস্তায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনের মিল হয় না, বাপ-ছেলেতে ভালোবাসার সম্পর্ক থাকে না, ভাই ভাইয়ের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়।'

'জাগরী'র শেষ আত্মকথক চরিত্র নীলু বামপন্থী চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হলেও মায়ের কাছে নীলু দাদা-অন্তপ্রাণ, দাদা যা করবে, তাই-ই তার করা চাই। কঠোর, নিষ্ঠাবান রাজনৈতিক কর্মীর কাছে যেমন হৃদয়াবেগ, ব্যক্তিগত সম্পর্ক সব তুচ্ছ হয়ে যায়, নীলুরও তাই হয়েছে। সে মনে করে, সে অন্যায় করেনি, কর্তব্য করেছে মাত্র। কিন্তু পরিশেষে, সেও তার নিজের মনের চেহারা চিনতে পেরেছে।

নিঃসঙ্গ আত্মমগ্নতায়, দাদার কাছে নিজের মনের কথাটা বুঝিয়ে বলার ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। দাদা তাকে ভুল বুঝে চলে যাবে— এই আশঙ্কা, দ্বন্দ্বকে সরিয়ে ফেলে মনের ভার লাঘব করতে চেয়েছে।

এইভাবে বিলুর ফাঁসির চূড়ান্ত ক্ষণটিকে কেন্দ্র করে প্রত্যেকেই আত্মবিশ্লেষণে মগ্ন হয়ে চিনতে চেয়েছে নিজের অন্তরতম 'আমি' সত্তাটিকে। আত্মকথনরীতির বিন্যাস, চেতনাপ্রবাহরীতির সার্থক প্রয়োগ 'জাগরী'র এই অনন্য কথাবস্তুকে, বহুমাত্রিক অন্তঃচরিত্র বিশ্লেষণকে অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে।

অপরাজিতা রায় (আচার্য)

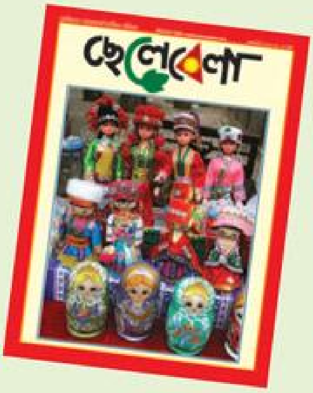

ভ্রমণ ছেলেবেলা

ও আমাদের অন্যান্য পত্রিকার গ্রাহক হতে

লগ অন করুন: www.swarnakshar.in

এক আশ্চর্য বইয়ের পরমাশ্চর্য MP3 সিডি

অবাক করা গানে-সুরে
বাদ্যি-বাজনায়
অভিনয়ে জমজমাট
প্রায় দু'ঘণ্টার
MP3 সিডি

হীরু ডাকাত

সব বয়সের ছোটদের মস্ত বড় আনন্দের আয়োজন

মূল রচনা ও শ্রুতিনাট্যরূপ: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
সংগীত ও পরিচালনা: দীপক চৌধুরী
অভিনয়: সন্তু মুখোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়চৌধুরী ও আরও অনেকে
ভাষ্যপাঠ: অনসূয়া মজুমদার গান: স্বপন বসু ও আরও অনেকে
সিম্ফনি, মিউজিক ওয়ার্ল্ড ও অন্যান্য ক্যাসেটের দোকানে পাবেন। ₹৯৯

স্বর্ণাক্ষরে ছোটদের বই

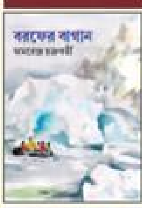

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর কিশোর-উপন্যাস
দুঃসাহসিক সমুদ্র-অভিযানের রুদ্ধশ্বাস কাহিনি

বরফের বাগান

আন্টার্কটিকার রহস্যময় তুষাররাজ্যের আশ্চর্য উপকথা।
সঙ্গে যুধাজিৎ সেনগুপ্তের ছবি। ₹১২০

ভূতের বাঁশি ₹৪০

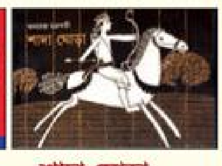
শাদা ঘোড়া ₹৩০

নতুন বই

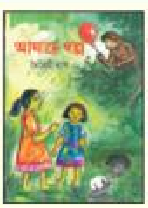
মৈত্রেয়ী নাগের আষাঢ়ে গল্প ₹৬০

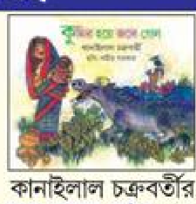
কানাইলাল চক্রবর্তীর কুমির হয়ে জলে গেল ₹৩০

মহাশ্বেতা দেবীর তুতুল ₹২৫
কানাইলাল চক্রবর্তীর চলো দেখে আসি ₹২০
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বকবকম ₹১৫
পূর্ণেন্দু পত্রীর আমার ছেলেবেলা ₹১৮
পবিত্র সরকারের কথামালা: ছড়ায় ঢালা ₹১৫
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর হীরু ডাকাত ₹৪৫
আমাজনের জঙ্গলে ₹৫০ ঋষিকুমার ₹২০
ছেঁড়াকাঁথার গল্প ₹৭৫ গৌর যাযাবর ₹৪০

কিংবদন্তি পত্রিকার সংরক্ষণযোগ্য সংকলন

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত

কবিতা-পরিচয়

রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে থেকে শুরু করে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার পর্যন্ত ২১ জন কবির ৪০টি কবিতা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন বুদ্ধদেব বসু, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ কবি। ₹১৫০

আমাদের ওয়েবসাইট:
www.swarnakshar.in
www.bhraman.com
www.ebhraman.com
www.echhelebela.com
www.ekarmakshetra.com

স্বর্ণাক্ষরে ভ্রমণবই

বিমল মুখার্জির দুচাকায় দুনিয়া ₹১৫০
শঙ্খ ঘোষের ইছামতীর মশা ₹১৫০
নবনীতা দেব সেনের ভ্রমণের নবনীতা ₹৯০
প্রতাপকুমার রায়ের দেশে দেশে ₹৭৫
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর বন্ধুভরা বসুন্ধরা ₹১২০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ভ্রমণ-ভিসিডি

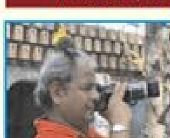

আন্টার্কটিকা ₹৫০
আফ্রিকার জঙ্গলে ₹৫০
আলাস্কা ₹৫০
সুইজারল্যান্ডের পাঁচ পাহাড়ে ₹১০০

এছাড়াও: চিন। শ্রীলংকা। দক্ষিণ থাইল্যান্ড। মিশর। নেপাল। ব্যাংকক-পাটায়া। ইন্দোনেশিয়া। মোঙ্গোলিয়া। সুমেরুবৃত্তে ভ্রমণ। নানা দেশের লোকনৃত্য ও আরও দেশ-দেশান্তরের ভ্রমণচিত্র।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর পরিচালনায়: জম্মু ও কাশ্মীর। গোয়া। গাড়োয়াল হিমালয়। হিমাচল প্রদেশ। রাজস্থান। অন্ধ্রপ্রদেশ। কেরালা। অরুণাচল প্রদেশ ও ত্রিপুরা। বারাণসী। উইক এন্ড।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত

সেরা ভ্রমণ কাহিনী

১ম খণ্ড।৩য় মুদ্রণ ₹৩৫০
২য় খণ্ড।২য় মুদ্রণ ₹২৭৫

আমাদের সব বই
সব পত্রিকা
হীরু ডাকাতের সিডি

এখানেও পাওয়া যায়:
দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩
বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট)
স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে।

স্বর্ণাক্ষর ৩০

Swarnakshar Prakasani Private Limited
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Phone: 2283 2320 **Fax:** 2287 6448 **E-mail:** info@swarnakshar.in

অনলাইনে পেতে www.swarnakshar.in লগ অন করুন

প্রেমেন্দ্র মিত্রর
'সূর্য কাঁদলে সোনা'

ঘনশ্যাম দাসের পূর্বপুরুষ, ঘনরাম দাসের সাহায্যে ইংকাদের দেশ দক্ষিণ আমেরিকার পেরুর খোঁজ পাওয়া গেল কীভাবে এবং কী হল সেই দেশে— সেই গল্প শোনালেন প্রেমেন্দ্র মিত্রের সর্বজ্ঞ ঘনাদা, 'সূর্য কাঁদলে সোনা' উপন্যাসে। ১৯৬৭-৬৮ খ্রিস্টাব্দে সাপ্তাহিক অমৃত পত্রিকায় প্রকাশিত হয় উপন্যাসটি। ভাস্কো-দা-গামার দলবলের হাতে ধরা পড়ে লিসবনে ক্রীতদাসের বাজারে বিক্রি হয়ে যায় ঘনরাম। এরপর স্পেন সম্রাটের প্রতিনিধি কর্টেজকে বিপদ থেকে উদ্ধার করায় কর্টেজের দেওয়া মুক্তিপত্র নিয়ে জাহাজে ঘনরামের যাত্রা থেকে এই কাহিনি শুরু। জাহাজের কাপিতান সানসেদো ঘনরামের হস্তরেখা বিচার করে বলেছিল, অনেক ভাগ্য বিপর্যয়ের পর ঘনরামই খুঁজে পাবে সোনার দেশ। কিন্তু জাহাজের জুয়াড়ি সোরাবিয়া, যিনি পরে পরিচয় গোপন করে, নাম ভাঁড়িয়ে মার্কুইস গঞ্জালেস দে সোলিস হবেন, তাঁর চক্রান্তে ওই ছাড়পত্র আর স্পেনের সম্রাটকে দেখাবার সুযোগ হয় না। পানামা শহরে নেমে মোরালেসের বাড়িতে দাস হিসেবে আত্মগোপন করে থাকতে হয় ঘনরামকে। সোনার দেশের গল্প তখন সব অভিযাত্রীদের মুখে মুখে। সবাই সেই দেশ খুঁজে পাওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। বেনামে চিঠি লিখে পিজারো, আলমাগরো, মোরালেসকে শুধু উৎসাহিত এবং একজায়গায় জড়ো করেই ক্ষান্ত হয় না, কাগজে লেখা অভিযাত্রার পরিকল্পনাও নিঃশব্দে শুধরে দেয় ঘনরাম। কিন্তু হঠাৎই পানামা শহরে দেখা হয়ে যায় জাহাজের সোরাবিয়া এবং তার স্ত্রী আনার সঙ্গে। জাহাজ থেকেই ঘনরামের প্রতি আসক্ত আনা। গোপনে দেখা করে ঘনরামের সঙ্গে পালাতে চায় আনা। অতএব ঘনরামকে পালাতে হয় মোরালেসের বাড়ি থেকে। কিন্তু পালিয়েও সে দেনার দায়ে বন্দি পিজারোকে মুক্ত করার জন্য সোরাবিয়ার কাছে ধরা দেয় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, একটা ছোরা দিয়ে পরাস্ত করে তলোয়ারধারী সোরাবিয়াকে। সোরাবিয়াই পুরস্কারের লোভে সম্রাট পঞ্চম চার্লসের কাছে সোনার দেশের সন্ধানকারী পিজারোর আগের অভিযানের আংশিক সাফল্য এবং বন্দিদশার কথা জানাল। ফলে পিজারোর শুধু মুক্তিই হল না, রানি আবার অভিযানের অনুমতিও দিলেন, ব্যবস্থাপত্র দস্তখতের ছয়মাসের মধ্যে আড়াইশো জনের লশকরবাহিনী যোগাড় করতে হবে এই শর্তে। কিন্তু যাত্রার আগে পিজারো দেখলেন অসম্ভব এ শর্তপূরণ। পালাবেন ভাবছিলেন।

ইংকাবাসীদের উপর এস্পানিওলদের অত্যাচার দেখে ঘনরামের নিজেকেই অপরাধী মনে হয়। নগরবাসীকে অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে রাতের অন্ধকারে সাদা ঘোড়ায়, সাদা পোশাকে প্রাচীন দেবতা ভীরাকোচার ছদ্মবেশে এগিয়ে এল ঘনরাম।

অন্যদিকে, কাপিতান সানসেদো জাহাজে রাজ-সম্পদ নিয়ে আসার সময় সোরাবিয়ার চক্রান্তে চোর প্রতিপন্ন হয়ে ফেরার আসামি হয়ে গা ঢাকা দিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় ঘনরামের। তারপর সানসেদোর কাছে গচ্ছিত ভারতবর্ষের জ্যোতিষ-গুরুর লিপি আনতে মেদেলিন শহরে বেদের ছদ্মবেশে সানসেদোর বাড়িতে গিয়ে মুখোমুখি হয়ে যায় সোরাবিয়ার। পালানোর সময় সানসেদো পায়ে ব্যথা পেলে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ঘনরাম সানসেদোকে ফেলে পালায় না। ধরা পড়ে। কিন্তু ঘনরামের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে গারদ থেকে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয় দুজনেই। এবং পালিয়ে এসে তারা পিজারোর জাহাজে ওঠে এবং পিজারোকে অবাক করে দিয়ে জাহাজ চালাতে শুরু করে।

তেরোদিন সমুদ্রযাত্রার পর পায়ে হেঁটে যাত্রা করে ষাট বছরের পিজারো। পথে চালাতে থাকে লুটপাট আর লড়াই। ঘনরামই পিজারোকে বোঝায়, নতুন দেশগুলির সঙ্গে শত্রুতা না করতে। এভাবে ১৫৩২-এর ১৫ নভেম্বর পিজারো পৌঁছলেন ইংকাদের দেশে। ইংকা নরেশ হুয়াইনা কাপাকের সন্তান আতাহুয়ালপা তাঁর বৈমাত্রেয় বড়ভাই হুয়াসকারকে বন্দী করেছেন আগেই। ১৫৩২ সালের ১৬ নভেম্বর আতাহুয়ালপা দেখা করতে আসেন পিজারোর সঙ্গে। আর তখনই পিজারো অন্যায়ভাবে অতর্কিত আক্রমণে ছত্রভঙ্গ করে ইংকা নরেশের সেনাবাহিনীকে এবং বন্দী করে আতাহুয়ালপাকে। আর এস্পানিওল সেনাবাহিনীর হাতে লুণ্ঠিত হতে থাকে ধনসম্পদ, নারী। ইংকাবাসীদের উপর এস্পানিওলদের অত্যাচার দেখে ঘনরামের নিজেকেই অপরাধী মনে হয়, পিজারোকে পেরু অভিযানে সাহায্য করার জন্য। তাই সে ইংকাবাসীকে রক্ষা করার প্রতিজ্ঞা করে। নগর বাসীকে অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে রাতের অন্ধকারে সাদা ঘোড়ায়, সাদা পোশাকে প্রাচীন দেবতা ভীরাকোচার ছদ্মবেশে এগিয়ে এল ঘনরাম। ঘনরামের পাঠানো গিঁট পাকানো রঙিন সুতোর লিপি 'কিপু'র মাধ্যমে

ইতিহাসের সঙ্গে মিশে যাওয়া এই অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাসটি ১৯৬৭-৬৮ খ্রিস্টাব্দে সাপ্তাহিক অমৃত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

আতাহুয়ালপা বার্তা পেলেন, তিনি যেন পিজারোকে একজন জ্যোতিষী পাঠাতে বলেন। কিপু সম্পর্কে এস্পানিওলদের কোনও ধারণাই ছিল না। তাই আতাহুয়ালপার হাতে কিপু দেখেও সম্রাটের পাগলামি ছাড়া আর কিছুই মনে হয়নি পিজারোর। এদিকে পিজারোর অজ্ঞানতার সুযোগ নিয়ে ঘনরাম বিচ্ছিন্ন দুই ভাইকে মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে, যাতে মিলিত শক্তি হারাতে পারে এস্পানিওলদের। ঘনরামই জ্যোতিষী সেজে যায় এবং ইংকাবাসীর মুক্তির পরিকল্পনা আতাহুয়ালপাকে বলে। সেই কারণেই আতাহুয়ালপা পিজারোকে সোনা দিতে চান। এবং সোনা উত্তোলকদের দলের সঙ্গে বালকের ছদ্মবেশে ঘনাদা নিজে এবং সৈন্যদের হাত থেকে উদ্ধার করা ইংকা রাজ্যের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত জ্যোতিষী মুইস্কা বংশের কুমারী সূর্যসেবিকা অসূর্যম্পশ্যা কয়া বেরিয়ে গেল কাকসামালকা থেকে। মেয়েটির ঠাকুরদা গণনা করে বলেছিলেন, কয়া দুর্যোগের দিনে ব্রতভ্রষ্টা হবে এবং ভারতবর্ষের কোনও পুরুষ এসে তাকে উদ্ধার করবে। ঘনাদা কয়ার হাতে কিপু পাঠিয়ে, সোনা-রুপোয় মোড়া কোরিকাঞ্চার মন্দিরের প্রধান পুরোহিতকে সোনা পাঠানোর বদলে সৌসা দুর্গে বন্দী বৈমাত্রেয় ভাই হুয়াসকারকে মুক্তি দেওয়ার কথা বলে। কিন্তু পুরোহিতের কথাবার্তাতেই ঘনাদা বুঝে নেয়, দুই ভাইয়ের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে তিনি নিজেই হতে চান ইংকা নরেশ। অতএব, সে কয়াকেই হুয়াসকারের কাছে পাঠায়, কয়ার মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে জেনেও। আর নিজে গা ঢাকা দেয় মৃত ইংকা নরেশ হুয়াইনা কাপাকের শবদেহ সেজে। তাই সারা কুজকো টুঁড়ে ফেলেও পুরোহিত, সোরাবিয়া খুঁজে পায় না ঘনাদাকে। অন্যদিকে, ঘনাদার বুদ্ধিমতো আতাহুয়ালপা অসুস্থতার ছলে পাউলো টোপার সাহায্যে পালান কাকসামালকা থেকে। রেইমি উৎসবের দিন ঘনরাম মৃত ইংকা নরেশ হুয়াইনা কাপাকের শবদেহ সেজে অপেক্ষা করে হুয়াসকারের। দুই ভাইকে একসঙ্গে দেখা করানোই তার উদ্দেশ্য। সোনায় মোড়া শবদেহ নিতে গেলে প্রেতপুরীতে যুদ্ধ হয় সোরাবিয়ার সঙ্গে ঘনাদার। অন্যদিকে হুয়াসকারকে হত্যা করেন রাজপুরোহিত। গ্রামের লোকের মনে দেবতার অভিশাপের ভয় ঢুকিয়ে গ্রামছাড়া লোকজনের ঢলের সঙ্গে মিশে এস্পানিওল-বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা পায় ঘনাদা, কয়া আর দোভাষী ফেলিপিলিও। ক্রীতদাসের বেশে জাহাজে চেপে পানামাতে ফেরত যায় তারা। বন্ধু কাপিতান সানসেদো ঘনাদা আর কয়াকে কিনে নিয়ে যায় মোরালেসের বাড়িতে। কিন্তু স্পেনের বিরোধিতা করায় দেশভক্ত মোরালেস তাদের আশ্রয় দিতে অস্বীকার করায় পানামা ছেড়ে তাদের চলে যেতে হয় নোম্বরে দে দিয়স-এ। জাহাজে জায়গা না পেয়ে ঘনাদা যখন ফিরে আসছে তখনই হঠাৎ আনা এসে খবর দেয়, কয়াকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে সোরাবিয়া। কিন্তু এর আগে পানামাতে কয়াকে দেখে আনার প্রতিহিংসার কথা ভেবে ঘনাদা বিশ্বাস করতে পারেনি আনাকে। বন্দরে না গিয়ে ফিরে গিয়েছিল আস্তানায়। গিয়ে দেখেন সত্যিই কয়া সেখানে নেই। মনে হয় কয়াকে নিয়েই গেল সোরাবিয়া। কিন্তু ঘনাদা অপরাজেয়। হঠাৎই জাহাজের ডেকে সোরাবিয়া দেখতে পায় ঘনাদাকে। সমুদ্রের জলে ঘনাদা নিক্ষেপ করে সোরাবিয়াকে। তারপর উদ্ধার করে কয়াকে। এইখানেই শেষ হয় ইতিহাসের সঙ্গে মিশে যাওয়া এই অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাসের।

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

দুই ভাইকে একসঙ্গে দেখা করানোই তার উদ্দেশ্য। সোনায় মোড়া শবদেহ নিতে গেলে প্রেতপুরীতে যুদ্ধ হয় সোরাবিয়ার সঙ্গে ঘনাদার। অন্যদিকে হুয়াসকারকে হত্যা করেন রাজপুরোহিত।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূতম্'

মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত সংস্কৃত মহাকবি কালিদাসের (৩৭৩?-৪১৪?) অসাধারণ লিরিক আখ্যান 'মেঘদূত' পৃথিবীর কাব্য-ঐতিহ্যে অভিনব। কুবেরের অনুচর এক যক্ষ স্ত্রীবিরহে তার কাজে অবহেলা করায়, কুবের তাকে রামগিরি পর্বতে নির্বাসনে পাঠায়, অলকাপুরীতে তার স্ত্রীর থেকে বহু দূরে। দুঃখাহত, চেতন-অচেতন জ্ঞানহীন এই যক্ষ বর্ষার নবীন মেঘকে দূরের অলকাপুরীতে তার স্ত্রীর কাছে দূত হিসেবে তার সংবাদ পৌঁছে দিতে অনুরোধ করে। মেঘের ভ্রমণ-পথের বিবরণে প্রাচীন ভারতের একটি মনোজ্ঞ ছবি যেমন ফুটে ওঠে, তেমনই এ কাব্যটি বিচ্ছেদ-ভারাক্রান্ত মানব-হৃদয়ের চিরন্তন মিলনস্বপ্নবেদনারও এক আশ্রয় হয়ে থাকে।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের The Origin and Development of the Bengali Language

অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রচিত ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত (১৯২৬) দু খণ্ডের (পরে তিনখণ্ড) এ মহাগ্রন্থটিতে বাংলা ভাষার বিবর্তনের পূর্ণাঙ্গ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। ইংরিজি ছাড়া খুব কম ভাষারই এত বিস্তারিত ইতিহাস রচিত হয়েছে। শুধু বাংলাভাষার ইতিহাস নয়, এই সূত্রে সমগ্র নব্যভারতীয় আর্যভাষা—হিন্দি, গুজরাতি, মারাঠি, ওড়িয়া, অসমিয়া ইত্যাদির তুলনামূলক ইতিহাসও এ গ্রন্থে প্রাপ্তব্য।

পবিত্র সরকার

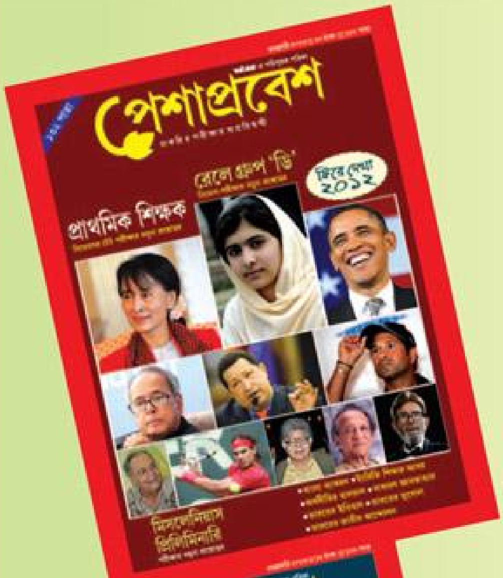

কলেজে পড়তে পড়তেই
নিয়মিত পড়ুন
পেশাপ্রবেশ
আর স্নাতক হয়েই
যে কোনও চাকরির
পরীক্ষা দিন নিশ্চিন্তে

- 'পেশাপ্রবেশ'-এর বিভিন্ন বিভাগ স্ব স্ব ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর দ্বারা প্রস্তুত।
- 'পেশাপ্রবেশ' গভীর জ্ঞান ও নিরন্তর গবেষণার ফসল।
  'পেশাপ্রবেশ'-এ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জটিল সিলেবাস ও কঠিন বিষয় সরল ও সুপাঠ্য হয়ে ওঠে।
- পাঁচমেশালি পরীক্ষার ভাসাভাসা প্রস্তুতি নয়, 'পেশাপ্রবেশ' মানেই প্রত্যেক পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি।
- 'পেশাপ্রবেশ'-এর পাতায় পাতায় পরীক্ষার মহড়াও যেন আনন্দের।

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-19 **Ph:** 2283-2320

বরিস পাস্তেরনাকের 'ডাক্তার জিভাগো'

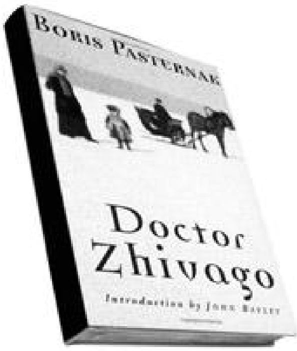

বরিস লিওনিদোভিচ পাস্তেরনাক (১৮৯০-১৯৬০) বিংশ শতাব্দীর রুশ ভাষার কবিদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্যদের একজন। তাঁর গীতিকবিতার মূর্ছনার মধ্যে যেন গোটা রুশ দেশেরই মনোবেদনা ও উৎকাঙ্ক্ষা রূপ পেয়েছিল— বিশেষত 'মেঘযুগল' আর 'প্রথম রেলগাড়ি' কাব্যসঙ্কলনগুলোয়।

একসময়ে সোভিয়েত দেশে বিষম কড়ানিষেধের জন্য মৌলিক কবিতা না লিখে তিনি অনুবাদ করেছিলেন শেক্সপিয়ারের নাটক— বিশেষ করে শেক্সপিয়ারের বিয়োগান্ত শোকান্তিক নাটকগুলো— যা রুশদেশে নানা সময়ে মঞ্চে নতুন জীবন পেয়েছে, এমনকী বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্ররূপও পেয়েছে— বিশেষত হ্যামলেট যেমন।

ডেভিড লিন পরিচালিত 'ডঃ জিভাগো' ছবিতে (১৯৬৫) জুলি ক্রিস্টি এবং ওমর শরিফ

সারা পৃথিবীতে তাঁকে ঘিরে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যায় যখন তাঁর উপন্যাস ডাক্তার জিভাগো (১৯৫৭) মূল রুশভাষায় না বেরোলেও ইতালীয় অনুবাদের মারফত ১৯৫৮ সালে সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিল, পাস্তেরনাক যে পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেন।

ডাক্তার জিভাগো যে প্রথমে রুশভাষায় বেরোয়নি তার কারণ সেন্সরশিপ: রুশ বিপ্লবের পটভূমিকায় ফাঁদা এই করুণ রঙিন কাহিনি এক ডাক্তারকে নিয়ে, যিনি আবার কবিও— চিকিৎসক শরীরের ব্যথা সারান, কবি মনের বেদনার উপশম ঘটান।

জিভাগোর ছেলেবেলা থেকে তাঁর এই অন্তিম দশার কাহিনি প্রথম ইতালীয় তর্জমায় বেরোয়— সঙ্গে সঙ্গে তার অনুবাদ হয়ে যায় ইংরিজি ফরাসি ও আলেমান ভাষায়। এমনকী বাংলাতেও যখন বেরোয়, ১৯৬০-এ, তখনও কিন্তু মূল রুশ উপন্যাস কোথাও বেরোয়নি। এমনকী উপন্যাসের অন্তর্গত কবিতাগুলোও।

এই উপন্যাসকে জড়িয়ে যদি রাজনৈতিক হুলুস্থুলু না উঠত তবে সবাই একে পড়ত কোনও মহৎ কবির লেখা উৎকৃষ্ট একটি উপন্যাস হিসেবেই, কিন্তু পাস্তেরনাকের জীবদ্দশায় তার সে সৌভাগ্য আর হয়নি।

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ডাক্তার জিভাগো যে প্রথমে রুশভাষায় বেরোয়নি তার কারণ সেন্সরশিপ: রুশ বিপ্লবের পটভূমিকায় ফাঁদা এই করুণ রঙিন কাহিনি এক ডাক্তারকে নিয়ে, যিনি আবার কবিও— চিকিৎসক শরীরের ব্যথা সারান, কবি মনের বেদনার উপশম ঘটান।

জোসেফ কনরাডের 'হার্ট অব ডার্কনেস'

জন্মসূত্রে পোল্যান্ডের অধিবাসী হলেও কনরাড লিখতেন ইংরিজিতে। 'হার্ট অব ডার্কনেস' তাঁর অন্যতম জনপ্রিয় ও সফল উপন্যাস। ১৮৯৯ সালে এটি সংবাদপত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় এবং ১৯০২ সালে বই হিসেবে বের হয়। এই আংশিক আত্মজৈবনিক উপন্যাসটিকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ একশোটি উপন্যাসের তালিকায় রেখেছে মডার্ন লাইব্রেরি ওয়েবসাইট। আফ্রিকার কঙ্গোয় স্টিমারের ক্যাপ্টেন হিসেবে লেখকের সাড়ে আট বছরের অভিজ্ঞতাও ধরা আছে এই উপন্যাসের পরতে পরতে। ১৯৭৯ সালে এই উপন্যাসের ভিত্তিতেই হলিউডের প্রখ্যাত পরিচালক ফ্রান্সিস ফোর্ড কপোলা নির্মাণ করেন 'অ্যাপোক্যালিপ্স নাউ' চলচ্চিত্রটি।

মার্লো পেশায় একজন নাবিক। বেলজিয়াম থেকে সুদূর আফ্রিকার অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশ কঙ্গোয় যারা জলপথে হাতির দাঁতের ব্যবসাবাণিজ্য করে, তেমনই এক সংস্থার মালিকানাধীন স্টিমারের ক্যাপ্টেন তিনি। এই দীর্ঘপথ পরিক্রমা করতে গিয়ে কোম্পানির বিভিন্ন স্টেশনে তাঁকে সাময়িক বিরতি নিতেই হয়। তখন মার্লো চাক্ষুষ করেন কীভাবে এই বনাকীর্ণ অঞ্চলের শিক্ষা ও চেতনার আলো না পাওয়া মানুষদের ওপর শোষণ চালায় উন্নত

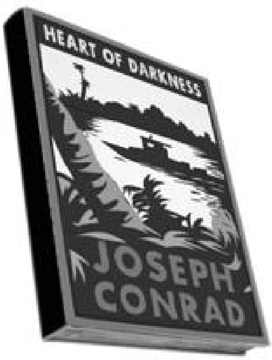

স্টিমার নিয়ে তীর ছেড়ে যাওয়ার মুহূর্তে মার্লোর চোখে পড়ে নদীর পাড়ে একাকি দাঁড়িয়ে এক পরমাসুন্দরী আদিবাসী রমণী। একদৃষ্টিতে স্টিমারের যাত্রাপথের দিকে চেয়ে আছেন।

বিশ্বের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা। কোনও মানবিক সম্বোধনে তাদের ডাকা হয় না, উল্লেখ করা হয় পশু হিসেবে। সামর্থ্যের অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়ে নিয়েও হেলায় তাদের প্রতি ছুঁড়ে দেওয়া হয় অবজ্ঞা, অত্যাচার আর সীমাহীন দুর্ব্যবহার।

মার্লো স্টিমার নিয়ে চলেছেন কঙ্গো নদী ধরে। উদ্দেশ্য সংস্থার পদস্থ আধিকারিক কুর্ৎজের কাছে পৌঁছনো। আপাতত কুর্ৎজের অধীনেই কাজ করতে হবে তাঁকে। মার্লো এসে থামেন কোম্পানির সেন্ট্রাল স্টেশনে। সেই স্টেশনটির দেখাশোনার ভার কোম্পানির এক জেনারেল ম্যানেজারের ওপর। লোকটি নানারকম ষড়যন্ত্র করায় পটু। একদিন হঠাৎই মার্লো দেখতে পান তাঁর স্টিমারটি ভাঙা। স্টিমার মেরামতির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ আসার অপেক্ষায় তাঁকে তাই বেশ কয়েক মাস সেন্ট্রাল স্টেশনেই থেকে যেতে হল। এখানে থাকাকালীনই মার্লো একদিন শুনতে পান, জেনারেল ম্যানেজার তার এক সঙ্গীর সঙ্গে ফন্দি আঁটছে কী করে কুর্ৎজ এবং তার সহকারীকে মেরে ফেলা যায়! এর ফলে হাতির দাঁত সংগ্রহে কোম্পানির বিভিন্ন স্টেশনের মধ্যে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে কুর্ৎজের নৈপুণ্য এবং একাধিপত্যে রাশ টানা যাবে। কালক্রমে, কুর্ৎজ নামে সেই ব্যক্তির প্রতি বিশেষ কৌতূহল তৈরি হল মার্লোর মনে। মার্লো বেশ বুঝতে পারলেন, এই স্টেশনের পরিচালক অর্থাৎ কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার এবং তার ঘনিষ্ঠ ইটভাটার মালিক, কুর্ৎজকে রীতিমতো ভয় পায়। তারা মনে করে কুর্ৎজ যে-কোনও মুহূর্তে তাদের পদ এবং অবস্থান কেড়ে নিতে পারেন। কিন্তু একইসঙ্গে শোনা যাচ্ছে, তিনি কোনও এক জটিল রোগে আক্রান্ত।

এদিকে স্টিমারে মেরামতির কাজ শেষ হলে মার্লো আবার বেরিয়ে পড়েন জলযাত্রায়। এবার তাঁর সঙ্গী হল কোম্পানির সেই জেনারেল ম্যানেজার এবং বেশ কয়েকজন এজেন্ট। দুপাশে ঘন অরণ্যের নিস্তব্ধতার মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে কঙ্গো নদী। কখনও কখনও দূরে জঙ্গলে বসবাসকারী আদিবাসীদের বিচ্ছিন্ন গ্রাম দেখা গেলে কিংবা তাদের সংকেত সম্প্রচারকারী ড্রামের আওয়াজ শোনা গেলে দীর্ঘযাত্রার একঘেয়েমি কেটে গিয়ে স্টিমারে সকলের মনই বিচলিত হয়।

একদিন হঠাৎই মার্লোর চোখে পড়ে জ্বালানিকাঠে বোঝাই একটি কুঁড়ে। কুঁড়ের দেয়ালে লেখা থেকে বোঝা গেল, এই জ্বালানিকাঠ মার্লো এবং তাঁর সহযাত্রীদের জন্যই রাখা আছে। সেই সঙ্গে আছে এক সতর্কবাণীও। তা হল, সামনের পথ আরও বিপদসঙ্কুল, তাই সতর্ক হয়ে চলতে হবে। স্টিমারে জ্বালানিকাঠ তুলে কিছুটা এগোতে না এগোতেই চারপাশ ঘন কুয়াশায় ঢেকে গেল। কুয়াশা কাটতেই ঝাঁকে ঝাঁকে তির ছুটে আসতে লাগল স্টিমার লক্ষ্য করে। বোঝা গেল আদিবাসীরা জঙ্গলের আড়াল থেকে আক্রমণ শানাচ্ছে। তাদের ছোঁড়া তিরে স্টিমারের এক আফ্রিকান কর্মীর মৃত্যু হল।

মার্লো উপায়ান্তর না দেখে জোরে স্টিমারের হুইসল বাজালেন। শিক্ষার আলো না পাওয়া লোকগুলি সেই শব্দে ভয় পেয়ে তির ছোঁড়া থামিয়ে দিল। সেই ফাঁকে দ্রুত অঞ্চলটা পেরিয়ে গেলেন মার্লো। অল্প সময়ের মধ্যেই পৌঁছে গেলেন কুর্ৎজের ডেরায়। তবে প্রথমেই কুর্ৎজের দেখা পাওয়া গেল না। দেখা মিলল এক রাশিয়ান ব্যবসায়ীর। তার কাছ থেকে কুর্ৎজের সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া গেল। লোকটি বলল, কুর্ৎজের কাজ ও মানসিকতাকে সাধারণ মানুষের পাপপুণ্যের মন নিয়ে বোঝা যাবে না। সে এখানকার জঙ্গলের বাসিন্দাদের কাছে মহাপুরুষ বা ঈশ্বরের আসনে অধিষ্ঠিত। সেই অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে কুর্ৎজ গভীর অরণ্যে দাপিয়ে বেড়ায় আর দুর্মূল্য হাতির দাঁত

জোসেফ কনরাড

সংগ্রহ করার জন্য নির্মমভাবে হত্যা করে হাতিদের। তার পরিচালিত স্টেশনের বিভিন্ন কোণে সে হাতির কাটা মস্তকগুলি সাজিয়ে রেখে তার কৃতিত্বের গৌরব জাহির করে।

মার্লোর সঙ্গী এজেন্টরা এরই মধ্যে একটি কুঁড়ে থেকে স্ট্রেচারে করে অসুস্থ কুর্ৎজকে বাইরে নিয়ে আসে যা দেখে মুহূর্তে তাদের ঘিরে ফেলে কুর্ৎজের অনুগত সশস্ত্র আদিবাসীরা। যদিও কুর্ৎজ তাদের নিষেধ করে কিছু বলতেই তারা আবার গভীর জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে যায়।

অসুস্থ কুর্ৎজকে তখন ধরাধরি করে স্টিমারে তোলা হয়। কিন্তু কুর্ৎজ আর সভ্য সমাজে ফিরতে চান না। তিনি নিজেকে এই আদিবাসীদেরই একজন মনে করেন। এরই মধ্যে এক রাতে ঘুমে মার্লোর চোখ লেগে আসার মুহূর্তে আবার জঙ্গলে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করেন কুর্ৎজ। মার্লো ফিরিয়ে আনেন তাঁকে। কুর্ৎজ তাঁকে দিয়ে যান অনেক ব্যক্তিগত কাগজপত্র, যার মধ্যে রয়েছে ইংল্যান্ডের এক মহিলার ছবিও। পরদিন স্টিমার নিয়ে তীর ছেড়ে যাওয়ার মুহূর্তে মার্লোর চোখে পড়ে নদীর পাড়ে একাকী দাঁড়িয়ে এক পরমাসুন্দরী আদিবাসী রমণী। একদৃষ্টিতে স্টিমারের যাত্রাপথের দিকে চেয়ে আছেন। রাশিয়ান ব্যবসায়ীর কাছ থেকে জানা গেল, ওই নারীও কুর্ৎজের প্রেমিকা। ইতিপূর্বে কুর্ৎজের ওপর নানাভাবে প্রভাব খাটিয়ে সে বহুবিধ সমস্যা সৃষ্টি করেছে। স্টিমারেই মৃত্যু হয় কুর্ৎজের।

ইংল্যান্ডে ফিরে মার্লো অনেক খুঁজে ছবির সেই মহিলাকে পান। তাঁকে কুর্ৎজের মৃত্যুসংবাদ শোনানোর পর তিনি বিলাপ করতে থাকেন শেষ শয্যায় কুর্ৎজের পাশে না থাকতে পারার জন্য। মার্লো তাঁকে সান্ত্বনা দিতে মিথ্যে করেই বলেন, মৃত্যুর মুহূর্তে তাঁর নামটিই ছিল কুর্ৎজের ঠোঁটে। মার্লো জানেন, সত্যি কথাগুলো এত অন্ধকারের যে তাঁকে জানানো যাবে না।

এরিখ মারিয়া রেমার্কের
'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট'

উপন্যাসটির মূল ভাষা জার্মান। মূল জার্মান শিরোনামের আক্ষরিক অনুবাদ, 'পশ্চিমে এটা নতুন কিছু নয়'। রচনাকাল: ১৯২৭। প্রথম প্রকাশ খবরের কাগজে ১৯২৮-এর নভেম্বর-ডিসেম্বরে। বই হিসেবে প্রকাশ ১৯২৯-এর জানুয়ারির শেষদিকে। নাৎসি শাসিত জার্মানিতে বইটি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল। পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত বইটি ইংরিজিতে অনুবাদ করেন আর্থার ওয়েজলি হুইন ১৯৩০ সালে। তখন বইটির নাম হয় 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট'। ওই একই নামে একই বছরে উপন্যাসটির ভিত্তিতে হলিউডে একটি চলচ্চিত্র বানান লুই মাইলস্টোন। ছবিটি অস্কার পুরস্কার পায়। বইটি অংশত আত্মজীবনীমূলক। রেমার্ক নিজে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার অল্প কিছু দিনের মধ্যে স্কুলের এক শিক্ষক ক্যাটোরেকের জাতীয়তাবাদী অনুপ্রেরণায় বছর উনিশের যুবক পল বমার এবং তার স্কুলের আরও কয়েকজন বন্ধু— জ্যাডেন, ম্যুলার, ক্রপ, কেমেরিচ প্রভৃতি জার্মান পল্টনে যোগ দেয়। পলের নিয়োগ হয় পশ্চিম ফ্রন্টে।

যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিদিনের লড়াইয়ের মধ্যেই পলের সঙ্গে পরিচয় হতে থাকে আরও অনেক মানুষের। যেমন, প্রবীণ সৈন্য স্তানিস্লাস ক্যাৎজিনস্কি, সেনাবাহিনীর নিষ্ঠুর কর্পোরাল হিমেলস্টস প্রভৃতি। দুই সপ্তাহের একটানা যুদ্ধের পর পলের বন্ধু কেমেরিচের একটি পা গ্যাংগ্রিন হওয়ায় কেটে বাদ দিতে হয়। তা সত্ত্বেও কেমেরিচকে বাঁচানো যায় না। এই অবস্থাতেও ম্যুলার কেমেরিচের জুতোজোড়া পাওয়ার জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠে। পল ভাবে, যুদ্ধক্ষেত্রে কোনওমতে বেঁচে থাকার প্রয়াস করতে করতে জীবনের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো হারিয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক।

ইতিমধ্যে আরও কিছু সৈন্য তাদের পল্টনে যোগ দেয়। নিত্যদিন গুলিগোলার আওয়াজ। নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে অন্যের প্রাণ নেওয়ার বিষম প্রতিযোগিতা। যুদ্ধ কবে থামবে কেউ জানে না। এক-একজন এক-একরকম সম্ভাবনার কথা বলতে থাকে আর বলতে বলতে বেরিয়ে আসে তাদের ভেতরের হতাশা। তখন মনে হতে থাকে, জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রেম ইত্যাদি সব শব্দগুলোই মরচেপড়া, অপ্রাসঙ্গিক। প্রতিদিন শারীরিক আর মানসিক আতঙ্কে দিনযাপন করতে গিয়ে যুদ্ধকে আর মর্যাদা বা মাহাত্ম্যের বিষয় মনে হয় না। বয়সে প্রবীণ স্তানিস্লাস বলেন, সেনাবাহিনীর ওপর থেকে নীচতলা সকলে যদি এক মাইনে আর এক খাবার পায়, তাহলে যুদ্ধ কবে থেমে যায়! পলের বন্ধু ক্রপ যোগ করে, কোনও দেশেরই সেনাবাহিনী থাকা উচিত নয়। নেতাদের উচিত তাদের মতানৈক্য তাত্ত্বিক যুদ্ধে মিটিয়ে ফেলা।

রণক্ষেত্রে কালো রাত নেমে এলে জওয়ানেরা বেরোয় ফ্রন্টের নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় কাঁটাতারের বেড়া পোঁতার জন্য। এমন সময় হঠাৎই শত্রুপক্ষের গোলাবর্ষণ শুরু হলে তারা মৃত সৈনিকদের সমাধিক্ষেত্রে গিয়ে লুকোয়। কিন্তু সেখানেও গোলার তাণ্ডবে সমাধির ওপরের স্তর সরে গিয়ে বেরিয়ে পড়ে শবদেহগুলি। আর গোলার আঘাতে প্রাণ হারিয়ে পলের সহযোদ্ধারা মুখ থুবড়ে লুটিয়ে পড়ে সেই শবদেহগুলির পাশে।

এই অবর্ণনীয় দৃশ্য দেখে বেঁচে থাকা সৈন্যরা ক্যাম্পে ফিরে আসে। প্রবল হতাশায় তারা পরস্পর আলোচনা করতে থাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বেঁচে ফিরলে তারা কীভাবে জীবন কাটাবে। যদিও সৈন্যদের অধিকাংশই মনে করে এই যুদ্ধ কোনওদিনও থামবে না।

এরই মধ্যে একদিন আবার যুদ্ধ রক্তক্ষয়ী হয়ে ওঠে। দিনের শেষে দেখা যায় রণাঙ্গন জুড়ে পড়ে আছে কেবল রক্তাক্ত ছিন্নভিন্ন শরীর। হাত-পা ছিটকে গিয়েছে বহুদূরে। বড়ো বড়ো মেঠো ইঁদুর সেই শবদেহগুলির ওপর চড়ুইভাতিতে জুটে গিয়েছে। পলের এই প্রত্যয়ই দৃঢ় হয় যে সেও যুদ্ধক্ষেত্রে একটা পশুর মতোই বেঁচে আছে। পৃথিবীর আর সব কিছু থেকে মন সরিয়ে নিয়ে কেবল কীভাবে নিজের প্রাণটুকু বাঁচিয়ে রাখা যায়, তা ভিন্ন আর কোনও চিন্তা করতে সে অপারগ।

সেদিনের যুদ্ধের পর আশি জনের পল্টনে বেঁচে রইল মাত্র বত্রিশ জন। সতেরো দিনের ছুটিতে নিজের বাড়িতে ফিরে এল পল। জানতে পারল, তার মা ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছেন। শিক্ষক ক্যাটোরেককে বাধ্যতামূলক শর্তে যুদ্ধে যেতে হয়েছে শুনে সে যেন খুশি হল। অথচ তাদের ছোট মফস্সল শহরটা চেহারায় খুব একটা না পাল্টালেও পলের নিজের জন্মভূমি তার কাছে অচিরেই প্রবাস বলে মনে হতে থাকল। যুদ্ধক্ষেত্রে তার খারাপ অভিজ্ঞতার কথা সে কাউকেই ঠিকমতো বুঝিয়ে উঠতে পারল না। পরিচিতরা যুদ্ধের কূটনীতি, গতিপ্রকৃতি, সম্ভাব্য পরিণতি নিয়ে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করতে থাকল, তারা পলের অভিমতও জানতে চাইল। কিন্তু পল তাদের বোঝাতে পারল না, সেনাবাহিনীর নিম্নতম স্তরে যুদ্ধের বৃহত্তর ছবিটা স্পষ্টভাবে জানাও যায় না।

ক্যাম্পে ফেরার পথে রাশিয়ান যুদ্ধবন্দিদের দেখে সে অবাক হয়ে ভাবল, কী করে দুজন ব্যক্তিমানুষ, যাদের নিজেদের মধ্যে ব্যক্তিগত স্তরে কোনও শত্রুতা থাকারই কথা নয়, তবু যুদ্ধ তাদেরকে পরস্পরের শত্রুপক্ষ বানিয়ে তোলে।

ক্যাম্পে নিজের বন্ধুদের মধ্যে ফিরে এসে পল যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। এরমধ্যে একদিন জার্মান সম্রাট সৈন্যদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তাঁর পাতলা ছোটখাটো চেহারা আর দুর্বল কণ্ঠস্বর শুনে সকলেরই মোহভঙ্গ হয়। আবার যুদ্ধবিগ্রহের জীবন শুরু হয় পলের। একদিন লড়াই চলাকালীন পল্টনের বাকি সৈন্যদের থেকে দলছুট হয়ে শত্রুপক্ষের গোলাবর্ষণ থেকে বাঁচতে তাকে আশ্রয় নিতে হয় মাটিতে গোলার আঘাতে তৈরি হওয়া গর্তে। সেই মুহূর্তে একজন ফরাসি সেনাও কোনওভাবে সেই গর্তে এসে পড়ে আর পল নিজে প্রাণে বাঁচার তাগিদে ছুরির আঘাতে তাকে হত্যা করে। ধীরে ধীরে ভীষণ যন্ত্রণা পেয়ে মারা যেতে থাকে সেই সৈন্যটি। পল জানতে পারে, তার নাম জেরার্ড ডুভুল। বাড়িতে তার স্ত্রী ও সন্তান আছে। এই ঘটনায় সে বেদনায় আর গ্লানিতে দীর্ণ হতে থাকে। পলের মনে হয়, লোকটি তার শত্রু নয়, বরং তারই মতো যুদ্ধের একজন শিকার।

এরই মধ্যে শারীরিকভাবে আহত হয় পল। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কয়েকদিন দূরে থাকার তাগিদে একজন সার্জেন্ট-মেজরকে ঘুষ দিয়ে হাত করে পল এবং ক্রপ হাসপাতালে কাটায় কদিন। সেখানে ক্রপের একটি পা অস্ত্রোপচার করে বাদ দিতে হয়। অস্ত্রোপচার হয় পলেরও। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে কয়েকদিন বাড়িতে ছুটি কাটিয়ে পল ফিরে আসে ক্যাম্পে।

এদিকে মিত্রশক্তির ক্রমাগত আক্রমণে পিছু হঠতে থাকে জার্মান সেনাবাহিনী। ১৯১৮ সালের শেষদিক। ততদিনে পলের বন্ধুরা কেউ আর বেঁচে নেই। ইতিমধ্যে গুজব রটেছে, জার্মানি এবার আত্মসমর্পণ করবে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার একটা ক্ষীণ আশার আলো দেখা যাচ্ছে। কিন্তু পল এই খবরে উল্লসিত হয় না। দেশে শান্তির সুসময় ফিরলে সে কীভাবে বাঁচবে! যুদ্ধ করা ছাড়া আর কোনও কাজই যে সে জানে না!

শেষপর্যন্ত ১৯১৮-র অক্টোবরে নামমাত্র যুদ্ধে নিহত হয় পল। সেনাবাহিনীর রিপোর্টে লেখা হয়, 'অল ইজ কোয়ায়েট অন ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট'। পশ্চিম রণাঙ্গন শান্ত!

কুশীলব উপাধ্যায়

এক আশ্চর্য বইয়ের পরমাশ্চর্য MP3 সিডি

অবাক করা
গানে-সুরে
বাদ্যি-বাজনায়
অভিনয়ে
জমজমাট
প্রায় দু'ঘণ্টার
MP3 সিডি

হীরু ডাকাত

ছন্দে-কথায়, গানে-বাজনায়, অভিনয়ে-কথকতায়

সব বয়সের ছোটদের মস্ত বড় আনন্দের আয়োজন

মূল রচনা ও শ্রুতিনাট্যরূপ: **অমরেন্দ্র চক্রবর্তী**
সংগীত ও পরিচালনা: **দীপক চৌধুরী**
অভিনয়: **সন্তু মুখোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়চৌধুরী ও আরও অনেকে**
ভাষ্যপাঠ: **অনসূয়া মজুমদার**
গান: **স্বপন বসু ও আরও অনেকে**

অনলাইনে পেতে
www.swarnakshar.in
লগ অন করুন

সিম্ফনি, মিউজিক ওয়ার্ল্ড ও অন্যান্য ক্যাসেটের দোকানে পাবেন। ₹৯৯

স্বর্ণাক্ষর

Swarnakshar Prakasani Private Limited
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Phone: 2280-8818 **Fax:** 2287-6448
Email: books@swarnakshar.in **Website:** www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনীর বই, পত্রিকা, ভ্রমণ-ভিসিডি
Buy Online ▶ www.swarnakshar.in
তুতুল
মহাশ্বেতা দেবী
শাদা ঘোড়া
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
চলো দেখে আসি
কানাইলাল চক্রবর্তী
আমাজনের জঙ্গলে
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
গৌর যাযাবর
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
হীরু ডাকাত
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
কথামালা: ছড়ায় ঢালা
পবিত্র সরকার
বকবকম
সুভাষ মুখোপাধ্যায়
সেরা ভ্রমণ কাহিনী
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
বন্ধুভরা বসুন্ধরা
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
ইছামতীর মশা
শঙ্খ ঘোষ
ভ্রমণের নবনীতা
নবনীতা দেব সেন
দুচাকায় দুনিয়া
বিমল মুখার্জি
দেশে দেশে
প্রতাপকুমার রায়
সুইজারল্যান্ডের পাঁচ পাহাড়ে
দক্ষিণ থাইল্যান্ড
Read / Subscribe Online ▶ www.swarnakshar.in
ভ্রমণ
ছেলেবেলা
Traveller
To be launched shortly
পেশাপ্রবেশ
কর্মক্ষেত্র
স্বর্ণাক্ষর
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাঃ লিঃ, ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ ফ্যাক্স: ২২৮৭-৬৪৪৮ ই-মেল: info@swarnakshar.in
ওয়েবসাইট: www.swarnakshar.in • www.bhraman.com
www.ebhraman.com • www.echhelebela.com • www.ekarmakshetra.com
আরও অনেক বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র জন্য লগ ইন করুন: www.swarnakshar.in

KALER KASHTIPATHAR □ Vol. 1 No. 12 □ 1 April 2013 □ Rs. 30 Title Code: WBBEN 14529/25/1/2012-TC □ Declaration No. 185 dt. 05/09/12

Owner Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. Printer & Publisher Amarendra Chakravorty on behalf of Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. Published from 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019 and Printed from Swapna Printing Works (P) Ltd., Doltala, Doharia, P.O. Ganganagar, North 24 Parganas, Kolkata-700 132.

Editor Amarendra Chakravorty.

Subscribe Online ▸ www.swarnakshar.in
Read Online ▸ www.ebhraman.com

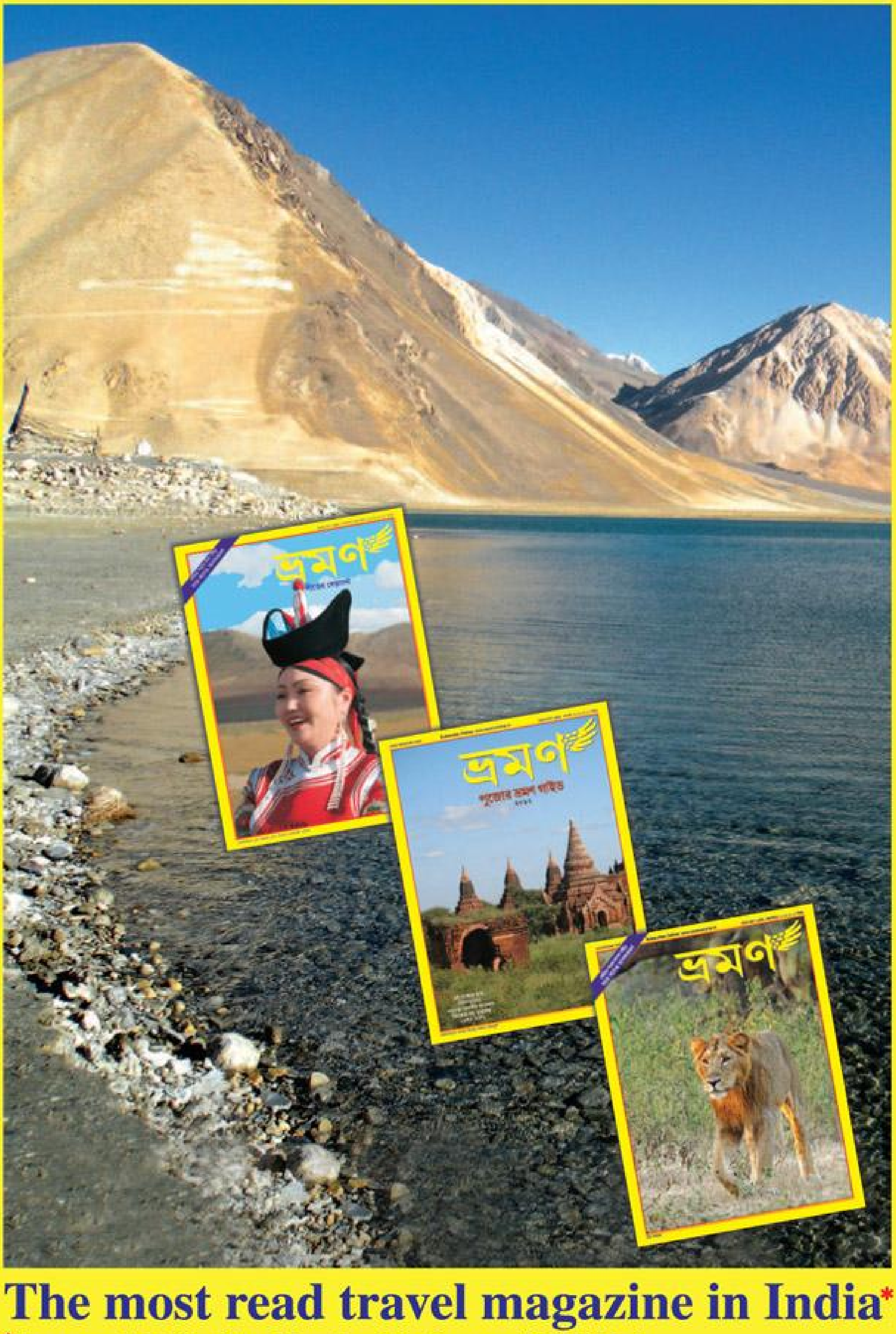

The most read travel magazine in India*

***Source: IRS (Indian Readership Survey) 2012 Q4**